বাহাদুর শাহ্

শ্রীপারাবত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

ডঃ দেবেন্দ্র চন্দ্র পাল

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

এক

চোদ্দ বছরের একটানা সঙ্গী প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রটির গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে চলে যুবক আবু ওরফে সিরাজউদ্দিন বা জাফর। পিতামহ শাহ্ আলেমের প্রদত্ত উপহার এই চমৎকার বন্দুকটি। কিশোর আবুর হস্তে সমর্পণ করে একদিন বলেছিলেন শাহ্, যোগ্য প্রমাণিত না হলে আবার ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু এই দীর্ঘ চোদ্দ বছরের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার কথা একবারও মনে হয় নি তাঁর। দৃষ্টিহীন চোখ দু'টি তার দিকে তুলে ধরে দেশের কথা বলেছেন, বংশের কথা আলোচনা করেছেন, দিওয়ান-এর শ্যার নিয়ে কত ধরনের মন্তব্য করেছেন, শুধু আগ্নেয়াস্ত্রটির বিষয়ই অনুল্লেখ রয়ে গিয়েছে।

বন্দুকটির গায়ে হাত বুলিয়ে স্বগতোক্তি করে চলে জাফর—এতদিনে প্রকৃত সময় এসেছে। এবারে শত্রুর বক্ষ ভেদ করবে তাদেরই স্বদেশের তৈরী অস্ত্রের নিক্ষিপ্ত গুলি। হ্যাঁ, শত্রু বৈকি। বিদেশী ফিরিঙ্গিরা কখনই মিত্র হতে পারে না। মুঘল শক্তি-সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠারা দিল্লী অধিকার করে বসে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ্কে অসম্মান তারা করে নি কখনো। তারা এ বিষয়ে সচেতন যে, সারা হিন্দুস্থানের অধিবাসীর হৃদয়ে মুঘল বাদশাহের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিন শতাব্দীর সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর এই আসন। বিজয়ী হয়েও মুঘল বাদশাহ্কে তারা শ্রদ্ধা করে এসেছে। কারণ তারা দেশেরই মানুষ। শক্তিতে তারা কিছুদিন শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করলেও মর্যাদায় মুঘলদের ওপর নিজেদের স্থাপন করার কথা কল্পনা করে নি কখনো। তাই দিল্লাতে মারাঠাদের নিযুক্ত কর্তাব্যক্তি মাধোজী সিন্ধিয়া কোনদিন বাদশাহ্কে সম্মান প্রদর্শন করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নি। সে যেন শাহ্ আলমেরই মন্ত্রী হিসাবে কাজ করে বিদায় নিয়েছে। তারপর এসেছে দৌলত রাও। সে-ওকাজ করে চলেছে উকিল-ই-মুতলাক্-এর সহকারী হিসাবে।

কিন্তু...

এবার আসছে ফিরিঙ্গি। ওদের মুলুকের সবাই ফিরিঙ্গি। নিজেদের ওরা বলে ইংরাজ। আসলে ওরাও ফিরিঙ্গি। ওরা আসছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মারাঠা শক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দ্রুত অপস্রিয়মান। আত্মসন্তুষ্টি আর ভোগবিলাসিতা তাদেরও মুঘলদের মত শক্তিহীন করে তুলেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের নিকট তারা পরাজয় বরণ করেছে।

এবারে শেষ যুদ্ধ। ফয়সালা হবে। অর্থাৎ এবারে দিল্লীর পালা। কারণ দিল্লীকে জয় করার অর্থ সারা হিন্দুস্থানকে জয় করা।

এই বন্দুককে বোধহয় এতদিনে ব্যবহার করার সুযোগ এসেছে। অন্ততঃ শাহ্ আলমের উক্তিতে তাই মনে হয়। কয়েকদিন আগে রোশন-আরা-বাগে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি নিজে থেকেই বললেন,—ওরা বড় সাংঘাতিক জাতি। যে দেশে ওরা একপায়ে দাঁড়াবার জমি পেয়েছে সেই দেশই পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে। ওরা হিংস্র, ওরা বেপরোয়া। কারণ দেশে ওদের রুটির সংস্থান নেই। জীবন ধারণের রুটি ওদের চাই-ই। সেই রুটির জন্যে নীতিকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। সবচেয়ে বড় কথা হল নানান্ দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ওদের মস্তিষ্ক সমৃদ্ধ। তবু রুখতে হবে ওদের। বাঙলাদেশ যে ভুল করেছে সেই ভুলের পুনর্ঘটন যেন কিছুতেই না ঘটতে পারে। প্রস্তুত থাকো জাফর।

জাফর প্রস্তুত।

শাহ্ আলম এখন দ্বিধাহীন চিত্তে এক নিশ্বাসে বলতে পারেন, প্রস্তুত থাকো জাফর। অর্থাৎ চোদ্দ বছর আগে যে অস্ত্রটি তোমার হস্তে সমর্পণ করেছিলাম সেটি দেওয়া নিরর্থক হয়েছে বলে আজও কোন প্রমাণ পাইনি।

হুমায়ূনের সমাধি-সৌধের এক নির্জন প্রান্তে উপবিষ্ট জাফরের মুখে তৃপ্তির আভাস ফুটে ওঠে। চোদ্দ বছর আগের এক বিশেষ দিনের দৃশ্যটি তার সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। কতই বা বয়স তখন? বারো, বড়জোর তেরো। বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে।

সেদিন…

মহলের পর মহল পার হয়েছিল বালক আবু ওরফে সিরাজউদ্দিন। শেষে মুসম্মান বামজ,—বাদশাহী মহল। কক্ষের পর কক্ষ। পদশব্দ তার ক্ষীণ, তবু পাথরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে চমকে দেয় তাকে। রিক্ততার প্রতিধ্বনি। রিক্ততা অনেক ফাঁকা আওয়াজ তোলে। যেমন রিক্ত বক্ষ তোলে দীর্ঘশ্বাস। নইলে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আওরঙজেব-পুত্র বাহাদুর শাহের আমলেও এই কয়টি মহল পার হতে গেলে প্রতি পদে প্রহরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হত। বাদশাহের

পৌত্র জানলেও এই ভর-দুপুরে নির্বিবাদে তাকে কিছুতেই এগিয়ে যেতে দিত না।

বাহাদুর শাহ্। নামটি বেশ। বারো-তেরো বছরের বালক থমকে দাঁড়ায়। ওষ্ঠের ওপর আঙুল রেখে তার ডাগর চোখের ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে কারুকার্য খচিত গবাক্ষের ভেতর দিয়ে দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। নাঃ, বাহাদুর শাহের মত দিল্লীশ্বর হবার কথা কল্পনা করে না সে। হতেও চায় না। তবে কখনো যদি আসত তেমন দিন—সত্যিই যদি অকস্মাৎ তাকে কেউ বসিয়ে দিত বাদশাহী মসনদে, তবে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপাধি গ্রহণ করত "বাহাদুর শাহ্"। সবাই বলে আওরঙজেবের পর থেকেই নাকি মুঘল বংশের পতনের শুরু অর্থাৎ বাহাদুর শাহের আমল থেকেই তার সূচনা। যার ফলে তৈমুর বংশ এখন মারাঠাদের তত্ত্বাবধানে এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ফিরিঙ্গিদের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে।

তবু তেমন দিন যদি সত্যিই আসত তার উপাধি হত বাহাদুর শাহ্। ওই নামেই সে একবার ধর্মজ্ঞানহীন, নিপীড়ক ফিরিঙ্গিদের সাথে মুলাকাৎ করত। সে বাঙলার সিরাজউদ্দৌলা নয়, সে দিল্লীর সিরাজউদ্দিন। সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠ আর মীরজাফরদের যে সুযোগ দিয়েছিল, সে তা দেবে না।

বালকের সম্বিত ফিরে আসে। কোথায় যেন কে চাপা আর্তনাদ করছে। কী সব আজেবাজে চিন্তা করছে সে। সে না কবি—শ্যার রচনা করে? কবিদের কখনো বাদশাহ্ হতে হয়? কবিতার রস বাদশাহীতে কোথায়। তখত্-তাউসের উত্তাপ সেই রস শুকিয়ে দেয়।

চাপা আর্তনাদই তো। কোথায়? দেওয়ালের গায়ে যাঁদের তৈলচিত্রগুলি দেখতে দেখতে সে এতদূর এগিয়ে এসেছে তাঁদেরই মধ্যে কেউ অমন আর্তনাদ করে উঠলেন নাকি। সে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাদশাহ্ জালালউদ্দিন ফারুক শিয়ারের চিত্রের সামনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বটে তাঁর। আওরঙজেবের পুত্র বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজিমুস্সান বাদশাহ্ হতে না পারলেও তাঁর পুত্র ফারুক শিয়ার ভাগ্যে বাহাদুর শাহের অপর পুত্র মৈনুদ্দিন জাহানদার শাহের পর বাদশাহী জুটেছিল। কিন্তু জাহানদার শাহের ওপর বোধ হয় পূর্বপুরুষদের কৃপা ছিল। কারণ ঘুরে ফিরে তাঁরই বংশ-ধারা পেয়ে গেল বাদশাহী। ফারুক শিয়ারের আর্তনাদ করার পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি।

বালক আবু তৈলচিত্রটির দিকে এগিয়ে যায়। হাত তুলে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে ফারুকের চিত্রটি। নাগাল না পেয়ে বিড়বিড় করে বলে—আমি কিন্তু তোমাদের সবাইকে সমান ভালবাসি। তোমাদেরই রক্তধারা আমারও ধমনীতে প্রবাহিত।

তোমাদের বলিষ্ঠতা, তোমাদের সাহস কি আমার মধ্যেও সুপ্ত নেই? কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। দেশের অগণিত অধিবাসীকে কি তোমরা সত্যিই চিনতে চেষ্টা করেছিলে? চেষ্টা করলে, ফিরিঙ্গিরা এদেশের মাটিতে পা দিল কি করে?

ফারুক শিয়ার যেন হাসছেন। বালকটিও হাসে। মুহূর্তের আগের প্রশ্ন সে ভুলে যায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চেয়ে থেকে আপন মনে বলে,—জানি, তোমরাও আমাকে ভালবাস। তোমরা ভালবাস গোটা হিন্দুস্থানকে। আমিও তাই বাসি। ওই যে আকাশ—ও আকাশ পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবে? অমন নীল—গভীর? ওই যে গাছপালা দূর থেকে অবিরত শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে নিকটে যাবার জন্য হাতছানি দিচ্ছে, ওখানে গিয়ে শরীর না জুড়িয়ে এসে কি থাকা যায়? পৃথিবীর আর কোথাও এমন আছে বলে শোন নি নিশ্চয়।

আর্তনাদ? না না, কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে প্রলাপ বকছে। টুকরো টুকরো খেদোক্তি হাজার দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তার চতুর্দিকে আছড়ে পড়ছে তৈলচিত্র তো নয়। কোথা থেকে ভেসে আসছে ঠাহর করা যায় না। কোন রক্ষী অথবা অন্য কাউকে দেখলে প্রশ্ন করা যেত। বাদশাহের কক্ষের এত কাছে ওদের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর। হয়তো কর্তব্যকর্মকে ওরা ফালতু বলে মনে করে। শাস্তির ভীতি হ্রাস পেয়েছে। কর্তব্যের বিচ্যুতিতে মৃত্যুদণ্ড এখন বিরল।

বালক নিঃশঙ্ক অথচ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অগ্রসর হয় বাদশাহের বিশ্রামাগারের দিকে। এবারে স্পষ্ট শোনা যায়। পুরুষের কণ্ঠ।

বাদশাহের কক্ষের ঠিক বাইরে থেমে যায় আবু। স্বয়ং শাহ্ আলমের কণ্ঠস্বর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সে। বাদ যায় না একটি কথাও।

জ্বালা—শুধু জ্বালা। আরবের মরুভূমি আমার বুকের পাঁজরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। তৃষ্ণার বারি নেই একবিন্দুও।......তোমার চোখে তো আমার এই অন্তর্জ্বালার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে না বেগমসাহেবা। ভাবছ, অন্ধ হয়েও কিভাবে একথা বলছি! মনের চোখ কি কখনো কারও অন্ধ হয় বলে শুনেছ? আমি জানি কেন তোমার দু'চোখে আমার দুঃখের ছায়াপাত আর হয় না। যৌবন নেই—বুঝলে, যৌবন বিদায় নিয়েছে। তোমারও—আমারও। অথচ এক দিন ছিল। তখন আমার হৃদয় ফুটে উঠত ওই দুই চোখে যার দু'গালের মসৃণ ত্বক এখন কুঞ্চিত। তোমার যৌবন না থাকলেও হারেমে এমন নারীর অভাব নেই আমার, যার যৌবন সবে প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। তবু তাদের ডেকে আনি না। কারণ তারা আমায় ভালবাসে না। তোমায় কাছে কাছে রাখি। কেন জান?

বালক উঁকি দিয়ে দেখে বাদশাহের প্রধানা বেগম যেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। বাদশাহের কাঁধে হাত রেখে বলে,—কেন বাদশাহ?

—কারণ, তুমি আমার প্রথম যৌবনের সহচরী। আমি জানি, আমার সব দুঃখ বুঝবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি তোমার নেই। তবু তোমায় সব কথা বলেই আমার তৃপ্তি। কারণ না বুঝেও আমায় তুমি ভালবাসতে। তোমার রূপে আমার মুগ্ধতার প্রতিচ্ছবি দেখেছি ওই দুই চোখে। আমার পৌরুষে তোমার বিহ্বল আবেগও ফুটে উঠতে দেখেছি ওখানে। শুধু সেই জন্যে—

—আমায় কি ভর্ৎসনা করছেন?

—না না না। ভুল বুঝো না। ভর্ৎসনা করতে যাব কেন? ভর্ৎসনা করলে, করি নিজেকে। মুঘল বংশের অপদার্থ বংশধর বলে। বাদশাহ্ হুমায়ুন যদি রাজ্য হারিয়েও তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন, আমি পারবো না কেন? কেন? কেন? হিন্দুস্থানের পূর্বপ্রান্তে পলাশীর প্রান্তরে যে মেঘের সৃষ্টি, সেই মেঘ দ্রুত সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সবাই বুঝতে পারছে, অথচ জোট বাঁধতে পারছে না। মারাঠারা এখন সর্বাপেক্ষা 'শক্তিশালী, অথচ নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু আমি? আমি দিল্লীশ্বর—সৈন্যসংখ্যা সীমিত হলেও নেতৃত্ব দিতে বাধা কোথায়? আমি অন্ধ হতে পারি। সেই অন্ধত্ব তো আমার পুত্রদের দৃষ্টিহীন করে নি। তাই জ্বালা—অক্ষমতার অপরিসীম জ্বালা।

বালক আবু বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলেও শাহ্ আলমের কথার সবটুকু মর্ম বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে, ফিরিঙ্গিদের প্রতি বাদশাহ্ আদৌ সন্তুষ্ট নন। সে তার পিতাকেও বলতে শুনেছে, ফিরিঙ্গিরা ধর্ম মানে না। এদেশের হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মকে তারা তুচ্ছ করে। তারা চায় শুধু অর্থ। যেখানেই থাক, শেষ কপর্দক অবধি চুষে নিয়ে নিজের দেশে পাঠায়।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অনুচিত ভেবে ফিরে যাবার জন্যে বালক আবু পা বাড়াতেই বাদশাহের তীব্র হুকুম তাকে সচকিত করে—ভেতরে এসো।

কাকে হুকুম করলেন শাহ্ আলম? তাকে নিশ্চয় নয়। কারণ বাদশাহ্ দৃষ্টিহীন। সে দৌড়াতে শুরু করে।

এবারে বজ্রকঠিন আদেশ,—পালিও না। বাদশাহের আদেশ অমান্য করলে কেউ নিস্তার পায় না। ভেতরে এসো।

এবারে বালক নিঃসন্দেহ। তাকেই ডাকছেন শাহ্ আলম। অচঞ্চল পদে ধীরে ধীরে পর্দা তুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তার অবয়বের সমস্ত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় এদিক ওদিক. অসংখ্য আরশিতে। সে বুঝতে পারে

এমন কোন গোপন আরশি রয়েছে যা বাইরের ব্যক্তিকেও ভেতরের আরশিতে ধরে ফেলে। তাই প্রহরার ব্যবস্থা নেই আশেপাশে। প্রহরা থাকা এখানে বাঞ্ছনায় নয় বলেই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রতিবিম্ব বাদশাহ্ দেখবেন কি করে? তবে হয়তো বেগম-সাহেবা তাকে বলে দিয়েছেন। বেগমের কর্তব্য করেছেন তিনি।

পদশব্দে বাদশাহ্ বুঝতে পারেন বালক আবার উপস্থিতি। তঁার ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠে।

প্রশ্ন করেন,—কে তুমি?

—আমি—বেগমসাহেবা আমাকে চেনেন।

—চেন তুমি বেগমসাহেবা?

হাসিমুখে বেগমসাহেবা বলে,—না চেনার কি আছে? মৈনুদ্দিনের বড ছেলে।

—ও., মৈনুদ্দিনের বড ছেলে? এদিকে এসো।

বালক ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁডায়। এত নিকটে সে আগে কখনো আসে নি শাহ্ আলমের।

বাদশাহ্ হাত দিয়ে বালকের মাথা, মুখ, বুক একে একে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। তারপর প্রশ্ন করেন,—সাহস কাকে বলে জান?

ক্ষণেকের দ্বিধা জয় করে বালক বলে,—জানি।

বাদশাহ্ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন,—জান? তা'হলে দৌড়ে পালাচ্ছিলে কেন?

রুখে ওঠে বালক,—ভয়ে পালাই নি।

—তবে?

—আপনি বিরক্ত হবেন ভেবে।

—বিশ্বাস করি না। তোমরা সবাই সমান। মুঘলবংশের কুলাঙ্গার। আমারই মত কুলাঙ্গার। হিন্দুস্থানের সম্মান তোমাদের আমলেও পুনরুদ্ধারের আশা নেই।

—আছে। বালকের চোখ জল্‌জ্বল্ করে ওঠে।

—চোপরহ্, অর্বাচীন। কী প্রমাণ দিতে পার তুমি?

কক্ষের এক কোণে, ক্ষুদ্র একটি বেদীর ওপর লাল গালিচা বিছানো। আর তারই ওপর সশ্রদ্ধায় রক্ষিত পবিত্র কোর-আন সরিফ। পার্শ্বে একটি বাতি জ্বলছে,—অনির্বাণ শিখা তার।

বালকটি তডিৎগতিতে অগ্নিশিখার ওপর বাঁ হাতখানি প্রসারিত করে শান্ত কণ্ঠে বলে,— আপনি যতক্ষণ না হুকুম করছেন সরিয়ে নিতে, আমার হাত এই প্রদীপশিখায় দগ্ধ হতে থাকবে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত বেগমসাহেবা বুঝে উঠতে পারে না কী ঘটতে চলেছে। হয়তো বার্ধক্যে মস্তিষ্কের সক্রিয়তা কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে।

পরক্ষণেই বেগমসাহেবা চেঁচিয়ে ওঠে,—একি? হাত পুড়ে যাচ্ছে যে। হুকুম দিন বাদশাহ্।

—হাত ওঠাও।

বালক হাত সরিয়ে নেয়। বাঁ হাতের চারটি আঙুল কালো দেখায়।

—এদিকে এসো। দেখ তো বেগমসাহেবা, কতখানি পুড়েছে?

বালক নিকটে যায়।

বেগমসাহেবা বালক আবুর হাত তুলে দিয়ে দেখে অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, এ যে অনেকখানি পুড়ে গিয়েছে। হাকিম ডাক?

বাদশাহ্ বলে,—প্রয়োজন নেই। দাওয়াই আমার কাছেই আছে। বুকের জ্বালা ছাড়া, সব অসুখের দাওয়াই তুমি আমার কাছে পাবে বেগমসাহেবা।

বাদশাহ্ নিজে শয্যা ছেড়ে উঠে অনুমানের উপর নির্ভর করে একটা শিশি বার করে স্বহস্তে দাওয়াই লাগিয়ে দিতে দিতে বলেন,—সাবাস্। তোমার মধ্যে দেখছি যেন জালাল-উদ্দিন আকবর বাদশাহের অপার সহিষ্ণুতা। খুব আনন্দ হল।

—আমি এবারে যাই।

—কেন? কষ্ট হচ্ছে।

—না।

—কিছুক্ষণ বস তা'হলে।

বালক অপেক্ষা করে। সে বৃদ্ধ বাদশাহের সান্নিধ্য উপভোগ করে।

—তোমার নাম কি?

—আবু। তবে আমি নিজের একটা নাম রেখেছি।

—নিজে রেখেছ? কী নাম?

—জাফর।

—চমৎকার। কিন্তু নাম নিজে দিতে গেলে কেন? আবু নাম পছন্দ নয়?

—সে জন্যে না। 'জাফর' নামে কবি হবার ইচ্ছে আছে আমার।

—তুমি কবিতা লেখ? এইটুকু বয়সেই?

—চেষ্টা করি।

—তবে অসি ধরতে পারবে কোনদিন? আমি জানি না সে সুযোগ তোমার আসবে কিনা, তবু কয়েক মুহূর্ত আগে আল্লার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম,

তখত্-তাউসে যেন তোমাকেই বসান। অবিশ্যি তখত্-তাউস কথাটা এখন একটা বিরাট রসিকতা মাত্র।

—না। রসিকতা হবে কেন?

—তা'হলে লেখনা ধরতে গেলে কেন অস্ত্রবিদ্যা ফেলে? ও জিনিস চিত্তকে দুর্বল করে দেয়, জান?

—জাবীর-উদ্দিন বাবরের চিত্ত তো দুর্বল হয় নি সেজন্যে?

শাহ্ এতটুকু বালকের জবাবে যেন স্তব্ধ হয়ে যান। তারপর তাঁর শ্বেত শ্মশ্রুগুম্ফ ভেদ করে সহজ হাসি প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁকে হাসতে দেখে বেগম-সাহেবার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। বাদশাহ্‌কে বহুদিন তিনি হাসতে দেখেন নি।

—ঠিক আছে জাফর। আমি তো আর দেখে যেতে পারব না। দুনিয়ার মানুষ দেখবে ভবিষ্যতে অসিতে আর মসিতে কীভাবে সমন্বয় সাধন করাতে পার। তবে হ্যাঁ, বাবর পেরেছিলেন। তা'ছাড়া আমাদের রক্তের মধ্যে ও জিনিসটাও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রতি পুরুষেই প্রাই একজন পুরুষ অথবা নারী ওই প্রতিভাটি নিয়ে জন্মেছেন। সুতরাং তুমি অনেকখানি এগিয়ে রয়েছো।

বালক উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

বাদশাহ্ তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন—আমিও চেষ্টা করি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। সুযোগ পেলে একদিন শোনাব।

জাফর কৃতজ্ঞতায় গলে পড়তে চায়। এতবড সৌভাগ্যের কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। শাহের মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের বলিরেখা। কিন্তু রেখাগুলো ছাপিয়ে শিশুসুলভ দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন,—জান, আমারও একটা নাম আছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাফরকে মূক করে দিয়েছে। সে শুধু চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁ, তোমার যেমন 'জাফব', আমারও তেমনি 'আফতাফ'।

বালকের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সে বলে,—আমি কেন আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি আজ আপনি এখনো সেকথা জানতে চান নি।

—প্রয়োজন নেই। সময় পেলেই এসো।

বালক কক্ষ পরিত্যাগের জন্যে পা বাড়াতেই বাদশাহ্ ডাকেন,—শোন।

মুহূর্তকাল পূর্বে শাহ্ আলমের কণ্ঠে যে স্নেহের সুর বেজেছিল তার আভাসও

নেই এই ডাকে।

তিনি বলেন,—আমি তোমার পিতামহ। তবু দিল্লীর শাহ্ হিসাবে বিদায়ের সময় একটু ভব্যতা আশা করেছিলাম।

—আমার অন্যায় হয়েছে। মাফ করুন। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আনন্দে আমি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম।

—বেশ। মাফ করলাম এবারের মত।

বালক যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে।

—দাড়াও। বাদশাহ্ গাত্রোত্থান করেন আবার। কক্ষের একধারে পর পর অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত রয়েছে। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। তারপর সেগুলোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে একটিকে বেছে নেন।

—এই নাও। লেখনী যাতে তোমার মনের সবটুকুকে গ্রাস করতে না পারে, তাই এই সাবধানতা। এটি খুব সুলভ অস্ত্র নয়। একজন মারাঠা বীর আমাকে দিয়েছিল। সে পেয়েছিল একজন ফিরিঙ্গি সেনাপতিকে হত্যা করে। চমৎকার জিনিস, এতে লক্ষ্য ভেদ করলে বুঝতে পারবে সাধারণ বন্দুকের সঙ্গে এর কত পার্থক্য।

বালকের ভাবপ্রবণতা তার ডাগর চোখদুটিকে সজল করে তোলে। তবু সে চিন্তিত কণ্ঠে বলে,—এটি আমার কাছে রাখবার অধিকার দিলেন।

—হ্যাঁ।

—কেউ যে বিশ্বাস করবে না।

—যাতে বিশ্বাস করে সে ব্যবস্থা করব। সে ভাবনা তোমার নয়। তবে এটি যদি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে অথবা যদি প্রমাণ পাই এর উপযুক্ত তুমি নও, তা'হলে ফিরিয়ে নেব।

বালক বন্দুকটি তার স্কন্ধে স্থাপন করে অপূর্ব ভঙ্গিমায় উপযুক্ত গাম্ভীর্যে বাদশাহ্কে অভিবাদন করে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের বীর সৈনিকের ন্যায় তালে তালে পা ফেলে কক্ষ পরিত্যাগ করে।

যে পথে এসেছিল জাফর ওরফে আবু বা সিরাজুদ্দিন, সেই পথেই আবার সে ফিরে যায়। এবারেও কক্ষের পর কক্ষ পার হতে হয় তাকে। প্রহরী নেই। অপর কেউ-ই নেই। মায়ের মুখে শুনেছে বহুকাল আগে, মুঘলবংশের সৌভাগ্য-সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন বাদশাজাদারা স্ফূর্তি-বিলাসিতায় গা ভাসালেও অলস ছিলেন না কেউ-ই। দিল্লীর কেল্লা এভাবে ঝিমিয়ে থাকত না কখনো। বিশেষ করে মধ্যাহ্নের পর। কারণ মধ্যাহ্ন ছিল নাশন্ মহলের প্রাতঃকাল। মধ্যাহ্নের ঠিক পূর্বে রাতের নিদ্রা ভাঙত তাদের। আর রাত শুরু হত ঊষার পূর্ব মুহূর্তে।

যখন পাখিরা তাদের কুলায় বসেই ডাকতে শুরু করে একটু বেশি আলো হবার অপেক্ষায়।

বালক মায়ের কক্ষে প্রবেশের আগে বন্দুকটা একবার দেখে নেয়। মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি। ফিরিঙ্গির বন্দুক। এই নল ওদের দিকেই ফেরাতে হবে। কিন্তু তার আগে চাই প্রস্তুতি—চাই যোগ্যতা।

মা, রাজপুত-রমণী লালবাঈ পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে শুধু পুত্রকেই দেখে না, তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় জাফরের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে। দৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তার। মুখে ফুটে ওঠে জিজ্ঞাসা।

—কোথায় পেলে?

—বাদশাহ্ দিয়েছেন।

—আবু! মায়ের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

—মা।

—অকারণে মিথ্যে বলতে শিখেছ দেখছি।

—মা, কিতাবে পড়েছি, পুত্রের মনের কথাও মায়েরা বুঝতে পারেন। মুখ ফুটে বলতে হয় না। অথচ তুমি আমার মুখের কথাও বিশ্বাস করলে না।

—কিন্তু এই বন্দুক—বাদশাহ্ তোমায় দেবেন কেন? তোমার বাবারও যে এত সুন্দর জিনিস নেই।

—বাবা বাদশাহ নন।

—ছিঃ, আবু!

—আমি বাবার অবমাননা করছি না। —আমি সত্যি কথা বলছি।

লালবাঈ-এর নজর পড়ে বালকের হাতের দিকে। বলে ওঠে,—একি, তোমার আঙুলে কি হল?

—পুড়ে গিয়েছে।

—কি করে?

জাফর সমস্ত ঘটনা একে একে মায়ের কাছে বলে যায়। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে বাদশাহের যে খেদোক্তি তার কানে গিয়েছে তাও বলতে ভোলে না।

লালবাঈ পুত্রকে বাহুপাশে বদ্ধ করে তার ললাট চুম্বন করে। তারপর হাসিমুখে তার হাত থেকে বন্দুকটি নিয়ে গবাক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। সেটিকে সঠিক পন্থায় বাগিয়ে ধরে লক্ষ্য স্থির করে বাইরের কোন দ্রব্যের প্রতি।

—তুমি এমন অনায়াসে কীভাবে বন্দুক ধরলে মা! দেখে ঠিক মনে হয় অভ্যাস রয়েছে।

—তোমার বাবা শিখিয়েছিলেন। হারেমের বেগম করে রাখবার বাসনা মনে মনে কোনদিনই ছিল না তার। যা দণ্ড শেষ পর্যন্ত তাই থাকতে হয়েছে।

—তুমি—তুমি শিকারে গিয়েছ কখনো ?

—পাগল। তাই কি কখনো সম্ভব ? তবে শিকার করেছি একটা।

—কোথায় ?

—এইখানে দাঁড়িয়ে

—এই গবাক্ষের সামনে ?

—হ্যাঁ।

—আমি বুঝতে পারছি না, মা।

লালবাঈ হেসে এগিয়ে এসে পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বলেন,—এমন কিছু বড় শিকার নয়। একটা কুকুর ক্ষেপেছিল। কোন্ এক ফিরিঙ্গি দিল্লীতে এসে তাদের দেশের কুকরটি উপহার দিয়েছিল এক বাদশাজাদাকে। বিরাট চেহারা সেই কুকুরের। ক্ষিপ্ত হয়ে দু'একজনকে দংশন করবার পর সবাই ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করল। আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম ধুঁকতে ধুঁকতে আমারই বাতায়নের পাশ দিয়ে সেটি চলেছে। তোমার বাবা সেদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এখানে, শিকার থেকে ফিরে। বন্দুকটি হেলান দেওয়া ছিল দেওয়ালে। আমি সেটি তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লাম। কুকুরটি লুটিয়ে পড়ল।

বালকের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাকে যেন জীবনে নতুন করে চিনল। বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—তারপর ?

—তোমার বাবা চমকে উঠলেন। ভাবলেন কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেল বুঝি। তারপর সব দেখেশুনে খুব তারিফ করলেন আমায়। কিন্তু করলে হবে কি ? সবাই বলাবলি করতে লাগল, হারেম থেকে গুলি ছুঁড়ল কে ? শেষে তোমার বাবাকেই বলতে হল যে, তিনি ছুঁড়েছেন।

—মিথ্যে কথা।

—হ্যাঁ, আমাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মিথ্যের আশ্রয় নিলেন বৈকি।

—লজ্জা ?

—লজ্জা ছাড়া কি আবু ? প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়াই যে মস্ত লজ্জা।

আবু সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,—আমি মানি না।

—আমিও না। কিন্তু আমি তো পুরুষ নই। তাই অনেক কিছুই মনে মনে না মেনে কার্যত মেনে নিতে হয়।

—তোমায় আমি শিকারে নিয়ে যাব মা।

—ওইটুকু বাকি আছে। আমার কথা এখন থাক। তোমার আঙুল ক'টা দেখছি লাল হয়ে উঠেছে।

—জ্বলুনি কমেছে মা, তবে ব্যথা হচ্ছে।

—বাদশাহ্ নিজে যখন দাওয়াই দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই ফোস্কা পড়বে না। তুমি বরং কাল আর একবার বাদশাহের কাছে গিয়ে দাওয়াই দিয়ে এসো।

জাফর বন্দুকটি নাড়াচাড়া করতে থাকে। তারপর মায়ের দিকে চেয়ে তার মুখ স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মায়ের মুখও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। আগ্নেয়াস্ত্র লাভে পুত্রের আনন্দ তিনি অনুভব করেন মনপ্রাণ দিয়ে।

—কিন্তু আবু, এটিকে ব্যবহার করা শিখতে হবে।

—আজই যাব মা। একটু পরেই, আমি হাফিজ মহম্মদ খলিল সাহেবের কাছে খবর পাঠাচ্ছি।

—তিনি কি এসব ব্যাপারে তোমায় ততটা উৎসাহিত করবেন?

তাঁকে তুমি চেন না মা। তিনি আমার প্রধান শিক্ষক বটে। কিন্তু সব ব্যাপারেই তাঁর সমান উৎসাহ। শুধু উৎসাহ নয়—অদ্ভুত দক্ষতা। অতবড় পণ্ডিত এমন কী করে হল বুঝতে পারি না। যদি সম্ভব হত, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। আনব মা একদিন?

—না আবু। তাতে হয়তো তাঁকেই অসুবিধায় পড়তে হবে। মুঘলবংশ নিয়ে বাঙলা মুলুকে ফিরিঙ্গিরা অনেক কিছুই রটনা করছে—যা তুমি জান না। দিল্লীর অধিবাসী সেকথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু হিন্দুস্থানের প্রান্ত দেশগুলি দিল্লী থেকে অনেক দূরে। সেসব স্থানের অধিবাসীরা এদের রটনা বিশ্বাস করলে তাদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

—তাই হবে মা।

—দুঃখ করো না আবু। খলিল সাহেবের মত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় আমার কম দুঃখ নয়। কিন্তু এটা বাদশাহ্ আকবরের রাজত্ব নয়। আওরঙজেবেরও নয়। তাই হারেমে আসতে বলতে পারি না কাউকে। যদি তেমন দিন আসে, মুঘল-বংশকে যদি তোমরা আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পার তা'হলে একদিন পর্দায় আড়ালে বসে খলিল সাহেবের সঙ্গে মনের সুখে আলাপ করব। তোমার কোর-আন-সরিফের শিক্ষক হাফিজ ইব্রাহিমের কণ্ঠের পবিত্র পাঠ শুনব। অবিশ্যি তোমার হস্তলিপির শিক্ষক সৈয়দ জালাল-উদ্দিন হায়দার সাহেবের কাছে, তুমি যেমন মুক্তোর মত লিখতে শিখেছ, তেমন লেখা

কোনদিনই লিখতে পারব না। সে বয়স তো নেই।

—সব কিছুই তা'হলে নির্ভর করছে ফিরিঙ্গিদের চলে যাবার ওপর? কারণ মারাঠা শক্তি ওদের কাছে বার বার হার মানছে। ওরা দিল্লী দখল করবেই।

—হ্যাঁ। হিন্দুস্থানের তারা কেউ নয়। তারা বিদেশী। এদেশে এসেছে লুটেপুটে দেশটাকে নিঃস্ব ক'রে দিতে। বাদশাহের যে দীর্ঘশ্বাসের কথা তুমি বললে তা এই জন্যেই।

বালক গম্ভার হয়। লালবাঈ লক্ষ্য করেন, পুত্রের মুখে ইতিমধ্যেই গোঁফের রেখা। ঠিক বালক আর বলা চলে না তাকে। বলা যেতে পারে কিশোর। কণ্ঠস্বরেও তার ভাঙনের লক্ষণ। এই ভাঙন ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বরকে গম্ভীর করে তুলবে। পুত্র তাঁর যৌবনে পদার্পণ করবে কয়েক বছরের মধ্যেই। ভাবতে ভাল লাগে। তবে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এমন সরল, সাহসী ও ধর্মপ্রাণ বালকের সব স্বপ্ন সব আশা মরীচিকাই থেকে যাবে। শাহ্ আলমের অনেক পৌত্রের মত সেও অলস জীবন যাপনে বাধ্য হবে। কারণ করবার মত কোন কাজ নেই এদের। দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বার হয়ে আসতে চাইলেও লালবাঈ আপ্রাণ চেষ্টায় চেপে রাখেন।

—কি ভাবছ মা?

—অনেক কিছু। যার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই। তোমার মত অল্প বয়স না হলেও আমি স্বপ্ন দেখি আর।

—জানি। কিন্তু স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পার না বলে তোমার কষ্ট।

—তুমি পারবে তোমার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে?

—চেষ্টা করব। খুদাতাল্লা আমার সহায় হবেন।

—তুমি সফল হলেই আমার সফলতা। আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবার একমাত্র পথ তুমি।

—আর বাবা?

—তিনি—তাঁরও তো বয়স কম হল না। এক সময় তিনিও স্বপ্ন দেখতেন, যখন রাজস্থান থেকে আমায় বেগম করে নিয়ে এলেন। এখন হয়তো স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমিও আর প্রশ্ন করি না। ভুলে গেলেও, সে-দোষ তাঁর নয়।

—তিনি বোধহয় ভাবেন, বাদশাহ্ না হলে কিছু করা যায় না।

—না, এটা তোমার ভুল ধারণা। তেমন কিছু ভাবলে আমি বুঝতে পারতাম। তৈমুর বংশের মসনদের জন্যে অনেক রক্তপাত ঘটলেও আর ঘটবে

না। কারণ ঘটবার মত গুরুত্ব এবং মূল্য মসনদের আর নেই। কখনো যদি সেই মর্যাদা ফিরে পায় দিল্লীর মসনদ, তবে ঘটুক রক্তপাত—আপত্তি কি ?

—না, আপত্তি নেই। কারণ সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই আসনে বসে অধিকাংশ সময়ে। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেই যে সবচেয়ে যোগ্য হব, এমন কোন কথা নেই।

—তুমি একদিন চাঁদবিবি আর রানা দুর্গাবতার কথা বলেছিলে। আকবর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তারা।

—হ্যাঁ, তাঁরা বীরাঙ্গনা। রাণা প্রতাপের কথাও ভুলে যেও না। মুঘল বাদশাহের অপরিমেয় শক্তির কথা জেনেও তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন নি। আজ যদি তৈমুর বংশের কেউ স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলোকে সংহত করে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ?

বালকের চোখ দু'টি উত্তেজনায় চকচক্ করে ওঠে। হিন্দুস্থানের ইতিহাস থেকে সবরকমের শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় বটে। চাঁদবিবি, দুর্গাবতী, প্রতাপ—তারই বংশের শ্রেষ্ঠ বাদশাহের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিলেন বলেই, তারও শত্রু নন তাঁরা। কারণ এখন তাঁরা ইতিহাসের চরিত্র।

একটু পরে সিবাজ বিদায় নেয়। যাবার আগে বন্দুক কাঁধে সামরিক কায়দায় মাকে অভিবাদন জানায়। লালবাঈ পুত্রের দিকে চেয়ে থাকেন। দরজার পর্দা একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে অদৃশ্য হয়।

অতীতের দৃশ্যপটগুলি একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার বিলীন হয়ে যায়। যুবক আবু জাফর সিরাজউদ্দিন সচেতন হয়ে ওঠে। সে চেয়ে চেয়ে দেখে হুমায়ুনের সৌধের মাথার ওপর শাদা মেঘের আনাগোনা! মিনারের আনাচে কানাচে কপোত-কপোতীর প্রাণ-চাঞ্চল্য। দূর থেকে ভেসে আসে বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ। কোন হিন্দুর গৃহ উৎসবে মেতেছে। আর একটু পরেই সূর্য ডুববে। শাদা মেঘে অস্তমিত রবির কিরণ প্রতিফলিত হয়ে সারা আকাশে আগুন জ্বালাবে। তারপর সেই মেঘের রঙ ফিকে হতে হতে একসময় অদৃশ্য হবে। মসজিদে মসজিদে আজান-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে। সেই ধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠবে।

জাফর তার আগ্নেয়াস্ত্রটি বুকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চোদ্দ বছর আগে এটিকে বেশ ভারী মনে হত। কিন্তু এই চোদ্দ বছরে আগ্নেয়াস্ত্রটি একই রকম রয়েছে অথচ তার দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি—দৈর্ঘ্যে এবং কিছুটা প্রস্থেও।

ধীরে ধীরে জাফর এগিয়ে যায় বাদশাহ্ নাসির-উদ্দিন হুমায়ুনের সমাধির কাছে। অপলক নেত্রে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে সেইদিকে, যেখানে অন্তত আড়াই শো বছর পূর্বে শায়িত হয়েছিলেন মুঘল বংশের দ্বিতীয় পুরুষ, যাঁকে অকাল-মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে তাঁর পিতা নিজের প্রাণ দান করেছিলেন।

জাফর আগ্নেয়াস্ত্রটি যথোচিতভাবে ধরে অভিবাদন জানায় তার এই পূর্বপুরুষকে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসে স্মৃতি-সৌধের বাইরে। একটি সুদৃশ্য কিতাব ও লেখনী ছিল সোপানশ্রেণীর ওপর। এই কিতাবে দিনের পর দিন অপূর্ব শিল্পকার্যের ন্যায় রচিত হচ্ছে তার দিওয়ান—দিওয়ান-ই-আওয়াল।

কিতাবটি হাতে তুলে নেয় সে। অপর হাতে বন্দুক। দু'হাতে যেন দুই মেরুপ্রান্তের দু'টি জিনিস। জাফরের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। কিতাব ও বন্দুক। কিতাবকে যদি খুদাতাল্লার পক্ষে রাখা যায়, বন্দুকটি কি তবে দুশমনদের কাছাকাছি রক্ষিত হতে পারে? একটু ভেবে সজোরে আপন মনে মাথা নাড়ে জাফর। না না, কখনই নয়। বন্দুক দুশমন হতে পারে না। বন্দুকের অপব্যবহারে দুশমন জেগে ওঠে। এর সদ্ব্যবহারে আল্লার কৃপা নিশ্চয়ই ঝরে পড়ে। নইলে পয়গম্বরের অন্যরকম আদেশ থাকত। তিনি পৃথিবীতে অস্ত্রচালনা নিষিদ্ধ করে দিতেন। যেখানেই অন্যায় আর অবিচার অস্ত্রদ্বারা তাকে ধ্বংস করতে হবে। যুগে যুগে অস্ত্রের মান উন্নত হতে থাকলেও অস্ত্র অস্ত্রই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের মধ্যে পার্থক্য নেই। দুটোর কোনটাই পরিত্যাগ করা যায় না। বাবরও করেন নি।

ফিরিঙ্গিরা আসছে। ধর্ম মানে না—নীতি মানে না। এদেশের অধিবাসীর প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। তারা চায় শুধু অর্থ—আর অর্থ। এই ভূখণ্ডকে নিঃশেষিত করে নিজেদের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধশালী করে তোলাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অস্ত্র দিয়ে ওদের রুখতে হবে।

কিন্তু ওরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রলোভন দেখিয়ে ইতিমধ্যেই অধিকাংশ হিন্দুরাজাকে হাত করে নিয়েছে। নবাব ও প্রভাবশালী মুসলমানরাও অনেকে ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। দরিদ্র দেশবাসীকে নিষ্পেষিত করে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সহস্র সুযোগ-সুবিধার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে মতলব হাসিল করছে। ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করা যাবে কিনা বলা যায় না। তবু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে জাফর। বেকায়দায় পেলে ফিরিঙ্গিদের কখনো ছাড়বে না সে। এর জন্যে সবকিছু উৎসর্গ করতে হলে সে করবে। কেউ তার পক্ষে না থাকুক, ঈশ্বর রয়েছেন। আর রয়েছেন অগণিত

দেশবাসী।

অস্ফুট স্বরে জাফর স্বরচিত একটি শ্যার উচ্চারণ করে,—

আল্লাহি হামারি তরফ হ্যায় আয়ে জাফর,

কোই আগব নহি হ্যায় হামারি তরফ না হো।

হুমায়ূনের সমাধি-সৌধ পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে জাফব। কোন তাড়া নেই। শরীরও আজ অবসন্ন। কারণ প্রাতঃকালে বহুক্ষণ ধরে একটি নবাগত খাঁটি আরবী অশ্বকে বশে আনতে হয়েছে। অশ্বটি সত্ত মরুভূমির আবহাওয়া থেকে দিল্লীতে এসে পৌছে বেঁকে বসে। তার দেহে অসীম বল আব মনে বেদুইনের ঔদ্ধত্য। এ ধরনের অশ্ব বরাবরই লোভনীয় জাফরের কাছে। অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক দু'দিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও একে বিন্দুমাত্র নমনীয় করতে পারে নি। তৃতীয় দিনে সে রীতিমত আহত হয়েছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূতলে পড়ে গিয়ে। তখন ডাক পড়ল জাফবেব। বরাবরই এমন হয়। নতুন ঘোটককে ভদ্র করে তুলতে তার সমকক্ষ হিন্দুস্থানে সম্ভবত কেউ নেই।

আজ সকালে তাই তাকে যেতে হয়েছিল অশ্বশালা-সংলগ্ন ময়দানে। নতুন আরবীকে হিন্দুস্থানী করে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষত আজকের তরুণ প্রাণীটি তার স্বাধীনতা বিসজন না দেবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হার মানতে হল তাকে। কেমন যেন কষ্ট হয় জীবদেব ঔদ্ধত্য ভেঙে দিতে। একজনের স্বাধীন-সত্তাকে গুঁড়িয়ে দেবার মত। ফিরিঙ্গিরা যেমন দিচ্ছে এ-দেশের মানুষের মনকে। কষ্ট হয়। তবু উপায় নেই, কারণ, অশ্বকে বড়ই প্রয়োজন।

মনে পড়ে, নতুন ঘোড়াটিব চাহনি, যখন শেষবার জাফব তাকে ঘেরা জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুবিয়ে এনে মাটিতে লাফিয়ে নামল। যেন বলছিল সে,—আমি পরাজিত। সুতরাং আমাব প্রতি তোমার আর কোন মোহ থাকতে পারে না। আমাকে একা থাকতে দাও। একটু নিরিবিলি। হয়ত স্বাধীনতার জন্য চোখের জল অন্তত বিসর্জন দিতে দাও আমার অলক্ষ্যে।

এখন যে কেউ ওই অশ্বটিকে ব্যবহার করতে পারবে। কারণ মানুষের অসীম ক্ষমতার কথা জীবটি জেনে গিয়েছে। বিদ্রোহ করবে না আর। শত্রুব সীমাহীন ক্ষমতার কথা জেনেও যে বিদ্রোহ করে সে মানুষ—জন্তু নয়। মানুষের ভেতরেও খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হৃদয়ে এই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে। তারপর সেই আগুনের ছোঁয়াচ লাগে গোটা দেশের মানুষের হৃদয়ে। তখন সৃষ্টি হয় দাবানলের। সে কি পারবে তেমন একটি দিনের জন্যে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে? জানে না।

পথিমধ্যে হজরত নিজামুদ্দিন আউলার দরগা। জাফর প্রবেশ করে সেখানে। স্থানটির নির্জনতা আর পবিত্রতা তাকে বিহ্বল করে—আচ্ছন্ন করে। তাই সামান্য সময় পেলেই ছুটে আসে এখানে। না এসে পারে না। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে আসবেই। দরগার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বয়সে তার সমান কিংবা কয়েক বছরের ছোটও হতে পারে। নাম তার শাহ্ গুলাম হাসান। সে প্রায়ই এসে বসে জাফরের পাশে। দু'জনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বের স্তরে এসে পৌচেছে।

আজ কিন্তু হাসান সামান্য একটু আলাপের পরই বলে,—হারেম থেকে তোমার ডাক এসেছে।

—ও, তাই বুঝি? আচ্ছা, আজ চলি তা'হলে।

—এসো।

মোতিবিবির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল জাফর। কথা দিয়েছিল, আজ সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে ভ্রমণে বার হবে যমুনার তীর বরাবর অনেক দূর। মোতিবিবিকে দেওয়া অনেক কথারই খেলাপ হয় আজকাল। যদিও মোতিবিবি সুন্দরী এবং তার প্রথম বিবাহিতা বেগম। শুধু মোতিবিবি কেন, তার অপর দুই বেগম খাযুম বাঈ এবং সরফৎ-উল-মহলও অপরূপা। তাদের রূপের ছটায় বেগম-মহল ঝলমল। কিন্তু তারাও তো পারে না তাকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে। তার এ যেন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘোরতর অনিয়ম। সে দেখেছে ভাই মীর্জা জাহাঙ্গীরকে, দেখেছে অন্যান্য ভ্রাতা এবং জ্ঞাতিদের। দিব্যি মেতে রয়েছে সুন্দরী বেগমদের নিয়ে। সে কেন অমন পারে না? সব সময় মনে হয় কী যেন নেই এই বেগম-সাহেবাদের মধ্যে। রূপ ও যৌবন ছাড়াও এমন কিছু—যার অভাবে সে পৌঁছোতে পারছেনা পৃথিবীর বাস্তবতার অনেক উর্ধ্বে কোন সৌন্দর্যলোকে। সেই একই জিনিসের অভাব তাকে বিরাট কিছু করবার প্রেরণা দিতে পারছে না। বেগমরা সবাই ব্যর্থ। ওরা হারেমে বিচরণশীল সজ্জিত পুতুল মাত্র। তিনশত বছরের জীর্ণ ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে চলবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ওদের। না না, এমন সে চায় না। সে চায় নূরজাহানের মত জ্বলে উঠুক ওদের মধ্যে অন্তত একজন। ভালো হোক, মন্দ হোক, অগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখতে চায় সে—যে আগুন ভালমন্দ সবকিছুকেই ভস্মীভূত করবার ক্ষমতা রাখে।

মোতিবিবিকে দেওয়া কথায় খেলাপ হয়েছে। তাকে যদি সে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসত তবে কখনই এমন হত না। এমন কি এতটুকু অনুকম্পা থাকলেও মনে পড়ে যেত সে কথা। ভেবে লজ্জা পায় জাফর। কারণ সে জানে, হারেমে যারা বাস করে তারা যত রূপসীই হোক না কেন, স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে দাবি করবার

শক্তি তাদের থাকে না। থাকলেও হারিয়ে ফেলে। কারণ তারা সচেতন যে দাবিদার শুধু একজনই নয়। তাই কদাচিৎ স্বামী অজ্ঞাতেও যদি তাদের মধ্যে কাউকে বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান তবে সে বিগলিত হয়ে পড়ে। আর স্বামী যদি স্বয়ং বাদশাহ্ হন তবে তো কথাই নেই।

অপরাধ-বোধ জাফরকে চেপে ধরে। তার কবি-মন তার চোখ দু'টিকে সজল করে তোলে। একটা আক্ষেপ মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। ভাবে, শুধু বাইরের চোখ দিয়েই সব দেখতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে সে। এই লঘু চিত্ততা নিয়ে দিওয়ান রচনার স্পর্ধা করে। অন্তরের চোখ খোলা না রাখলে যে কিছুই হবে না। পৃথিবীর আদি কবির মত জাফরের মুখ থেকে অজ্ঞাতে নির্গত হয় :

দেখ্ তু রোশনিয়ে দিদাইয়ে বাতিন্ সে জাফর
চাস্মে জাহির কি উসে নূরে বাসিরাত সে না দেখ্।

[জাফর ! মানস-চক্ষুর আলোতে সব কিছু পযবেক্ষণ কর। দেহের যে দু'টি চোখ রয়েছে তা দিয়ে অগভীর দৃষ্টি মেলে কিছু দেখো না।]

কেল্লায় প্রবেশের মুখে পিতা মৈনুদ্দিনের সম্মুখে পড়ে যায়। পিতাকে সাধারণত এড়িয়ে চলে জাফর। যদিও মৈনুদ্দিনের প্রতি তার শ্রদ্ধা অসীম। সে জানে পিতার মনেও তার মত অহরহ একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। শাহ্ আলম অতি বৃদ্ধ। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত যে কোন সময় ঘনিয়ে আসতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর পিতার বাদশাহ্ হবার সম্ভাবনা। অথচ একটা দুর্দিন, যা নিয়তির মত দুর্নিবার —দ্রুত এগিয়ে আসছে। সারা হিন্দুস্থান সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের করতলগত হতে চলেছে। অথচ এমন শক্তি নেই, এমন সংঘবদ্ধতা নেই যে, প্রতিকার কিছু করতে পারা যায়। তাই পিতা অশান্ত।

জাফরকে দেখে মৈনুদ্দিন থেমে পড়েন। বলেন,—রোশন-আরাবাগ থেকে এলে বুঝি ?

—না।

—তবে কি হায়াৎ-বক্স্-বাগ ?

—না।

—হাতে কিতাব দেখছি। পিতার কণ্ঠস্বরে যেন বিদ্রূপের আভাস।

জাফর জানে পিতা তাকে পছন্দ করে না। মাতা লালবাঈও এ বিষয়ে সচেতন। পিতার স্নেহের সিংহ-ভাগ তার অপর ভ্রাতা মীর্জা নীলি পেয়ে বসে রয়েছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। স্নেহ আকর্ষণ করবার ক্ষমতা বেশি আছে

বলেই নীলি অধিকতর সৌভাগ্যবান। স্নেহের ব্যাপারে কাউকে বলবার কিছু নেই। জোর করেও এ জিনিস আদায় করা যায় না। কারণ এ জিনিস যুক্তি মেনে চলে না। হৃদয় সম্বন্ধীয় সবকিছুই চিরকাল যুক্তিতে অগ্রাহ্য করে এসেছে।

পিতার প্রশ্নে নিরুত্তর থাকে জাফর।

—তবে বুঝি প্রজাপতি শিকারে গিয়েছিলে বন্দুক নিয়ে?

—আপনি তো জানেন, আমি শিকারে অপটু নই।

—জানি বৈকি। লোকের মুখে শুনেছি। তোমার দীর্ঘ এবং পেশীবহুল দেহ দেখেও বিশ্বাসের প্রবণতা জাগে। তবে নিজের চোখে তোমার শিকার দেখে সন্দেহ নিরসন করতে পারি নি এখনো।

—অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আপনি গেলে খুবই আনন্দ হবে আমার। কিশোর বয়সে কতবার কল্পনা করেছি যে, আপনি আমার শিকার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

—কিশোর বয়সে অমন অনেক কল্পনাই থাকে, বাস্তবের সঙ্গে যার এতটুকু মিল নেই। আমারও অনেক কিছু ছিল কল্পনা। দিনে দিনে একটি একটি করে গুঁড়িয়ে গিয়েছে আঘাতের পর আঘাত এসে।

—আমি জানি।

—জান? ও—। মৈনুদ্দিন বুঝতে পারে, লালবাঈ বলেছে তার পুত্রকে।

জাফর একদৃষ্টে পিতার দিকে চেয়ে থাকে।

মুহূর্তের ভাবাবেগ সামলে নিয়ে মৈনুদ্দিন বলে ওঠে,—শুনলাম একটি ঘোড়া নিয়ে খুব বেগ পেয়েছ আজ।

—হ্যাঁ। বড্ড তেজী। খাঁটি জাতের।

—নীলি বলল, ও অনেক কম সময়ে কাজটা করতে পারত।

জাফরের মুখে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। পিতার স্নেহ আকর্ষণের জন্যে নীলি যা খুশি তাই বলে। কিন্তু সে বলেছে বলেই পিতার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথাটা বিশ্বাস করে ফেলা উচিত হয় নি। কারণ তিনি নিজে একজন দক্ষ অশ্বারোহী। স্নেহ কি এতই অন্ধ?

—দিওয়ান তুমি লিখছ, তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই আবু। কারণ মুঘলবংশ এখন অকেজো। কিছু না করার চেয়ে ওসব লেখা অনেক ভাল। তবে শুনলাম, তুমি নাকি ঐশ্বরিক ব্যাপার নিয়ে পাগলামী শুরু করেছ?

—না তো!

—যার কাছে শুনেছি সে মিথ্যা বলে না। তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ শুরু

করেছ। এমন কি তোমার দু'একজন শিষ্যও জুটে গিয়েছে।

—ধর্মের কথা নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে। তেমনি শুনতেও, ভাল লাগে কতজনার। তারা এসে শোনে। তবে জ্ঞানের কথ তো নয়—ভক্তির কথা।

মৈনুদ্দিন স্থান ত্যাগ করবার সময় বলে যান,—বেশ বাড়াবাড়ি করো না। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান না থাকলে নতুন কথা শোনানো যায় না।

জাফর চুপ করে থাকে। পিতা হয়তো ভুলে গিয়েছেন, শৈশবে কাদের কাছে সে শিক্ষালাভ করেছে। তাদের মধ্যে হাফিজ মহম্মদ খলিল আজও জীবিত। তবে তিনি এখন দিল্লীতে নেই। কাউকে না বলে কোথায় যে চলে গিয়েছেন। পিতা হয়তো খোঁজও রাখেন না। গভীর রাতে প্রাসাদের সর্বত্র যখন চাপা ভোগবিলাসিতার ফিসফিসানি তখন সে বেগম-মহলের হাতছানির আকর্ষণ উপেক্ষা করে একটি নির্জন কক্ষে কিতাব পাঠে নিমগ্ন থাকে। তবু পিতা ঠিকই বলেছেন। জ্ঞানসমুদ্র অসীম। ধর্মের সীমা অন্তহীন। নতুন কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু সে তো নতুন কথা বলে না। সে শুধু বিবেকের কথা বলে। প্রতিটি মানুষের বিবেকের কথাই এক। যেমন, প্রতিটি ধর্মের সার কথায় কোন গরমিল নেই।

•

মোতিবাঈ ঘুমিয়ে পড়েছে। বলা যেতে পারে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কারণ সবে সন্ধ্যা হয়েছে। কক্ষে কক্ষে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। এখনো প্রাসাদের প্রায় প্রতি কক্ষেই বাতি জ্বলে, যেমন জ্বলতো শাহ্‌জাহানের আমলে, যেমন জ্বলতো আওরঙজেবের বাদশাহী কালে। তবে বাতির তেজ অনেক কম। সেদিনের সেই চোখ ধাঁধানো রোশনাই আর নেই। নেই কোন আলোকমালা যা প্রাসাদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তোলে।

মোতিবিবি ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার মুখের ওপর কক্ষের বাতির রঙীন রশ্মি এসে পড়েছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। মোতিবিবি ঘুমিয়ে পড়েছে—ঠিক যেন মনে হচ্ছে শয্যার ওপর ভেঙে পড়েছে। নিদ্রার জন্য কোন আয়োজন করতে হয় নি তাকে। নিদ্রা সহসা এসে তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। তাই তার শয়নে কোন পরিপাট্য নেই—নেই কোন সতর্কতা।

অত্যধিক উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বৈত ফল মোতিবিবির এই অসময়ের নিদ্রা। মধ্যাহ্নের পর থেকেই অপরাহ্নের জন্য উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা। কক্ষের ভেতরে অবিরত পায়চারী। বাতায়ন-পথে বারংবার দৃষ্টিক্ষেপ—সূর্যের আলো কতটা নিস্তেজ হয়েছে দেখবার জন্য। বহুদিন পর স্বামী তাকে নিজে থেকেই বলেছে, অপরাহ্নে নিয়ে

যাবে যমুনার তীরে। কতদিন পর জাফর এমন কথা বলল। খুশি ঝরে পড়েছিল তার দেহ-মনের প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে। মনের মধ্যে উদিত হচ্ছিল সেই অবিস্মরণীয় রজনীর কথা, যেদিন প্রথম জাফরের হস্ত তার দেহ স্পর্শ করেছিল। সেদিনও জাফর তার অতলান্ত চোখের দৃষ্টি নিয়ে বলেছিল, —কাল রাতে আমরা দু'জনা যাব যমুনায় নৌকা-বিহারে। কাল পূর্ণিমা, মোতিবাঈ।

সেদিনের সেই দৃষ্টির মধ্যে কী যেন এক একাগ্রতা ছিল জাফরের, যা আজকে নেই। প্রত্যাশাও করা যায় না। কারণ সেদিন জাফরের জীবনে মোতিবাঈ ছিল একমাত্র রমণী। আজ অনেক অংশীদার। তাই তার একাগ্রতা কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শুধু কি তাই? মোতিবাঈ-এর কতবার মনে হয়েছে, শুধু রূপসুধা নয়, দেহসম্ভোগ নয়, আরও কী যেন চায় মুঘল বংশের এই পুরুষটি। কিসের যেন অভাব—যে অভাব তার কিছুতেই মিটছে না। খায়ুমবাঈ এবং সরফৎ-উল্‌মহলও সে অভাব পূর্ণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই বার বার ঘুরে মরছে অমন বিরাট-দেহী পুরুষটি তাদের কক্ষে বুভুক্ষু হৃদয়ে।

কী চায় জাফর, বুঝতে পারে নি মোতিবাঈ। ওই দুই চোখে কিসের আবেদন ফুটে ওঠে তাও উপলব্ধি করবার ক্ষমতা নেই তার। সে দেখেছে তার চেয়ে কম রূপ নিয়েও হারেমের অন্যান্য যুবতীরা তাদের নিজের নিজের পুরুষকে তৃপ্তি দিতে পারছে। অথচ তারা তিনজনই ব্যর্থ হচ্ছে দিনের পর দিন। অদ্ভুত পুরুষ। এই ধরনের পুরুষের সঙ্গে সাদি দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

তবু জাফরকে ভালবাসে মোতিবাঈ। তার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ভালবাসে। তাই এতদিন পর সে যখন নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে ভ্রমণে যাবার কথা বলল, তখন আনন্দ তার উপচে উঠেছিল। তারপর প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। শেষে অস্থির হয়ে তার নিজের পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিল নিজামুদ্দিনের দরগায়। ওই দরগা জাফরের একটি নিয়মিত গন্তব্যস্থল। কিন্তু পরিচারিকা এসে সংবাদ দিল, ওখানে জাফর অনুপস্থিত। হতাশায় ভেঙে পড়েছিল মোতিবাঈ। অশ্রু বিসর্জন করেছিল। সেই অশ্রুর রেখা এখনো নিদ্রিত মোতিবাঈ-এর মুখ চোখে লেগে রয়েছে।

জাফর কক্ষে প্রবেশ করে নিদ্রিতা মোতিবাঈ-এর কপালে অশ্রুরেখা লক্ষ্য না করলেও, ওই যুবতীর দেহ-ভঙ্গিমায় একটি ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে তার কাছে। বুকের ভেতরটা টনটন্ করে ওঠে তার। এগিয়ে গিয়ে শয্যার ওপর বসে। মোতিবাঈ-এর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিতেই ঘুম ভেঙে যায় নারীর।

—তুমি! এসেছ?

—হ্যাঁ, মোতি। বেড়াতে যাবে না?

—এখন? রাত যে অনেক হল।

—না তো? সবে সন্ধ্যা। চাঁদ উঠবে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?

—এমনি।

—শরীর খারাপ?

—না। মোতিবাঈ-এর কান্না পায়।

—চল তবে।

—কিন্তু—একটু দাঁড়াবে? আমি তৈরি হয়ে নেব।

—এই তো সুন্দর দেখাচ্ছে। এইভাবে চল।

—না, ছিঃ। আচ্ছা, কোন্ রঙ তোমার পছন্দ?

—শাদা।

—যাঃ, আমি শাদা পরব কেন! শাদা ছাড়া?

—অন্য সবই রঙ। শাদা রঙ নয় বলেই পছন্দ।

—আমায় কোন্ রঙ পড়লে মানাবে।

—তা তো জানি না।

—তবু, বল না কিছু।

—বেশ। আশ্‌মানি।

—খুব ভাল। এবারে বল, আর কি পরব। কোন্ অলঙ্কার?

—দরকার নেই।

—তাই কি হয়? তুমি কেমন সব কথা বল বুঝি না।

—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—আর দেরি হবে না। এখুনি আসছি। তুমি অপেক্ষা কর।

জাফরের মন খারাপ হয়। নিজেকে সজ্জিত করে তুলতে মোতিবাঈ অনেকটা সময়ের অপব্যয় করবে। অথচ এই রূপ দেখবার সুযোগ পাবে না দিল্লীবাসীর একজনও। কারণ তাদের শকটের আশেপাশে ভিড় থাকবে না। তবে দূর থেকে মোতিবাঈকে যারা দেখবে তারা মোহিত হবে। ওর রূপ দেখে নয়। বোরখার ফাঁক দিয়ে পোশাকের চাকচিক্য, অলঙ্কারের ঝল্‌কানি এবং রূপের কল্পনা করে মুগ্ধ হবে তারা।

শয্যার ওপর গা এলিয়ে দেয় জাফর। তাকিয়ার ওপর মাথা রাখবে বলে সেটিকে একটু ওপর দিকে তুলতেই নীচ থেকে বার হয়ে আসে, একটি সুদৃশ্য রূপার কৌটো। মশলাপাতি আছে নিশ্চয়। কিংবা মুখমণ্ডল সুশোভিত করে তোলবার

সরঞ্জাম। কৌটোটি তাকিয়ার নিচে রাখতে গিয়ে ভুলে যায়। পিতা মৈনুদ্দিনের কথাগুলো সহসা তাকে কৌটোর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মস্তিষ্ককে অন্যভাবে সক্রিয় করে তোলে। শাহ্ আলমের পর তার পিতার শাহ্ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। তিনি শাহ্ হলে পরবর্তী শাহ্ হবে মীর্জা নীলি। জাহাংগীর বাদশাহ্ হলে খুব খারাপ হত না। ভেতরে তার যথেষ্ট তেজ। ভাল পরামর্শদাতার সাহায্য পেলে নিশ্চয়ই সে ফিরিঙ্গিদের জব্দ করতে পারত। কিন্তু মীর্জা নীলি? জাফর, নীলির ওপর ততটা ভরসা করতে পারে না।

অন্যমনস্কভাবে কৌটোটা নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় জাফর সেটা খুলে ফেলে। তার আয়ত চোখদুটো বিস্ময়ে আরও বড় বড় হয়ে ওঠে। যেন কাল-নাগিনীর দাঁত দেখতে পেয়েছে ওটির ভেতরে।

আফিম। তার প্রথমা ভার্যা আফিম-সেবিনী। প্রভাতে আরবদেশীয় অশ্ব তাকে পরিশ্রান্ত করে তুললেও দুর্বল করতে পারে নি। কিন্তু এখন যেন নিজেকে বড় দুর্বল বলে বোধ হয়। এই পরিপূর্ণ যৌবনে সে সহসা প্রৌঢ়ত্বের দৌর্বল্য অনুভব করে। মোতিবাঈ আফিম সেবন করে। নেশা করে!

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে জাফর। হাতের কৌটো তেমনি খোলা থাকে। মুঘল-হারেম ঐশ্বর্যের দৈন্যে ভুগলেও পুরাতন প্রথার অনেকগুলোকে যে আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে একথা সে জানে। তাই বলে তারই বেগম যে আফিমের নেশায় আক্রান্ত একথা বিশ্বাস করতে হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়ে যায়। ঘোরতম বিতৃষ্ণা এবং নিদারুণ আক্রোশে মনটা ভরে ওঠে। কিন্তু কার ওপর রাগ করবে সে? অদৃশ্য কোন কিছুকে শত্রু হিসাবে কল্পনা করলেও তার বিরুদ্ধে লড়াই করা চলে না।

কৌটোটিকে দূরে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হয়। তবু সেটাকে হাতেই ধরে রাখে। সুশোভিতা মোতিবাঈ কক্ষে প্রবেশের পূর্বেই সেটিকে আবার তাকিয়ার নীচে যথাস্থানে রেখে দেবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল বোধহয় জাফর। কারণ পর্দার ওপাশে ছায়া পড়লেও দেখতে পায় না। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে পর্দা সরায়, তাও লক্ষ্য করে না। শেষে চকিত-চরণে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় এক নারী। লীলায়িত ভঙ্গিতে সাবেকী কায়দায় অভিবাদন জানায়।

চমকে ওঠে জাফর।

—আমি মোতি নই।

—দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এসময় তুমি এখানে যে সরফৎ বেগম?

—আসি মাঝে মাঝে। আমি জানতাম না আপনি রয়েছেন।

—মোতিবাঈ যমুনার তীরে বেড়াতে যাবে।

—উদ্ভট সখ। আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হচ্ছে।

—না তো ?

খিলখিল করে হেসে সরফৎ বলে,—হচ্ছে না ? তবে তো মোতিবাঈ-এর কপাল ফিরেছে।

—তুমি এভাবে কথা বলছ কেন ?

—ভালভাবে বলছি না বুঝি ? অন্যায় করেছি। আমি তবে চলি।

—তোমায় থাকতে কিংবা যেতে বলার অধিকার আমার নেই। কারণ এটি আমার কক্ষ নয়।

সে কি ? আপনার নয় ? সবই তো আপনার। আমার কক্ষও আপনার। আমরা শুধু সাজিয়ে রাখি। আর ফুলদানীর ফুলের মত সেজে থাকবার চেষ্টা করি—যদি কখনো ভাল লেগে যায় আপনার। ভুলেও যদি কখনও হাত দিয়ে ফেলেন। ভ্রমরটি যদি কখনও এসে বসে।

—আমায় কি তিরস্কার করছ সরফৎ-উল্-বেগম ?

—না না। ছি-ছি। সে ধৃষ্টতা আমার কখনই হবে না। হলেও বা আপনি সহ্য করবেন কেন ? আমরা কে ? আপনার পায়ের পাদুকার চেয়েও নিকৃষ্ট।

—তিরস্কার আমার প্রাপ্য। কিন্তু বুঝতে পারিনা কী করে তোমাদের আনন্দ দেব। কিছুই যে ভাল লাগে না।

—ও, সেইজন্যেই বুঝি মনকে ভুলিয়ে রাখতে মোতিবাঈ-এর কৌটোয় হাত পড়েছে ! ভাববেন না, আমার কাছেও রয়েছে। দরকার হলে সেখানেও যেতে পারেন। আমি জানতাম না আপনার এ অভ্যাস আছে।

—না। কোন নেশাই নেই আমার। কিন্তু তুমিও কি খাও ? তোমরা সবাই ?

—না। সবাই কেন ? যারা বৃদ্ধা, শরীর অচল হয়ে পড়েছে, শুধু তারাই।

কিন্তু তোমরা তো বৃদ্ধা নও।

—ওই একই কথা। যাদের যৌবনে মরচে ধরে, তারা কি যুবতী ? তাই আমরাও খাই।

জাফর নির্বাক হয়ে বসে থাকে।

সরফৎ বেগম হেসে ওঠে। এতদিনে মানুষটাকে আঘাত করা গিয়েছে। ওই সুন্দর সুঠাম দেহ নিয়ে যে পৃথিবীর সমস্ত তরুণীকে জয় করার স্পর্ধা রাখে, তার শিকার করা, ঘোড়ায় চাপা আর দিওয়ান লেখা ছাড়া যেন অন্য কোন কাজ নেই।

—দুঃখ পেলেন ?

—দুঃখ ? হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে খুবই ব্যথিত।

—আর কিছু নয় ?

—কী করতে পারি আমি ?

—অনেক কিছুই। আপনার ভাইদের মত একবার জেগে উঠুন। চোখ চেয়ে দেখুন আমাদের দিকে। রক্তে নেশা লাগান। দেখবেন নিজেও আনন্দ পাচ্ছেন, আর আমাদেরও অসীম সুখ দিচ্ছেন।

—রক্তে আমার কম নেশা নেই বেগম। তৈমূরের রক্ত রয়েছে আমার মধ্যে। হৃদপিণ্ডে সেই রক্তই নৃত্য করছে। কিন্তু এ নেশার খোরাক বড় দুর্লভ।

সেই সময় মোতিবাঈ প্রবেশ করে। অপূর্ব দেখায় তাকে। জাফরের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে। সে এগিয়ে এসে মোতিবাঈকে কাছে টেনে নেয়।

ছিট্‌কে দূরে সরে যায় মোতি। ক্রোধে ফেটে পড়ে সে। চীৎকার করে ওঠে সরফৎকে উদ্দেশ করে,—কেন ? কেন এসেছ এখানে ?

—হঠাৎ চলে এসেছি। জানতাম না।

—হঠাৎ ? আমি মূর্খ ? বুঝি না কিছু ? সহ্য হয় নি তোমার।

—না হলে দোষ দিতে পার না আমায় !

জাফরকে হতচকিত করে দিয়ে মোতিবাঈ হিংস্র সিংহীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সরফৎ বেগমের ওপর। তার বেশবাস ওলট-পালট হয়ে যায়। তাঁর দেহ থেকে কতকগুলো অলঙ্কার ছিন্ন হয়ে ভূতলে পড়ে।

জাফর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। তারপর দু'জনকে দু'হাতে ধরে দূরে নিক্ষেপ করে। ঘৃণায় ক্রোধে সে কাঁপতে থাকে। জলন্ত দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চেয়ে বলে,—তোমাদের এই দেহ ভিন্ন এমন আর কিছুই নেই যা পুরুষকে আকৃষ্ট করে। তোমরা হীন, তোমরা নেশাখোর, তোমরা কামুক। তোমরা সব জান, শুধু ভালবাসতে জান না। তোমাদের ওই দেহের জন্য আমার প্রয়োজনীয়তা যতটুকু ঠিক ততটুকুর জন্যেই এদিকে আসব, নইলে নয়।

মোতিবাঈ ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

সরফৎ দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্থানোদ্যত জাফরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,—আপনি তা'হলে ভালবাসতে জানেন ? অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের মধ্যে একজনকে ভালবেসেছিলেন। সুখী হলাম। অপার তৃপ্তি পেলাম। শুনতে পাই, আপনি সৎ এবং ধর্মনিষ্ঠ। এমন ব্যক্তিরা কখনো মিথ্যা বলে না। সরফৎ উন্মাদিনীর মত হাসতে থাকে। তার ওষ্ঠের একদিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে

থাকে।

জাফর দ্রুত প্রস্থান করে। সরফৎ-এর হাসি তার পশ্চাতে ধাওয়া করে। সরফৎ মিথ্যে বলে নি। সেও তো ভালবাসতে জানে না। নারীকে ভালবাসতে শেখে নি। ভালবাসে শুধু নিজেকে—নিজের কবিতাকে। আর ভালবাসে দেশকে। কিন্তু এই ভালবাসায় নারীর মন ভোলে না। সুতরাং দোষ তারই এবং দোষস্খালনের কোন উপায় জানা নেই। সে অসহায়—সম্পূর্ণ অসহায়।

কাশ্মীর ফটক দিয়ে দিল্লী নগরীতে প্রবেশের বহু পূর্বেই রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয়েছিল। জাফর পরিশ্রান্ত। পরিশ্রান্ত তার অশ্ব। অশ্বপৃষ্ঠে রক্তাক্ত মৃগ। একঘেয়েমী আর আলস্যে দেহ-মন ঝিমিয়ে পড়েছিল ক'দিন থেকে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। আজ ভোর বেলা পোষা বুলবুলের মিষ্টি ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। বাইরে এসে দাঁড়াতেই কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে ডাকল, "এদিকে আয়।" বুলবুলের খাঁচাটি কাকাতুয়ার খাঁচার ঠিক বিপরীত দিকে। ইচ্ছা ছিল বুলবুলের কাছে গিয়ে তার মধুর গান শুনবে। কিন্তু কাকাতুয়ার হুকুম অমান্য করবার সাহস হল না। চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলবে। তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কাকাতুয়া তিরস্কারপূর্ণ চক্ষে ঘাড় বেঁকিয়ে কয়েকবার তাকে দেখে নিয়ে বলে উঠল—"শিকারে যা শিকারে যা।" তারই শেখানো বুলি তাকে শুনিয়ে দিলে গৃহপালিত পক্ষিটি।

ঠিক কথা বলেছে কাকাতুয়া। শিকারে গেলে একঘেয়েমী কেটে যাবে। কাকাতুয়ার আদেশ শিরোধার্য করে একাই যাত্রা করেছিল জাফর আশেপাশের বনজঙ্গলে। সে জানে সময় বড খারাপ। ফিরিঙ্গিরা দিল্লী আক্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন করছে। মারাঠীরা আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হচ্ছে। কিন্তু দেশের কোনখান থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রাজপুত নৃপতিরা নিষ্ক্রিয়। তারা হয়তো ভাবছে এতদিনে মারাঠীরা জব্দ হবে—জব্দ হবে মুঘলরা। তারা বুঝছে না খাল কেটে কুমীরকে একদিন বঙ্গদেশে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই কুমীর এই পঞ্চাশ বছরে হিন্দুস্থানের অনেক রাজ্যের রণশক্তিকে গ্রাস করেছে। বাকিটুকু গ্রাস করতে পারলে ভালভাবে কায়েমী হয়ে বসতে পারবে তামাম হিন্দুস্থানে। জব্দ সবাই হবে।

মারাঠীদের আহ্বান ব্যর্থ হয়েছে। আমীর-উল-উমরা দৌলতরাও সেকথাই বলেছিল কিছুদিন পূর্বে তার পিতাকে। একটা অসহায়তা ফুটে উঠেছিল তার মুখে। এই অসহায়তা শুধু মারাঠীদের মধ্যে নয়। সারা হিন্দুস্থানে প্রকট হয়ে

উঠেছে। আবার হিন্দুস্থানবাসীদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছে, যারা বিদ্যা আর বুদ্ধির জোরে ফিরিঙ্গিদের কৃপাভাজন হয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কাজে কোমর বেঁধে লেগেছে। তারা দিন গুনছে কবে দিল্লী ফিরিঙ্গিদের পদানত হবে। সেদিন তাদের ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠবে। হয়তো তাদের আশা অপূর্ণ থাকবে না। কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে অর্থের বিনময়ে কেনা গোলাম করে রেখে গোটা হিন্দুস্থানকে যদি শোষণ করা যায়, মন্দ কি?

কেল্লার কাছে শেষে অশ্বটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। জাফর বলে,—চল্। সারা গায়ে তোর খুন্। আমারও সেই অবস্থা। দাঁড়ালে কেন?

হ্রেষা রব করে ওঠে অশ্ব।

কৌতূহলী জাফর লাগাম ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। প্রাণীটিকে তার খুশিমত চলতে দেয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রাণীটি অদূরে কেল্লার প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

জাফর দেখে একটি ঘোটকী বাঁধা রয়েছে সেখানে। মৃদু হেসে জাফর বলে,—তোর মোতিবাঈ বুঝি? বেশ তো। কিন্তু এখন সময় নষ্ট করলে তো চলবে না। তা' ছাড়া, তোর হারেমেও বেগমের অন্ত নেই।

অশ্ব ছট্‌ফট্ করে।

ইতিমধ্যে অপর জীবটির আড়াল থেকে এক ব্যক্তি বার হয়ে এসে কুর্নিশ করে বলে,—আপনিই আবু জাফর?

—কে তুমি? কি করে চিনলে আমায়?

—খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম আপনি শিকারে গিয়েছেন।

—তুমি আমার কাছে এসেছ?

—আজ্ঞে হঁ্যা। আপনার অনেক নাম শুনেছি।

—কোথায়?

—আমাদের মুলুকে। বাঙলা দেশে।

—অতদূরে আমার নাম?

—হঁ্যা। আপনি যে লেখেন। তা'ছাড়া আপনি সবার সঙ্গে আলাপ করেন। আপনি ফিরিঙ্গিদের খোঁজখবর চান।

জাফর সন্দিগ্ধ হয়। লোকটি কোন অসদুদ্দেশ্যে আসতে পারে। ফিরিঙ্গিদের কোন বিশ্বাস নেই। তা'ছাড়া লোকটি বলছে, সে বাঙলা দেশ থেকে আসছে। বাঙালীরা খুবই ফিরিঙ্গি ভক্ত।

সংযত কণ্ঠে জাফর বলে,—ফিরিঙ্গিদের খোঁজখবর আমি নিতে যাব কেন?

লাভ কি আমার ?

—লাভ ? কিছু না। কিংবা লাভ নেই, একথাও বলতে পারেন না।

—কেন ?

—শাহ্ আলমের পর আপনার পিতাই দিল্লীর মসনদে বসবেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র আপনি। ফিরিঙ্গি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে অন্তত লোকসান নেই কোন।

—আমার পিতা হয়তো শাহ্ হবেন। কিন্তু তাঁর পর আমার শাহ্ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং তুমি যেতে পার।

—মানলাম, আপনি দিল্লীর মসনদ থেকে দূরেই থাকলেন। কিন্তু হিন্দুস্থান থেকে কি দূরে থাকতে পারবেন ? আমরা জানি, আপনি দেশকে ভালবাসেন। আপনার শ্যারের মধ্যে কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো বা প্রকাশ্যভাবে সেই কথাই বলা হয়েছে কতবার।

—কে তুমি ? তোমার নাম ?

—আমি ফিরিঙ্গি সেনাদলে একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। নাম আমার শামসুদ্দিন।

—ফিরিঙ্গিদের তোমরা বাঙালীরা খুবই ভালবাস।

—কথাটা মিথ্যে নয়। কারণ পঞ্চাশ বছর আগে ওরা পলাশীর যুদ্ধে বিজয়-নিশান উড়িয়েছে। তবু আমার মত ছন্নছাড়াও রয়েছে অনেক, যারা চায় হিন্দুস্থান থেকে ওদের উচ্ছেদ করতে। দিল্লীর কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের বাঙলার কৃষকরা পর্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেছে।

—আমায় এখন কেল্লায় ফিরতে হবে।

—জানি। এও জানি কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গিরা দিল্লী দখল করে নেবে। আপনাদের কিংবা মারাঠাদের তেমন শক্তি যদি থাকত, তা'হলে আমার মত আরও অসংখ্য সেনা আপনাদের দামী সংবাদ সরবরাহ করতে পারত। এমন কি দলেও যোগ দিত। কিন্তু আপনাদের তেমন শক্তি নেই। শক্তি সংগ্রহের চেষ্টাও নেই।

তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ ?

সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে সিপাহী শামসুদ্দিন বলে,—এই চেহারা, ওই চোখ, কণ্ঠস্বরের এই আবেগ যাঁর, তাঁকে পরীক্ষা করতে হয় না। আমি চলি বাদশাজাদা—

—বাদশাজাদা ? অনেক পুরোনো ডাক।

—হ্যাঁ, অনেক পুরোনো। সেই ডাকের স্বপ্নও এখন আর দেখেন না আপনারা। কিন্তু তেমন দিন আসতে পারে যখন এ-নামের অস্তিত্ব এ-দেশ থেকে মুছে গেলেও আপনাকে ভুলতে পারবে না দেশের কৃষক আর সাধারণ অধিবাসী।

—তুমিও আমার মত স্বপ্ন দেখো ?

—হ্যাঁ। আরও অনেকে দেখে বাদশাজাদা—দেশের কোটি কোটি চাষি, তাঁতি, জেলে, গয়লা, কুমোর, কামার। তারাও দেখে। এত স্পষ্ট করে হয়তো দেখে না। দেখবার অবসর নেই দিনে-রাতে। তবু দেখে। অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখে। আপনার সময় নষ্ট করব না। আমি চলি। হয়তো নিজে আমি আর আসতে পারব না, তবে লোক পাঠাব। আপনি তো ধর্মকথা শোনান। কত লোক শুনতে আসে। তাদের মধ্যে বাঙলা দেশের মানুষও থাকবে।

—বাঙলা দেশের মানুষ থাকবে ? জাফরের চোখে আলোর ছটা।

—হাঁ বাদশাজাদা। বাঙলা দেশে আমি একা নই।

জাফর নতমস্তকে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার অশ্ব হাবিলদারের জীবটির মাথার সঙ্গে মাথা ঘষতে থাকে। জীবনে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। শামসুদ্দিনও বোধহয় আর আসবে না কখনো।

হাবিলদার বলে,—হরিণটি কি আপনার খুবই প্রয়োজন !

—কেন বলত ?

—আমার সঙ্গে আরও লোক রয়েছে। খরচ বাঁচত।

—এই নাও।

প্রাসাদে প্রবেশ করতেই একজন রক্ষী জানায় পিতা মৈনুদ্দিন তার খোঁজ করছিল। একটু বিস্মিত না হয়ে সে পারে না। অথচ রক্ষীকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। কিছুই বলতে পারবে না সে।

—কোথায় দেখা করতে বলেছেন ?

—একটু পরে শাহ্ যাবেন লালপর্দায়। আপনার পিতাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

—তুমি ঠিক শুনেছ ? এত রাতে লালপর্দায় আসবেন শাহ্ স্বয়ং ?

—হাঁ, জনাব।

জাফর ছুটতে ছুটতে সোজা চলে যায় গোসলখানায়। কোন-রকমে স্নান শেষ করে বার হয়ে আসে। কক্ষে প্রবেশ করার মুখে দেখে পিতা মৈনুদ্দিন দাঁড়িয়ে।

—শিকারে গিয়েছিলে ?

—হাঁ।

—আমি আগে খোঁজ নিয়েছিলাম। তুমি তখনো ফেরো নি।

—কিন্তু আপনি নিজে এলেন বলে খুবই সংকোচ হচ্ছে। কারও মারফৎ হুকুম

করলেই যেতাম।

—গুরুত্বটা বেশি বলে। শাহ্ তোমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন বার বার।

—জাহাঙ্গীরের পৌঁছে গেছে?

—না, ওরা কেউ আসবে না। আসবার জন্যে বলা হয় নি ওদের।

পিতার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির চিহ্ন। জাফর বুঝতে পারে শাহ্ আলম তাদের কথা বলেন নি বলে পিতা অসন্তুষ্ট।

মৈনুদ্দিন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে জাফর পোশাক পাল্‌টে দেওয়ান-ই-খাস বা লালপর্দার দিকে রওনা হয়। শাহ্ নিজে তাকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন এবং তার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে হাজির করবার জন্য। আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তাকে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করেছেন। নইলে ডেকে পাঠাতেন না।

শাহ্ আগেই এসে গিয়েছেন দেওয়ান-ই-খাসে। সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন তার পিতা, আমীর-উল-উমর দৌলতরাও এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেনাপতি এবং ওমরাহ্। থমথমে আবহাওয়া।

জাফরের উপস্থিতি তার পিতাই ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ নিকটবর্তী একটি আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জাফরকে বসতে বললেন। সম্প্রতি তিনি দৃষ্টিহীন হলেও, কোথায় কোন্ আসন রয়েছে তাঁর অজানা নেই।

আলোচনার বিষয়বস্তু আসন্ন ফিরিঙ্গি আক্রমণ। বহুক্ষণ ধরে আলোচনা চলে, কিন্তু সমাধানের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। সবাই এ-বিষয়ে সচেতন যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গের দাক্ষিণ্যে এবং দেশী সৈন্যসামন্ত দ্বারা পুষ্ট, ওরা বেশ শক্তিশালী। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যতখানি শক্তি ও পারদর্শিতার প্রয়োজন তা এদের নেই। হিন্দুস্থানের প্রধান দুই শক্তি মুঘল এবং মারাঠী এখন অবক্ষয়ের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে।

সহসা শাহ্ আলম বলে ওঠেন,—আমি বৃদ্ধ। তবু আমি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না। আমি বৃদ্ধ হলেও লড়ব। ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ব। খুদাতাল্লা আমার দৃষ্টি নিয়েছেন। কিন্তু কামানের পেছনে দাঁড়িয়ে গোলাবর্ষণের ক্ষমতা কেড়ে নেন নি।

জাফর বলে ওঠে, আমি আপনার পাশে থাকব সে সময়।

—না।

—কেন? যোগ্যতা কি নেই আমার বাদশাহ্?

—তুমি তার চেয়েও বেশি। তোমাকে তাই সংরক্ষিত রাখতে চাই ভবিষ্যতের

জন্য। আমার এ যুদ্ধ আত্মহত্যার যুদ্ধ। আমি সেই মুঘল নই, যার অসির ঝলকানি শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাত। মুঘল আমি নই, যে মুঘল দিনের পর দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মত্তহস্তীর মত ছোটাছুটি করে তার সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করত।

শাহ্ আলমের কণ্ঠস্বর ভাবাবেগের আর্দ্রতায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

জাফরের পিতা মৈনুদ্দিন বলে ওঠে,—হীনমন্যতায় না ভুগে আমার মনে হয় একবার চেষ্টা করি সবাই মিলে। গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই কেল্লায় মুঘল-বংশের নির্বাপিত-প্রায় আলোক শিখা টিম্‌টিম করে জলার চেয়ে একবার মুহূর্তের জন্যেও পূর্বের মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে নিভে যাক চিরকালের মত।

জাফরের উষ্ণ রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিতা যেন তার মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে,—ঠিক, শেষ চেষ্টা একবার করা যাক।

দৌলতরাও তার স্বভাব-সুলভ মৃদু কণ্ঠে বলে,—না। বরং ওইটুকু জ্বলতে দিন। একেবারে নিভে যায় যে আগুন তাকে নতুন করে জ্বালানো যায় না। যতক্ষণ আগুনের অস্তিত্ব থাকে—যে অবস্থাতেই হোক না কেন—ততক্ষণই আশা। সেই নির্বাপিতপ্রায় অগ্নির অবশিষ্টাংশ অনুকূল অবস্থাতে দাবানলের সৃষ্টি করে সব কিছুকে গ্রাস সরতে পারে। অনুকূল পরিবেশ এটা নয়। মারাঠী শক্তি ধ্বংস হবে হয়তো। তবু মুঘল বাঁচবে।

শাহ্ আলম বহুক্ষণ নীরব থাকেন। তার ললাটের বলিরেখা আরও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অবশেষে তিনি বলেন,—তোমার এই যুক্তি বিবেচনা-প্রসূত দৌলতরাও। এই যুক্তিকে আমি অস্বীকার করতে পারছি না। আমারও যেন বিশ্বাস হচ্ছে, আবার এই অক্ষমতা ও দুর্বলতা মুঘলরা কাটিয়ে উঠবে। আল্লা আবার আমাদের সুদিন দেবেন। তখন মারাঠা ও মুঘল মিলে বিদেশীদের উচ্ছেদ করতে পারবে।

এরপর আরও বহুক্ষণ দেওয়ান-ই-খাসের বাতিগুলো জলতে থাকে। আলোচনা চলে। বাদানুবাদ হয়। কিন্তু শক্তি যেখানে নেই বললেই হয়, সেখানে আলোচনায় কোন কাযকরী ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই দুরূহ, বিশেষ করে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে দেশমাতৃকার সবকিছুকেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে।

জাফর যখন তার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে তখন রজনীর শেষ প্রহর সমাগত। মনের মধ্যে তার পিতামহের একটি উক্তি বার বার ঝঙ্কৃত হয়,—"আল্লা আবার আমাদের সুদিন দেবেন।"

সারাদিনের এবং রাতের পরিশ্রান্ত দেহখানা নিয়ে সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এগিয়ে গিয়ে দেখে তারই পত্নী খায়ুম একপার্শ্বে ছিন্ন লতিকার মত পড়ে রয়েছে। নিদ্রাচ্ছন্ন সে। এই কক্ষে কখনো আসে না কোন নারী। এটি তার একান্ত নিজস্ব। গভীর রাতে একাকী কিতাব পাঠের জন্যে এই কক্ষ। তবু বিরক্ত হতে পারে না, ভার্যার মুখের দিকে চেয়ে।

সাবধানে শয্যায় উঠে একপাশে শুতেই খায়ুমের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বলে,—

—আমি অন্যায় করেছি।

—ডাকলেই পারতে।

—সাহস হয় নি। কিছু মনে করবেন না। বড় একলা লাগছিল—কেমন যেন অসহায় বোধ করছিলাম। তাই এসেছি।

—বেশ করেছ খায়ুমবাঈ। আসবেই তো। কিন্তু আমি খুবই পরিশ্রান্ত আজ।

—আপনি ঘুমোন। আমি শুধু একপাশে পড়ে থাকব।

জাফর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় সঙ্গে সঙ্গে। খায়ুমবাঈ ধীরে ধীরে তার কাছে সরে এল। তার বুকের কাছে মাথা রাখল। একটি হাত রাখল জাফরের গায়ের ওপর। কিছুই বুঝতে পারল না জাফর। স্বপ্নও দেখল না। যে যুবক রোশন-আরা-বাগে দিওয়ান লিখতে লিখতে স্বপ্ন দেখে, যে অশ্বপৃষ্ঠে বসে স্বপ্ন দেখে, বুলবুলকে খাবার দিতে দিতেও যার স্বপ্ন দেখার বিরাম নেই—রাতের গাঢ় নিদ্রায় তার স্বপ্ন দেখবার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—যদি না সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়।

অকস্মাৎ এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে গেল সমস্ত কিছু। বিরাট মহীরুহের তলদেশ সবার অজ্ঞাতে কীট-দংশিত হয়ে থাকলে একদিনের ঝড়ে তা যেমন সমূলে উৎপাটিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে মারাঠার বিরাট শক্তি তেমনি অভাবিতভাবে চূর্ণ হয়ে গেল ওই বিদেশীদের আক্রমণে। সংখ্যায় তারা সামান্য। কিন্তু সংগঠন-শক্তি তাদের অসাধারণ। ওদের প্রেরণার মূল হল হিন্দুস্থানের অফুরন্ত শস্যভাণ্ডার এবং অগাধ ধনসম্পত্তি। হিন্দুস্থানের তথাকথিত রাজন্যবর্গ এবং শিক্ষিতেরা দেশের মর্যাদার কথা বুঝল না। তাদের এক বিরাট অংশ ধনদৌলত, লোকবল, খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করে মদৎ দিল বিদেশীদের। ফলে তাদেরই দেশের দুই শক্তি ফিরিঙ্গিদের পদানত হল।

শাহ্ আলম শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার তড়িৎ-গতি তাঁকে কামানের পেছনেও দাঁড়াতে সুযোগ দিল না। জাফরের অস্ত্র অব্যবহৃত

রয়ে যায়। ফিরিঙ্গি লেক সাহেব দিল্লী অধিকার করে নেয়।

জাফরের মনে হল এক মুহূর্তে যেন ত্বনিয়ার রূপ-রঙ সব পালটে গেল। দিল্লীর আকাশ থেকে যেন পূর্বের নীলিমা অন্তহিত হয়েছে। দিল্লীর বাতাসে সেই প্রাণ-সঞ্চারিণী মদির সুঘ্রাণ নেই। রোশন-আরা-বাগের ফুলের মেলায় যেন দীনতার ছাপ প্রকট হয়ে ওঠে। কিছু ভাল লাগে না। কেল্লার শিখরে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে সে এক সন্ধ্যায় ওঠে চমকে। চাঁদও কি শেষে বঞ্চিত করল হিন্দুস্থানকে তার কিরণ-সুধা বিতরণ থেকে? এ কী রূপ! তার অঙ্গে তো কখনো দেখা যায় নি আগে এতো কলঙ্কের কালিমা। জাফরের মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে সেই বিশেষ দিনটি, প্রতিপদের বহু-অন্বেষণে খুঁজে পাওয়া সাত-রাজার-এক-মাণিক এক ফালি চাঁদের দৃশ্য। সেই দিন আবার আসছে। শিগ্গিরই আসছে। মাঝে শুধু কয়েকটি কৃষ্ণপক্ষ। তখন? তখন কি হবে? তখন কি দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান এর-ওর কাঁধে হাত রেখে গোধূলির সেই পরম লগনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতে পারবে না? কিছু বলা যায় না। কারণ বিদেশীরা এ-দেশের কোন ধর্মেরই মূল্য দেয় না। তাদের নিজস্ব একটা ধর্ম রয়েছে বটে। কিন্তু সেটা কথার কথা। তারা চায় অর্থ—আরও অর্থ—হিন্দুস্থানের বুক নিংড়ে শেষ রসটুকু বার করে নিতে চায়।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাফর, কেল্লার সুউচ্চ মিনারে দাঁড়িয়ে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে। সোপানের পর সোপান অতিক্রম করে সে একেবারে নীচে নামে। কয়েকটি অঙ্গন পার হয়ে একটি উদ্যানে প্রবেশ করে।

—জাফর!

শাহের কণ্ঠস্বর! একটি কুঞ্জের অন্তরাল থেকে তিনি ডাকছেন। বিস্মিত না হয়ে পারে না সে। বাদশাহ্ দৃষ্টিহীন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি এত তীক্ষ্ণ যে, শুধু মানুষের উপস্থিতি নয়, কোন বিশেষ ব্যক্তির উপস্থিতিও তিনি অনুভব করতে পারেন। একটি ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা, অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে খুবই স্পর্শকাতর করে তোলে হয়তো।

জাফর ধীরে ধীরে শাহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় এবং দেখে শাহের হস্তে লেখনী।

—জাফর, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো। কী দেখছ? লিখছি। কিন্তু তোমার মত শক্তিশালী লেখনী আমার নয়। তোমার রচনায় অদ্ভুত একটা সম্মোহনী শক্তি রয়েছে—কখনো তা গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে আবার কখনো দেয় সীমাহীন উদ্যম। তুমি যথার্থ কবি।

শাহের মুখে প্রশংসা শুনে জাফর সংকুচিত হয়। বলে,—আপনার লেখাও

পড়েছি।

—কোথায়? কী করে পড়লে?

—চুরি করে।

—কোথা থেকে চুরি করলে?

—আপনারই শয়নকক্ষ থেকে।

—সবার অজ্ঞাতে?

—না। একজন অন্তত জানেন।

—বুঝেছি। বেগমসাহেবা।

—হ্যাঁ।

—খুবই দুর্বল রচনা, তাই না?

—না। কিছু কিছু চমৎকার হয়েছে।

—সান্ত্বনা দিচ্ছ?

—আপনাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্ধা আমার নেই। তা'ছাড়া সান্ত্বনা দিতে হলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম।

—তা বটে।

এতক্ষণে জাফর দূর্বাদলের গালিচার ওপর বসে পড়ে।

—আজও লিখছি জাফর।

অনুমানের ওপর ভিত্তি করে, অন্ধ বাদশাহ্ অনেকখানি লিখেছেন একলা নিরালায় বসে।

—দেখতে দেবেন বাদশাহ্?

—হ্যাঁ। পড়ো তো। আমি যে দেখতে পাই না। তুমিই পড়।

জাফর পড়ে,—

আফতাব আজ্ ফালাক ইমরোজ তাবাহি দিদি
বাজ ফারদা দেহাদ ইজাদ্ সাব ও সারদারইয়ে মা॥

শাহ্ আলমের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাফর ভাবে, কতখানি আঘাত পেয়ে শাহের লেখনী থেকে এটি নির্গত হয়েছে। কী মর্মবেদনা। হে আফতাব! আজ তুমি ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছ। কিন্তু আজই তো পৃথিবীর শেষ দিন নয়। আগামীকাল শুরু হবে নতুন সূর্য নিয়ে। তখন আল্লা আবার আমাদের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

কতখানি আশা এবং বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে এই ক্ষুদ্র শ্যারের ভেতরে।

—জাফর।

—বলুন শাহ্।

—চুপ করে রইলে কেন?

—আপনার রচনার ঐশ্বর্য আমায় নির্বাক করেছে।

—কিন্তু তোমার এই প্রশংসা আজ আর আমায় আনন্দিত করতে পারছে না। আজ যদি তুমি শপথ গ্রহণ কর, আমার এই আশা পরিপূর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তা'হলে বরং জীবনের শেষ ক'টি দিন আমার অন্তর্দাহে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ পড়বে।

—আমি শপথ নিচ্ছি, ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করব। হিন্দুস্থানের জন্যে প্রাণ দিতে আমি প্রস্তুত থাকব।

—জানো জাফর, ওদের বড়কর্তা ওয়েলেসলী আমাকে সাড়ে এগারো লাখ টাকা পেশকাশ হিসাবে দিতে চায়।

—পেশকাশ? অর্থাৎ আপনার নিজের শাহ্ হিসাবে স্বাধীন কোন ক্ষমতাই থাকবে না!

—না। তোমাদের কতবার বলেছি, ওরা মারাঠী নয়—বিদেশী। দিল্লীর শাহের সম্মান বজায় রাখবার জন্যে ওরা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তাই সত্য হল।

—আপনি রাজি হয়েছেন?

—এখনো ওয়েলেসলীর পত্রের জবাব দিই নি। তবে রাজি হতে হবে। আমি তোমাদের অক্ষম শাহ্। তবু একটা ব্যাপারে রাজি হই নি। দৌলতরাও-এর ফরাসী সেনাপতি ড্রাজন, আমাদের কোষাধ্যক্ষ শাহ্ নওয়াজ খাঁয়ের কাছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা গচ্ছিত রেখেছিল। ফিরিঙ্গি সেনাপতি লেক্ সেই টাকা দাবি করেছিল। আমি দিই নি। সেই টাকা আমি আমার নামে সিপাহীদের জন্যে বিতরণ করেছি। প্রমাণ করেছি, যতই ফিরিঙ্গিরা দিল্লী অধিকার করুক, আইনের চোখে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ স্বয়ং এই শাহ্ আলম।

—এতবড় ব্যাপার ঘটে গেল শুনি নি তো।

—তুমি তো ছিলে না, খোঁজ করেছিলাম।

—হ্যাঁ, আমি একটু বাইরে ছিলাম দু'দিনের জন্যে।

—কোথায় ছিলে?

—বিখ্যাত স্থানে নয়। এখান থেকে পনেরো ক্রোশ দূরে যমুনারই তীরে রয়েছে পুরোনো এক মসজিদ। কোনো নবাব-বাদশাহের তৈরী এটি নয়। সাধারণ মানুষের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল তিনশো বছর আগে। তাই কারুকার্য নেই, বাহুল্য নেই কোন। আছে শুধু দরদ। সেখানে প্রবেশ করলেই পবিত্র হয়ে ওঠে

সমস্ত অন্তর।

—হঠাৎ সেখানে কেন গেলে?

—একজন ফকির এসেছেন সেই মসজিদে।

—খবর পেলে কি করে?

একটু হাসে জাফর। তারপর বলে,—আমাকে খবর দেওয়ার লোকের অভাব? সবাই আমাকে চেনে। আমি যে সবার সঙ্গে মেলামেশা করি।

—বুঝলাম। তা ফকিরসাহেব বুঝি খুব উঁচুদরের?

—হ্যাঁ।

—অনেকেই যায় বোধহয় রোগ সারিয়ে নিতে। আমার অন্ধত্ব ঘোচে না? শেষ ক'টা দিন পৃথিবীর রূপ দেখে মরতে পারতাম।

—তিনি তো রোগ সারান না। ভেল্‌কীও দেখান না। তবে মনের অস্থিরতা তাঁর কাছে গেলে কেটে যায়।

—তোমার কথা শুনে তার কাছে যেতে সাধ হচ্ছে। কী বলেন তিনি?

—তিনি তো কথা বলেন না।

—সে কি! তবে সবাই সেখানে গিয়ে কি করে?

—সবাই যায় না। খুব কম মানুষই যায়। যারা যায় তাদের কোন অসুবিধা হয় না তাঁর কথা বুঝতে।

—অবাক করলে আমায়। অদ্ভুত জিনিস শোনাচ্ছ। তুমি তার কথা বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কীভাবে বুঝলে?

—এই দু'দিন সারা সময়টা তাঁর পাশে বসে থেকে। একবারও সান্নিধ্য থেকে উঠে বাইরে যাই নি। যাবার কথা মনেও হয় নি। তাই ভাবি, উনি খুদাতাল্লার সেবক মাত্র। আল্লা তবে কি!

—তোমার মনের গতি আমার বুদ্ধির অগম্য জাফর। তুমি দিওয়ান রচনা করছ, তুমি ফকির সাহেবের পাশে বসে দিন-কাল-ক্ষণ বিস্মৃত হচ্ছ। আবার সেই তুমিই আগ্নেয়াস্ত্র বুকে নিয়ে ফিরিঙ্গিদের খতম করবার স্বপ্ন দেখছ। কী করে যে সামঞ্জস্য হবে আমার অবোধ্য।

—আপনি নিশ্চিন্ত হন। একের সঙ্গে অন্যটা যত বিরুদ্ধ বলেই মনে হোক, সামঞ্জস্য রয়েছে।

মায়ের কক্ষ থেকে বার হয়ে আসে জাফর। মা লালবাঈ কিছু দিন হল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আজকাল আর মায়ের কাছে বড় একটা যাওয়া হয় না। এজন্য অবশ্য লালবাঈ-এর এতটুকু অভিমানও নেই। তার মতে এটাই স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

মায়ের কথা শুনে চোখে জল এসেছিল জাফরের। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে নি। মায়ের হয়তো ধারণা হারেমে সে তার বেগমদের নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে। হারেমের বেগম কিংবা বাইরের কোন নারী যে এ পর্যন্ত তার মনে ছাপ ফেলতে পারে নি, সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি মাকে। না বলে ভাল করেছে। অনর্থক পুত্রের জন্যে তার অশান্তি ভোগ করতে হবে না।

মায়ের মুখখানা বড়ই পাংশু দেখতে লাগল। তার গালে গাল রেখে সে বলেছিল,—তুমি নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে মা।

—হ্যাঁ রে, নিশ্চয়ই হব। একজন ভাল হাকিম এসে দেখে গিয়েছেন।

—ভাল হাকিম? নতুন?

—হ্যাঁ, তোদেরই বয়সী হবে। কিংবা একটু ছোটও হতে পারে।

—কে এনেছে!

—তোর বাবা। ছেলেটার ওপর খুব বিশ্বাস দেখলাম।

—কী নাম বল তো?

—আসানুল্লা খাঁ।

—দেখি নি তো। দিল্লীতে কতদিন আছে?

—অত খবর তো আমি জানি না।

—কিন্তু তুমি বললে বয়স কম। ভাল হাকিম হবে কি করে? অভিজ্ঞতা নেই।

—কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রতিভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকে পরাজিত করে।

—তুমি বলতে চাও হাকিমটি প্রতিভাবান?

—দৃঢ় বিশ্বাস আমার, হাকিম হিসেবে তার তুলনা নেই।

মায়ের কক্ষ থেকে বার হয়ে আসতেই কে যেন অনতিদূরে একটি ভারি সবুজ পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হয়। জাফর থেমে যায়। এই অসময়ে মায়ের শয়নকক্ষে কারও আসার কথা নয়। যে মায়ের সেবা করে সে রয়েছে বিপরীত দিকে। তা'ছাড়া আর কেউ এদিকে এলেও তাকে দেখে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নেবে না।

হয়তো চোখের ভুল। অন্যমনস্ক ছিল বলে অমন হয়েছে। কিন্তু তা'হলে

পর্দা অমন তুলে উঠবে কেন? এখনো ভালভাবে লক্ষ্য করলে মৃদু কম্পন অনুভব করা যায়। অথচ অন্যান্য সব পর্দাই স্থির। দিল্লীর আকাশে আজ একবিন্দু হাওয়া নেই যে পর্দায় কাঁপন ধরাবে।

ধীরে ধীরে সবুজ পর্দাটির দিকে এগিয়ে যায় জাফর। ওটির পশ্চাতে অন্য কক্ষে প্রবেশের পথ নেই। ওখানে শুধু কয়েকটি মনোহর স্তম্ভ রয়েছে শোভাবর্ধনের জন্য। কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, তবে সে ওগুলোর একটির আড়ালে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে।

হাত দিয়ে ভারি পর্দা তুলে ধরে জাফর এবং স্তম্ভের আড়ালে নয়, সামনেই দাঁড়িয়ে হরিণশিশুর মত কাঁপছে এক বালিকা—অসামান্য যার রূপ। চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত না চেয়ে থেকে উপায় নেই।

—তুমি?

—আ।ম—আ।মি-

—তুমি কে?

—আমি—

—অত কাঁদছ কেন? ভয় নেই—কোন ভয় নেই। বল, কে তুমি। কী নাম তোমার?

—জিন্নৎ।

—জিন্নৎ! সুন্দর নামটি তো তোমার।

কিশোরী এবার যেন সাহস পায় কিছুটা। ভয়ের হাসি হাসে।

—এদিকে এসো।

—আমি যাই।

—কোন দিক দিয়ে যাবে?

—কোন দিক দিয়ে যাব?

জাফর হেসে বলে—কোন ভয় নেই। আমি ব্যবস্থা করে দেব। এদিকে এসো।

—আমি যাই।

—যাবেই তো। চলো তোমাকে এগিয়ে দি।

এবারে বালিকা জাফরের পশ্চাতে চলে। জাফরকে দেখাতে দেখাতে চলে পেছন থেকে। এই দীর্ঘদেহী পুরুষটি দক্ষ শিকারী এবং অশ্বারোহী—আবার ইনিই ধর্মপ্রবণ। সবার ওপর ইনি দিওয়ান লেখেন। এই পুরুষের রচিত শ্যার সে তন্ময় হয়ে শুনেছে। বুঝতে সব না পারলেও আভাসে অনুভব করেছে রচনার অন্তর্নিহিত অর্থ। তাই আজ সুযোগ পেয়ে প্রাসাদে এসেছিল। আগেও প্রাসাদে

প্রবেশ করেছে কয়েকবার পিতার সঙ্গে—শাহ্‌কে দেখতে। আজ এসেছে সে এক আত্মীয়ার সঙ্গে, বেগমমহলে যাঁর যাতায়াত আছে। এসেই খোঁজ নিয়েছে লালবাঈ-এর কক্ষ কোনদিকে। সে দেখতে চেয়েছিল সেই নারীকে যার গর্ভে জন্ম নিয়েছে তার মনের নিকটতম পুরুষটি। পিতা মৈজুদ্দিনকে সে আগেই দেখেছে। পিতা ও মাতা উভয়কে দেখে পুত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে চেয়েছিল সে। তার সমবয়সী এক বান্ধবীকে বলেছিল বালিকা, তার মনের গোপনতম বালিকা-সুলভ এক বাসনার কথা। শুনে বান্ধবীটি হেসে উঠেছিল খিলখিল করে। বলেছিল,—তোর চেয়ে অনেক বড়। শুনে ফুঁসে উঠেছিল বালিকা জিন্নৎ। হোক্ বড। বয়সই কি সব ?

জাফরের মাকে দেখবার জন্যেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন এক পুরুষ। প্রথমে ভেবেছিল সে কোন বাঁদা কিংবা বেগম। কিন্তু সর্বপ্রথম পায়ের পাদুকার দিকে নজর পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠেছিল। লুকিয়েছিল গিয়ে পর্দার আড়ালে। তবু দেরি হয়ে গেল। দেরি হয়েছিল বলেই আজ স্বয়ং জাফরের পেছু পেছু সে যেতে পারছে। হ্যাঁ, জাফর। আগে কখনো না দেখলেও বলে দিতে পারে যে, সে আজ জাফরের সঙ্গিনী। বুকের ভেতরটা গর্বে দুলে ওঠে—সেই সঙ্গে আরও যেন কিছু। তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে বসরার গোলাপের মত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এখনই তাকে চলে যেতে হবে। রাঙা মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

সহসা জাফর ঘুড়ে দাঁড়ায়। বালিকার চোখে চোখ রেখে বলে,—একি ! এখনো ভয় যায় নি ?

বালিকা কথা না বলে চেয়ে থাকে জাফরের চোখের দিকে। সেই চাহনি জীবনে প্রথম জাফরের অন্তরের একটি দুরন্ত ঝর্ণার উৎস-মুখের ওপর থেকে দীর্ঘদিনের ভারি পাথর সরিয়ে দিল।

এ কী চাহনি ! কখনো তো দেখি নি। এমনও হয় ? কিন্তু না—না, এ যে বালিকা। বড়জোর কিশোরী বলা যেতে পারে। না না। যা ভাবছে তা নয়। অসম্ভব।

তবু তার হৃদপিণ্ড নৃত্য করে। শত চেষ্টাতেও প্রশমিত হয় না। একটা সীমাহীন আনন্দলোকের দ্বার যেন তার সম্মুখে সহসা উদ্ঘাটিত হয়।

কিন্তু না—না ! এ যে বালিকা।

চঞ্চল জাফর বলে,—তুমি কী দেখছ অমন করে ?

—কিছু না।

মিথ্যে বলে নি। সে কিছুই দেখছে না। তবু এ কী হল তার? তারুণ্যের প্রথম প্রভাতেও যে এমন হয় নি।

—তোমায় দেখতে খুব সুন্দর।জিন্নৎ। তোমার চাহনিতে জাদু আছে। চল তোমায় পৌঁছে দি।

বালিকা কিসের যেন আভাস পায়। তার চোখের পাতা ভারি হয়। কোনমতে বলে,—আমি যে অন্যের সঙ্গে এসেছি। তিনি হারেমে রয়েছেন।

—ও, তবে চল তোমায় হারেমের পথটা দেখিয়ে দি।

বালিকা দাঁড়িয়ে থাকে।

—যাবে না?

—আমায় এখানে আবার আসতে দেবেন?

—নিশ্চয় দেব। যখন খুশি এসো। কিন্তু কার কাছে আসবে?

—কার কাছে? তা তো জানি না।

—আমার কাছে আসবে?

—হ্যাঁ। উত্তেজনা আর আনন্দে বালিকার চোখে অশ্রু টল্‌টল্‌ করে।

—তুমি কাঁদছ?

—না।

—চোখে জল।

—ও কিছু না।

—আমি মুছিয়ে দেব?

ইচ্ছে হয় জিন্নৎ-এর ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু পারে না। জাফর সযত্নে জিন্নৎ-এর মুখ তুলে ধরে অশ্রু মুছিয়ে দেয়। তারপর সেই চোখের দিকে চায়। আবার সেই দৃষ্টি। না না, এ যে অসহ্য। এ দৃষ্টির অর্থ কি? কেন এমন হল? মোতিবাঈকে দেখেছে, খায়ুমবাঈ-এর চাহনি দেখেছে, দেখেছে সরফৎ-এর বঙ্কিম কটাক্ষ। দৌলত কাদম, আফজলন্নিসার নয়নের লালসাদৃপ্ত দৃষ্টি দেখতেও তার বাকি নেই। এ ছাড়াও দেখেছে অসংখ্য নারীর চটুল এবং স্থূল অর্থবহ ভ্রূভঙ্গি। কিন্তু এমন তো কখনো হয় নি। আজ এই কিশোরীর চোখের দিকে চেয়ে কী হল? কী রয়েছে এতে? কেন এই আকর্ষণ? ওই দৃষ্টি কী যেন বলতে চাইছে, কী যেন দিতে চাইছে—নিতে চাইছে। এক মুহূর্তে এত দিনের জমিয়ে রাখা অন্তরের অভাব-বোধকে ঘুচিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু না। সবই কল্পনা। এ যুবতী নয়। যৌবন সবে এর দেহের সীমারেখায় আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও, এখনো জোয়ার আসে নি। জোয়ার এলে কী যে

হবে ভাবা যায় না।

চিন্তিত জাফর বলে,—তুমি আবার আসবে তো ?

—হ্যাঁ।

—এসো। তুমি না এলে আমার কষ্ট হবে।

—আপনি—সত্যি আপনার কষ্ট হবে ?

—হ্যাঁ জিন্নৎ। সত্যিই খুব কষ্ট হবে।

—আমি আসব।

জাফর চলতে শুরু করে। এবারে কিশোরী পেছনে নয়—পাশাপাশি চলে। মনে তার ভয় নেই—শুধু বিষণ্ণতা। জাফরের দেহের সঙ্গে মাঝে মাঝে তার দেহ স্পর্শ করে। সে শিউরে ওঠে।

আকবর শাহ্

দুই

শাহ্ আলম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। দিল্লী নগরী হল শোকাভিভূত। লালকেল্লার ওপর নেমে এল এক অভূতপূর্ব স্তব্ধতা। শুধু কান পাতলে ফিরিঙ্গিদের আবাসগৃহে বন্ধ দরজা ভেদ করে বাইরে ভেসে আসা বাদ্যযন্ত্র আর নৃত্য-গীতের চাপা আওয়াজ শোনা যায়। শাহের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি তারা। বরং বেশ একটু খুশি খুশি ভাব। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি যতদিন জীবিত ছিল বড় বেশি অস্বস্তি-কর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে তাদের বার বার। নামে মাত্র শাহের তেজ দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই ওরা লক্ষ্য করেছে শাহের জিদ শেষ পযন্ত বজায় রয়েছে। তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও কেন যে শাহ্কে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, বুঝতে পারে না ওরা। ওইসব অজ্ঞ ফৌজরা জানে না যে ওদেরই পূর্বপুরুষ এদেশে সামান্য একটু বাণিজ্যের অধিকার লাভের আশায় এককালে মুঘল বাদশাহের পদলেহী কুকুরের মত পড়ে থাকত। যারা জানে তারাও ভুলে যেতে চায় অথবা ভুলে যাবার ভান করে।

শাহ্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রচণ্ড এক আক্ষেপের মধ্যে। শেষ বার দৃঢ়মুষ্টি দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন—না না, আমি দেবো না। আমি বেঁচে থাকতে ওরা খুশিমত আমার কবর খুঁড়বে, এ আমি হতে দেবো না।

কথাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শাহের হস্তটি শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। তাঁর মস্তক একপাশে হেলে যায়। শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হাকিম আসানুল্লা ঝুঁকে পড়ে শাহের একটি হাত তুলে নেয়। নাড়ি দেখে। বুকে কান পেতে কিছুক্ষণ শোনে। তারপর ছলছল্ চোখে বলে—সব শেষ!

শেষ! এক অতি পুরাতন বটবৃক্ষ যেন ভেঙে পড়ল। আসানুল্লা কান্না চাপতে চাপতে কক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে আরও অনেকে। দাঁড়িয়ে থাকে শুধু জাফর আর দিল্লীর নতুন শাহ্ তারই পিতা মৈনুদ্দিন আকবর। আর শিয়রে বেগমসাহেবা।

জাফর যেমন জানে, তেমনি তার পিতাও জানেন, শাহ্ আলমের শেষ আক্ষেপের উৎস কোথায়। যে কথাগুলো বলে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হল, একবছর

পূর্বে ঠিক এই কথা ক'টিই তিনি বলেছিলেন, যখন শুনলেন ফিরিঙ্গি ওয়েলেসলী তাঁকে কেল্লা পরিত্যাগ করে বিহারের কোথাও গিয়ে বসবাস করতে অনুরোধ করেছে। সেই চরম অপমান এতদিন ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেছে। আজ সর্বশেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সঙ্গে সেই অসহনীয় জ্বালাও তাঁর ভেতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। এখন তিনি শান্ত। ওই তো তিনি নিদ্রিত রয়েছেন পরম শান্তিতে। লুপ্ত গৌরব, হৃত ঐশ্বর্য মুঘল বাদশাহের দগ্ধ অন্তরের ছায়া আর তাঁর মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত নেই।

বৃদ্ধা বেগমসাহেবা স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন শাহের শিয়রে। চোখে নেই এক ফোঁটা জলও। সম্ভবতঃ এ বয়সে চোখে জল আসেনা। কিংবা দীর্ঘদিন একসঙ্গে অতিবাহিত করে এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে শাহ্ সত্যিই চলে গিয়েছেন চিরকালের মত। বিশ্বাস করা সম্ভবও নয়।

অন্যান্য বেগমরা পার্শ্ববর্তী কক্ষে উপস্থিত। তাদের মধ্য থেকে চাপা ক্রন্দন-ধ্বনি উঠেছে।

—নীলি কোথায়? পিতার প্রশ্ন—শাহ্ হিসাবে প্রথম উক্তি।

জাফর বলে—ঠিক বলতে পারছি না। সম্ভবতঃ শিকারে গিয়েছে। আমাকে বলেছিল কাল, আজ ভোর বেলা রওনা হবে।

—জাহাঙ্গীর?

—একটু আগেও ছিল। ও বলছিল, ফিরিঙ্গিদের আবাসগৃহে নৃত্যের আয়োজন হচ্ছে খবর পেয়েছে। ভীষণ রেগেছিল। জানি না সেখানে গিয়েছে কিনা।

—ফিরিঙ্গিদের স্ফূর্তি বন্ধ করবার ব্যবস্থা কর।

বাদশাহ্ হিসাবে পিতার প্রথম আদেশ খুবই আশাপ্রদ এবং সেই আদেশ তাকেই করলেন।

মৃত শাহ্ আলমের মুখের দিকে একবার চেয়েই পিতার হুকুম পালন করতে সে কক্ষ ত্যাগ করে।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় প্রায় প্রতিটি সায়াহ্ন কেটে যায় জাফরের। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে পিতামহের মৃত্যুর পর। তবু কোন পরিবর্তন নেই দেশের। পিতা আকবর শাহের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিরোধ লেগেই রয়েছে একটানা। শাহ্ আলমের একগুঁয়েমী পিতার মধ্যেও পুরোমাত্রায় রয়েছে। কিন্তু কালের প্রভাবে সেই একগুঁয়েমীর মূল্য আর ততটা নেই। ইতিমধ্যে ফিরিঙ্গিরা দিল্লির শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিয়েছে।

শাহ্ আলমকে তারা যতটুকু সমীহ করতে বাধ্য হত এখন তার সিকি ভাগও করে না। ফলে পিতা এক নিদারুণ মর্মপীড়ায় ভুগছেন।

সবাই জানে জাফর—সব কিছুই বুঝতে পারে। কারণ সে শিশু নয়। শিশু হলেও বুঝতে পারত। কারণ সে তৈমুর বংশের সন্তান। এই বয়সে তৈমুর বংশের কিশোরেরা পারস্য আক্রমণের হিম্মৎ রেখেছে। এই বয়সে তারা হিন্দুস্থানের মত এক প্রকাণ্ড দেশের মসনদে বসে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু পরিচালিত করতে পেরেছে। তার পিতা এক আকবর শাহ্। অপর এক আকবর শাহ্ মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে দিল্লীশ্বর হয়ে জগদীশ্বরের সম্মান লাভ করেছিলেন।

কিন্তু জমানা পাল্টে গিয়েছে। যমুনা নদী দিয়ে এই কয়েকশো বছরে প্রবাহিত হয়েছে অফুরন্ত জলপ্রবাহ। তাই প্রথম আকবর শাহ্ এবং দ্বতীয় আকবর শাহে আশমান্ জমিন ফারাক। মৈনুদ্দিন আকবর কখনো স্বপ্নেও জালাল-উদ্দিন আকবরের সম্মান ও শক্তি লাভের দুরাশা করতে পারেন না।

তবু মনঃপীড়া। একটা নিদারুণ ব্যর্থ আক্রোশ। বন্দী বিহঙ্গের ছট্‌ফটানি যেন। ফিরিঙ্গিরা শুধু বাইরে নয়, কেল্লাব মধ্যেও তাদেব প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছে। কেল্লার অনেক কিছুই এখন তাদের নির্দেশে প্রতিপালিত হয়।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরজায় নিস্তব্ধ পরিবেশে জাফর চিন্তামগ্ন হয়। দরগার তত্ত্বাবধায়ক বন্ধুবর গুলাম হাসান শহরে গিয়েছে কয়েকটি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য। একাকী জাফর।

এক সময় সে দেখতে পায় প্রধান ফটকের পাশ দিয়ে অতিবৃদ্ধ এক ব্যক্তি লাঠিতে ভর করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এক হাতে বৃদ্ধ সুবৃহৎ একখানি কিতাব ধরে রেখেছে বুকের কাছে। কিতাবের ভারে হাত তার কম্পমান। দু-চার পা হাঁটতে থামতে হচ্ছে তাকে বারবার—সামলে নিতে হচ্ছে নিজেকে।

কৌতুহলী হয়ে উঠে জাফর। বৃদ্ধের চলন ভঙ্গির সঙ্গে অতি পরিচিত কারও সাদৃশ্য অনুভব করে সে, অথচ ঠাহর করতে পারে না।

এগিয়ে যায় জাফর সাহায্যের জন্য। কারও কোন কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করতে পারে না কোনদিনও—অবহেলা তো দূরের কথা। শান্তি পায় না মনে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে ধরে ফেলে বলে,—আমায় দিন কিতাবটা। আমি সঙ্গে যাই আপনার।

রূঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে বৃদ্ধ,—না না, তোমায় দেব না। তোমায় দেবার জন্যে আমি দরগায় আসিনি।

জাফর বুঝতে পারে বৃদ্ধের দেহের মত তার দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। কণ্ঠস্বর তার অতি দুর্বল।

—তবে আমার কাঁধে ভর দিন। লাঠিটা আমায় দিন।

এবারে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কোমল,—বেশ বেশ। তাই চল। তুমি তো সুন্দর ছেলে।

জাফর মৃদু হেসে বলে,—ছেলে নই। যৌবনও পার হবে কয়েক বছরের মধ্যে।

—আমার কাছে ছেলেই। আচ্ছা একটা খবর বলতে পার?

—বলুন।

—আবু কোথায় বলতে পার? সে আগে নিয়মিত আসত এই দরগায়। এখনো নিশ্চয় আসে।

—আবু? কোন্ আবু—

এবারে বৃদ্ধ গর্বের হাসি হেসে বলে,—ও, আবু বললে চিনবে না বুঝি? তবে শোন, লাল কেল্লার যে জাফর দিওয়ান লেখে তার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

স্তব্ধ হয় জাফর। তার কথা জানতে চাইছে বৃদ্ধ! কিন্তু কে এই বৃদ্ধ? সে তো চিনতে পারছে না। বড় বড় চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকায়।

—কোন্ আবুর কথা বলছি এবারে বুঝলে তো?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাইবার পর জাফর চিনতে পারে আগন্তুককে। তারই শৈশবের শিক্ষাগুরু স্বয়ং হাফিদ মহম্মদ খলিল তার কাঁধে ভর করে কথা বলছেন। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে তাঁর। সেই সুন্দর সুঠাম দেহ ন্যুব্জ। সেই সজীব সতেজ দৃষ্টি আজ ঝাপসা আর ভাবলেশহীন। অমন ভারি মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে।

হাফিদ মহম্মদকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে। চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

—কে? কে তুমি? আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরলে কেন? আমি যে পড়ে যাব।

—আমায় শাস্তি দিন। আপনি দিল্লীতে ছিলেন না জানতাম্। কিন্তু কোথায় ছিলেন একবারও জানতে চেষ্টা করি নি। শুধু জানতাম আপনি জীবিত আছেন। ভাবতাম, চিরকাল আপনি জীবিত থাকবেন—আবার আপনি দিল্লীতে এলে আমি দেখা করব। জরা এসে আপনাকে আক্রমণ করবে, একথা স্বপ্নেও মনে উদয় হয় নি। আপনি এক অপদার্থের জন্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অপব্যয় করেছেন।

প্রথমটা বৃদ্ধ দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর বলে ওঠেন,— আবু! আবু—

—হ্যাঁ, আমি আবু।

—আবু! কত বড় হয়েছো আবু। ভেবেছিলাম কোন আমীর-ওমরাহ্ হবে বুঝবা। আমিও যে ভাবতাম আবু ছোটই রয়েছে।

হাফিজ মহম্মদকে সযত্নে একটি আসনে বসিয়ে দেয় আবু। তাঁর পাশে বসে সে শিশুর মত গুরুর বুকে মাথা রাখে। গুরু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। দু'জনের মুখে কোন কথা নেই, অথচ সময় চলে যায় দ্রুত। এইভাবে বসে বহু বছর আগে সে গুরুর মুখে এক মরুভূমির তাপদগ্ধ দিবসের ভয়াবহ যুদ্ধকাহিনী শুনেছিল। এক ফোঁটা তৃষ্ণার বারি—শুধু এক ফোঁটা—তারই জন্য প্রাণবায়ু নির্গত হল বীরের। হায় হাসান! হায় হুসেন!

শহর থেকে দরগায় ফিরে এসে হাসান জাফরকে এক বৃদ্ধের কোলের কাছে উপবিষ্ট দেখে বিস্মিত হয়। সে লক্ষ্য করে তার আগমন ওরা কেউ দেখতে পেল না। অথচ তাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সে দরগায় প্রবেশ করেছে। ভাবল, কোন উচ্চশ্রেণীর ফকির হবে হয়ত। ফকির পেলে জাফরের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তাই সে তার শহর থেকে আনা দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

—আবু, আমি তোমার কাছে এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। হাফিজ মহম্মদ বহুক্ষণ পরে প্রথম কথা বলেন।

—বলুন।

—এই কোর-আন-শরিফ দেখছ। এটিই আমার জীবনের একমাত্র সম্পদ। আমার পিতামহ এটি পেয়েছিলেন মক্কায় এক অসাধারণ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছ থেকে। এই পবিত্র গ্রন্থ আমার প্রাণ। অথচ দিন ঘনিয়ে এসেছে আমার। প্রাণের সম্পদটি প্রিয়তম ব্যক্তির কাছে না রেখে যেতে পারলে শান্তি পাব না। তোমায় এটি দিয়ে যেতে চাই জাফর। তোমাকে দেব বলেই অনেক ক্লেশ স্বীকার করে দিল্লীতে এসেছি। নইলে যে দিল্লীর পথেঘাটে বিদেশী ফিরিঙ্গির আনাগোনা সেখানে আসবার কোন স্পৃহাই ছিল না আমার।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। জাফর তাই তখনই কোন কথা বলে না। বৃদ্ধের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে সে বলে—আমায় উপযুক্ত ভেবেই কি আপনি এটি দিলেন?

—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কারও কথা মনে এল না।

কম্পিত হস্তে অতি পবিত্র গ্রন্থখানি বৃদ্ধ জাফরের হস্তে সমর্পণ করেন। সেটিকে

দু'হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে গ্রহণ করে জাফর অপার আনন্দ অনুভব করে—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে আনন্দের তুলনা নেই। আজও যদি ময়ুর-সিংহাসন দিল্লীর তখত্'-তাউস থাকত, তার অধিকার পেলেও এধরনের পুলক অনুভব করত না সে। এর মধ্যে ক্লেদ নেই, কুটিলতা নেই, হীনতা নেই—নেই পৃথিবীর ধূলিকণার স্পর্শ। এ এক অপার সীমাহীন বেহেস্তীয় আনন্দের আস্বাদ।

হাফিজ মহম্মদের মনের আরশিতে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের মনটি স্পষ্ট প্রতিফলিত হ'ল। তিনি শীর্ণ হাতখানি জাফরের পৃষ্ঠদেশে রেখে বলেন,—না, না, জাফর! দেশকে ভুলে যাবার প্রবণতাকে তোমার মধ্যে বাসা বাধতে দিও না। দেশকে সব সময় মনের মধ্যে রাখবে। বড় দুঃসময়ে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। যদি বয়স আমার তোমাদের মত হত, তা'হলে হয়তো ফিরিঙ্গিদের বিতাড়িত হবার ঘটনা দেখে যেতে পারতাম। কিংবা কী জানি, হয়তো খুদাতাল্লার ইচ্ছা তা নয়। ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত রয়েছে তিনি ছাড়া আর কে সেকথা জানে?

সেদিন জাফর হাফিজ মহম্মদকে দিল্লীতে তার সাময়িক আবাসস্থলে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। প্রাসাদে কয়েকদিন অবস্থানের জন্য তার শত অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে। বলেছিলেন, স্বপ্নের লালকেল্লার ভিন্নরূপ দেখে জীবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি আর নতুন করে আঘাত পেতে চান না। স্বপ্নই তার সত্য হয়ে বিরাজ করুক শেষের দিনগুলিতে।

এর কয়েক দিন পর সবার অলক্ষ্যে তিনি চলে গিয়েছিলেন তার অজ্ঞাতবাসে। জাফরের বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল সহসা। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেরিয়েছিল কয়েকটা দিন। লেখনী তার স্তব্ধ হয়েছিল। দু'দণ্ড দরগায় নিশ্চিন্তে বসে থাকবার মত মনের অবস্থাও ছিল না। ভেবেছিল হারেমে গেলে দশজন বেগমের অন্ততঃ একজনের অন্তরের মধ্যে তার অন্তরের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। পায় নি, মিথ্যে আশা। বেগমরা কাঁদতে জানে না। গভীর ক্রন্দন কাকে বলে সেই বোধই তাদের নেই।

এই অসহ্য দিনগুলিতে একটি মুখ স্বপ্নে ও জাগরণে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বার বার। এই মুখের স্বপ্ন সে আগেও দেখেছে। অথচ এমন আকুল ভাবে নিজে থেকে দেখতে চায় নি। এখনো একেবারে অসংকোচে যে দেখতে চাইতে পারছে, তা নয়। কারণ এ মুখ এক বালিকার, সেই কবে শয্যা-শায়ী মায়ের কক্ষ থেকে বার হয়ে দোলায়মান পর্দার আড়ালে লাজ-রাঙা ভীতি-

বঙ্গল মুখখানা জীবনে সর্বপ্রথম দেখেই তার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখা টেনে দিয়েছিল, এতদিনের এত ঘটনার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও সেই রেখা এতটুকু অগভীর বা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। ওই মুখের চাহনিতে সে দেখেছিল, এক অদৃষ্টপূর্ব কিছু, যা তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সে দেখেছিল এক অকৃত্রিম সহানুভূতি। নয়ন দু'টি বালিকার না হয়ে কোন তরুণীর হলে, সে বলতে পারত ওই চোখ দু'টিতে সে দিন দেখেছিল এক স্বর্গীয় প্রেমের প্রকাশ, যা পুরুষকে সান্ত্বনার বারিধারায় স্নান করিয়ে দেয়, যা প্রেরণার শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে।

সেদিন বালিকা আবার আসবে বলে কথা দিয়েও আর আসে নি। হয়তো চেষ্টা করেছিল, আসতে পারে নি। কারণ কেল্লার হারেমে আসা এখনো সবার পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

সেদিন জাফরের একবারও মনে হয়নি বালিকার পরিচয় জেনে নিতে। জানতে পেলে নিজে গিয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারত। অন্ততঃ তাকে দেখেও সুখ। এতদিনে সে কি আর কিশোরী রয়েছে? মেয়েদের কৈশোর এখনো তিনবছর স্থায়ী হয় না। এতদিনে তার দেহের কানায় কানায় যৌবন উপচে পড়ছে। সে যে অবিবাহিতা নয় এখনে একথাও জোর করে বলা যেতে পারে। কোন ভাগ্যবান পুরুষের প্রাসাদ আলো করছে। কিংবা এমন পুরুষের কাছে গিয়ে পড়েছে যে তার মর্ম বোঝে নি। কথাটা ভাবতে কষ্ট হয় জাফরের। সে ভাবে, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে কিশোরী এখনও অবিবাহিতাই রয়েছে। কিন্তু তাতেও এসে যায় না। দিল্লীর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও মেয়েটিকে সে দাবী করতে পারে না। কারণ এখনকার দিল্লীর শাহের সুদিন আর নেই। বাদশাহ্-জাদাকে কন্যা সম্প্রদান করে কোন আমীর ওমরাহ নিজেদের আর ততটা ভাগ্যবান বলে ভাবতে পারে না। হিন্দুস্থানের এদিকে ওদিকে অসংখ্য নবাব ছড়িয়ে রয়েছে—আপন আপন রাজ্যে যাদের রয়েছে প্রতিষ্ঠা। তাদের কারও হাতে কন্যা সম্প্রদান করে অনেক বেশি তৃপ্তি পায় পিতারা। তবু হয়তো আশা থাকত, যদি পিতা আকবর শাহের পর মসনদের দাবীদার হিসাবে তাকে এখন থেকেই চিহ্নিত করে রাখা হত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও সে শাহের প্রীতিভাজন নয়। মীর্জা নীলি রয়েছে পিতার হৃদয় জুড়ে। সবাই জানে—দিল্লীর পরবর্তী শাহ্ নীলি।

নিজের চিন্তাধারা কোন্ খাতে বয়ে চলেছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হয় জাফর। একটি সামান্য বালিকা তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কেন? তবে কি জীবনে সে প্রথম ভালবাসল একজন নারীকে? হয়তো তাই। ভাল সে প্রথম দিনেই বেসেছিল। কিন্তু তাতেই বা কী এসে যায়। শুধু সে ভালবাসলেই তো চলবে

না। বালিকার মনটিই আসল। তাকে পেয়েও তো লাভ নেই, কারণ উভয়েব মধ্যে বয়সের বিরাট ব্যবধান। বালিকা তাকে ভালবাসত না কখনই।

সুতরাং এই প্রসঙ্গটি মন থেকে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। দূরে রাখতে হলে কাব্যসমুদ্রে অবগাহন করাই সব চাইতে নিরাপদ।

হুমায়ুনের সমাধি-সৌধের পরিবেশে কি যেন এক রহস্য, রসের যেন জাদু মেশানো রয়েছে। তাই স্থানটি বড বেশি আকর্ষণ করে জাফরকে। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার আকর্ষণ ঠিক এ-ধরণের নয়। এমন কি বাদশাহী উদ্যানগুলোর কোনটির প্রতিই তেমন নিবিড আত্মীয়তা অনুভূত হয় না জাফরের।

হুমায়ুনের সমাধি-সৌধের কোথাও যেন তার কাব্য-মানসী লুকিয়ে রয়েছে। তন্ময় মুহূর্তে মাঝে মাঝে সামনে আসে সে। তার স্পর্শও পাওয়া যায়। অথচ সম্পূর্ণ ধরা দিতে চায় না যেন। তবু ওই মানসীই তার প্রেরণার উৎস, যার ফলে দিওয়ান রচনায় হাত দিতে পেরেছে সে। এখানকার একান্ত নিজনতায় বসে লেখনী ধারণ করলেই এক প্রাণবন্ত আবেগে তার অন্তর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর তার লেখনী চিন্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে। রূপ-রস উজাড় করে দিয়েও সে ক্লান্ত হয় না।

কেন যে এমন হয়, শত বিশ্লেষণেও বুঝে উঠতে পারে না জাফর। প্রাসাদের কক্ষে, উদ্যানে, প্রান্তরে, যমুনার তীরে এবং আরও কত জায়গায় কত সময়ে সে লেখনী নিয়ে বসে ব্যর্থ হয়েছে। অসন্তুষ্টির গোঁ ধরে এইসব স্থানে লেখনী স্তব্ধ হয়ে থেকেছে। কচিৎ কখনো অনুকম্পা বশতঃ মানসী এসে হয়তো দাঁড়িয়েছে। শুধু তখনই সে লিখতে পেরেছে।

তাই বারবার জাফরকে যেতে হয় হুমায়ুনের সমাধি-সৌধে, তার অতি প্রিয় নির্জন কোণটিতে। এখানে কালেভদ্রে কোন বহিরাগত আসে কি না আসে। এলেও সকালের দিকে। অপরাহ্নে কিংবা সায়াহ্নে সাধারণতঃ কেউ-ই আসে না। সন্ধ্যার পরে তো নয়ই। এমন কতদিন গিয়েছে, লেখনী বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে রাত হয়েছে। তবু খেয়াল হয় নি। আকাশের দিকে চেয়ে অসংখ্য তারকার সীমাহীন রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে রাত আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। তারপর একসময় খেয়াল হওয়ায় ছুটতে হয়েছে প্রাসাদে। এখানে আসবার সময় সে বেশির ভাগ দিন হেঁটে আসে। শকট অথবা অশ্ব নিয়ে আসে না। এই হাঁটা-পথটুকু আনমনে চলতে চলতে প্রস্তুত করে নেয় সে নিজেকে। সংসারের সতর্কতা, বাস্তবের কল্পনাহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নেয়। ফলে, সমাধি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবার সময় সে অন্য মানুষ। তখন সে আর আকবর শাহ্‌র পুত্র নয়, সে কারও কেউ

নয়। সে শুধু জাফর, যে জাফরকে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা চেনে তার খ্যাতির মাধ্যমে। বড়ই আনন্দ হয়, যখন সে শুনতে পায় তারই রচনার অংশবিশেষ কোন অচেনা ব্যক্তি আবৃত্তি করছে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বৃক্ষছায়ায় বসে। অথবা কোন অরণ্য সংলগ্ন তৃণভূমিতে বসে তারই রচনা সুর করে গাইছে কোন রাখাল বালক। অপরের মুখে শুনে নিজের সৃষ্টির নতুন অর্থ খুঁজে পায় জাফর। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অতৃপ্তি দানা বেঁধে ওঠে। না না, কিছুই হয় নি। আরও সম্পূর্ণতায় আসতে হবে, লিখতে হবে আরও অনেক। মন খারাপ হয়ে যায়। বার বার ছুটে আসে হুমায়ুন সৌধে।

সেদিনও বসেছিল একাকী নির্জনে। লেখনী তার আপন খেয়ালে কাজ করে চলেছিল। মন তার দিল্লীর সীমারেখা ছাড়িয়ে সারা হিন্দুস্থানের ওপর দিয়ে অনেক অনেক উঁচুতে এক অসীমতার মধ্যে অবগাহন করেছিল। অপরাহ্নের মৃদু সমীরণ অনতিদূরের বৃক্ষে সামান্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে একটানা ব্যজন করে চলেছিল তার অবয়বে।

সহসা মৃদু পদশব্দে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়। চেয়ে দেখে বোরখায় আবৃত এক নারীমূর্তি। শান্তি ভঙ্গ হয় জাফরের। মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই অসময়ে সমাধি-মূল দর্শনে বড় একটা কেউ আসে না। এলেও সমাধির একান্তে এই নির্জন স্থানটিতে কেউ পদার্পণ করে না। কারণ এদিকে দর্শনীয় কিছুই নেই।

বিস্মিত জাফর লক্ষ্য করে নারীমূর্তি এগিয়ে আসে তারই দিকে। নারীর সঙ্গে কোন পুরুষ নেই। পরিধেয় বোরখা মহা মূল্যবান। তারই কোন বেগম নয় তো? কিন্তু অত দুঃসাহস হারেমের কোন মহিলার এখনো হয় নি। তা ছাড়া তাদের কোথাও বার হতে হলে সকাল থেকে উদ্যোগ আয়োজন চলে। তেমন কিছু আজ চোখে পড়ে নি জাফরের। এক হতে পারে, জরুরী কারণে তারই কোন বেগমকে ছুটে আসতে হয়েছে তারই কাছে। কিন্তু তাদের কারও চলনে এমন ছন্দময় গতি নেই। তাদের কেউ এত ক্ষীণাঙ্গীও নয়। বোরখা এই নারীদেহের গঠনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে নি।

নারীমূর্তি একেবারে নিকটে এসে দাঁড়ায়। জাফর তার কিতাব একপাশে সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসে।

—আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম।

অপরিচিত মহিলা এভাবে এসে অযাচিতভাবে কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে ধারণা ছিল না জাফরের। ধারণা ছিল না বললে ভুল বলা হবে। কারণ ধর্মহীন ফিরিঙ্গি নারীদের দেখেছে যেচে সবার সঙ্গে কথা বলতে। তাদের

বোরখার বালাই নেই। কিন্তু ফিরিঙ্গি আর মুসলমান এক নয়।

বিরক্ত হতে চেষ্টা করে জাফর। কারণ রমণীর হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় কোন বিপদে পড়ে সে আসে নি। এসেছে হয়তো কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে। নিশ্চয়ই তার পরিচয় জানে না। জানলে, তাকে দেখেও এভাবে এগিয়ে আসবার সাহস হত না! তবু নারীর কণ্ঠস্বরে এমন এক বর্ণনাতীত মিষ্টত্ব ও ঝংকার রয়েছে যা জাফরের অন্তরে ঢেউ তোলে। এই সুললিত কণ্ঠস্বর সে আগে কখনো শোনে নি।

জাফর নীরব থাকায় রমণী সঙ্কোচে লজ্জায় ভেঙে পড়তে চায়। তার সম্মান রক্ষার্থেই শুধু জাফর মৃদুস্বরে বলে,—সম্ভবতঃ, আমি আপনার পরিচিত নই।

—না—হ্যাঁ—

—পরিচিত?

—আপনি শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

—আপনি আমাকে চেনেন দেখছি। অসম্ভব নয়। আপনার সঙ্গী কাউকে দেখছি না তো?

—একা এসেছি।

—এই নির্জন স্থানে?

একটা হালকা মিষ্টি হাসি শোনা যায় বোরখার আড়ালে। রমণী বলে,—বাইরে শকট রয়েছে।

—তবু।

—ভয় পাই নি। জানতাম আপনি রয়েছেন।

—জানতাম? আপনি জানেন আমি নিয়মিত এখানে আসি?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে আমি চিনি?

—আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

—চিনি না। এ কণ্ঠস্বর কখনো শুনি নি। শুনলে ভুলতাম না।

—হয়তো শোনেন নি। কিংবা হয়তো শুনেছেন, যখন কণ্ঠস্বর ঠিক এরকম ছিল না।

—আপনাকে আমি দেখেছি?

—হ্যাঁ।

—হয়তো দেখেছি। বোরখার অন্তরালে সব নারীই সমান।

—বোরখা ছাড়াই—

—আমি দেখেছি?

—হাঁ।

জাফর একটু নীরব থেকে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,—অসম্ভব।

—না।

—কোথায় দেখেছি?

—আপনার মায়ের কক্ষের বাইরে।

—আমার মায়ের কক্ষের বাইরে? না তো? কবে?

—বলুন তো কবে?

—মনে নেই মায়ের কক্ষের বাইরে একজনকেই দেখেছিলাম একবার, কিন্তু সে অনেকদিন হয়ে গেল

—তার কথা মনে আছে?

—হাঁ। এক কিশোরী।

—ও, আমি ভেবেছিলাম বুঝি—

—কী?

—এক যুবতী

—না

—তবু তাকে মনে আছে?

—হাঁ। কিন্তু কে আপনি? হারেমের কেউ? আমার ভাইদের কোন বেগম?

—না।

—আশ্চর্য।

—কেন, আশ্চর্য কেন?

—এভাবে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কোন মহিলা কথা বলতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

—বাদশাজাদার ধারণা ভ্রান্ত নয়।

—তার অর্থ?

—আমি অপরিচিতা নই।

—কে তুমি?

—আমি জিন্নৎ।

—জিন্নৎ? তুমি জিন্নৎ?

—আমার নাম আপনার স্মরণে রয়েছে দেখছি!

যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট শরীর নিয়ে জাফর কোনমতে বলে,—ভুলতে পারি নি।

—চেষ্টা করেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ভোলেন নি বাদশাজাদা ?

—আজ সে কথা তোমায় বলে লাভ নেই জিন্নৎ। তুমি এখন আর কিশোরী নও। আমারও বয়স কম হল না।

—তবু শুনি।

—কী লাভ ?

—জানি না। সেদিন হারেমের ওই অপরিচিত পরিবেশে আমি ভীতা হয়ে পড়লে আপনি আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কিশোরীকে ভুলতে পারেন নি কেন বলবেন কি ?

—তোমায় বলা উচিত হবে কিনা জানি না। তবু জানতে চাইছ যখন, বলছি। তোমাকে কিংবা তোমার স্বামীকে এতটুকু অপমান আমি করতে চাই না।

—বলুন। জিন্নৎ-এর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে।

—তোমার চোখে সেদিন যে-দৃষ্টি দেখেছিলাম, সেই দৃষ্টি আর কখনো দেখি নি।

—কী সেই দৃষ্টি ?

—আজ হয়তো বললে তুমি বুঝবে। কিন্তু তখন বুঝতে না। আমি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম এক প্রগাঢ় প্রেম—সেই প্রেম আমায় সান্ত্বনা দিতে চাইছে। আমাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইছে। তুমি সেদিন কিশোরী না হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আমি তো জানি সেটি ছিল তোমার কৃতজ্ঞতার চাহনি।

—আর আজ ? একটা বিষাদের রেশ জিন্নৎ-এর স্বরে।

—আজ ? কি বললে ?

—আজ যদি দেখতেন সেই একই দৃষ্টি আমার চোখে। কান্নার মত শোনায় জিন্নৎ-এর কণ্ঠস্বর।

জাফর সংকুচিত হয়ে ওঠে। বিব্রত বোধ করে বলে,—তা কি করে হয় জিন্নৎ। বয়সে আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। তা'ছাড়া তুমি আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

হাওয়ার বেগ কখন যেন প্রবল হয়ে উঠেছিল। সম্মুখের বৃক্ষটির দোলায়মান অবস্থা। তৃণাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের অপরদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

দূরে পথের গেরুয়া মাটি আকাশের দিকে উঠতে থাকে।

হুমায়ুনের সৌধের প্রান্তে তাঁরই এক বংশধরের এবং এক তরুণীর প্রকৃতির এই খেয়ালটুকু দেখবার মত অবস্থা নেই।

—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যে থাকে তাকে কি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায় না?

—এ তুমি কী বলছ জিন্নৎ?

—কিছু না। যদি বলি, সেদিনের কিশোরীর চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলেন তার এতটুকুও মিথ্যে নয়?

—জিন্নৎ, তুমি আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বল?

বোরখা-ঢাকা রমণী চঞ্চল হয়ে ওঠে,—কিশোরী কি ভালবাসতে জানে না? সে কি কারও রচিত দিওয়ান শুনে কিংবা তার সুখ্যাতি শুনে তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারে না? কিশোরী সম্বন্ধে আপনার মতো কবির এত কম অভিজ্ঞতা কেন বাদশাজাদা?

জাফরের মনে কাল-বৈশাখীর ঝড়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,—না না, তা কি করে সম্ভব? তুমি এভাবে কথা বলো না জিন্নৎ। তুমি অনেক কিছু জান না। জানলে এভাবে বলতে না।

—আমি বলব। আমি বার বার বলব। কিশোরী হয়েও দুঃসাহসে ভর করে ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। তুমি আমায় তবু গ্রহণ কর নি। ফিরিয়ে দিয়েছ।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জাফর তরুণীকে। তার বোরখা সরিয়ে দেয়। অপরূপা এক যুবতী। চোখে তার সেই একই দৃষ্টি, অদূর অতীতে অচেনা কিশোরীর নয়নে যা দেখে বিহ্বল হয়েছিল, দ্বিতীয় আকবর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

—জিন্নৎ!

নয়ন নিমীলিত জিন্নৎ-এর—অশ্রুপ্লাবিত। জীবনে এই প্রথম দয়িতের বাহু-পাশে আবদ্ধ হয়ে সে জ্ঞান হারায়।

বায়ুর বেগ কমে আসে ধীরে ধীরে। প্রকৃতি আবার শান্ত হয়। বাইরে অপেক্ষমান শকটের অশ্ব ডেকে ওঠে। জিন্নৎ-এর খেয়াল হয়।

—আমি যাই।

—আবার আসবে। জাফরের হতাশ চোখে আশার আলো।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তোমার স্বামী—

মৃদু হেসে জিন্নৎ বলে—এই যে সামনে। এতদিন আমি অপেক্ষা করছিলাম।

এবার সময় হয়েছে কি ? তুমিই ভাল জান।

—জিন্নৎ। চিৎকার করে ওঠে স্বভাব-সৌম্য জাফর।

শকটের অশ্বের হ্রেষারব শোনবাব মত অবস্থা আরও বহুক্ষণ তাদের থাকে না এরপর।

এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল মীর্জা জাহাঙ্গীর। আকবর শাহের এই পুত্রের ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ এবং উত্তপ্ত-মস্তিষ্কের খ্যাতি থাকলেও কোনদিন যে উন্মত্তের মত ব্যবহার করবে, এ ধারণা স্বয়ং শাহেরও ছিল না।

কেল্লার ভেতবে সেটন্ নামে এক ফিবিঙ্গি বাস করে। কেল্লাব ঘটনাবলী এবং কাজকর্মের প্রতি নজব রাখতেই সে নিযুক্ত। স্বভাবতই প্রতিটি মুঘলের নিকট এটি অত্যন্ত আপত্তিকব। ফলে সেটন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি। তবু সইতে হয় সবাইকে, যেমন সহ্য কবেন শাহ্। সুদীর্ঘদিনেব একটানা দুঃসময় মুঘল বাদশাহ্দেব এমন অনেক কিছুই সহ্য করতে শিক্ষা দিয়েছে, যা তাঁদের পূর্বপুরুষদের দুঃস্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

মীর্জা জাহাঙ্গীরের এই সহনশীলতা কোনদিনই নেই। সে যেন আর এক আকবর শাহেব পুত্র জাহাঙ্গীব, যিনি ছিলেন হুমায়ুনেব পৌত্র। কিংবা সেই সুদিনের অপর কোন বাদশাজাদা যেন তৎকালীন মানসিক গঠন নিয়ে সহসা জন্মগ্রহণ করেছে এ-যুগে, মুঘল-সূর্য যখন অস্তাচলের শেষ সীমা অতিক্রম কবতে চলেছে।

ফিরিঙ্গি সেটন্‌কে জাহাঙ্গীর প্রায়ই বিদ্রূপ কবে ডাকে 'লুলু' বলে। সেটন্ হয়তো চলেছে কোন কাজে। পেছনে ছোট্ট ডাক শুনল 'লুলু'। ফিবে দেখে জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে। ক্ষেপে যায় সে। মুখ তার রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ বন্দুক উঁচিয়ে খতম্ করে দিতে পারে নি মীর্জা জাহাঙ্গীরকে। শত হলেও শাহের পুত্র। তেমন কোন অঘটন ঘটলে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী এই দেশে উঠতে পারে প্রবল আলোড়ন। সেই আলোড়নের স্রোতে শুধু সে কেন, শেষ ফিরিঙ্গিটি পর্যন্ত ভেসে চলে যেতে পারে এ-দেশ থেকে। তাই ক্রোধে গুমরে মরলেও, মুখ খুলতে পারে না। অথচ কতসময় কত অদৃশ্য স্থান থেকে নানান কণ্ঠস্বরে বিশ্রীভাবে ডাকা হয় তাকে 'লুলু' বলে। একা কথনই ডাকে না জাহাঙ্গীর। সব সময় তাকে অতিষ্ঠ করে তোলবার জন্যে লোক লাগিয়েছে।

তবু সাধ মিটল না জাহাঙ্গীরের। 'লুলু' নাম ধাতস্থ হয়ে গেল সেটন্-এর। সে ক্রোধের পরিবর্তে মৃদু হাসতে শুরু করল। শাহাজাদাকে জব্দ করার নতুন

অস্ত্র। শেষে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লুলু তাকে জবাব দিতে শুরু করল।

অসহ্য! অসহ্য!

ফিরিঙ্গি বাচ্চার হাসি আর কথা যেন কশাঘাত করতে থাকে জাহাঙ্গীরকে। একদিন তাই সবার অলক্ষ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে বসে নকরখানার ওপরে সেটন-এর অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর টুপি পরিহিত সেটনকে দেখতে পায় বহুদূরে। জাহাঙ্গীরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, যত দূরেই থাকুক শয়তানটা, নকরখানার কাছ দিয়ে যেতেই হবে তাকে, আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে বসে জাহাঙ্গীর। আসছে শয়তান—মৃত্যুর ফাঁদের দিকে নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে।

বন্দুকের আওতার ভেতরে আসতেই আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠে। আশেপাশে যারা ছিল সবাই সচকিত হয়ে দেখে। তারা দেখতে পায় সেটন-এর টুপিটি তার মস্তক থেকে ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়েছে আর সে প্রাণভয়ে ছুটছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে সে। শমন যেন তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

হাত কামড়ায় মীর্জা জাহাঙ্গীর নকরখানার ওপরে বসে। ব্যর্থ হয়েছে তার লক্ষ্য। গুলি গিয়ে আঘাত করেছে সেটন-এর টুপিকে। সে যদি শির লক্ষ্য না করে দেহ লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করত তা'হলে বাঁচত না কুত্তাটা।

তলব আসে স্বয়ং শাহের নিকট থেকে। উদ্ধত মীর্জা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হয় পিতার সম্মুখে।

—যা শুনলাম, সত্যি? শাহের প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

—সম্ভবতঃ তুমি নিজের সঙ্গে সমস্ত মুঘলের সর্বনাশ ডেকে আনলে।

—সর্বনাশের এখনো বাকী আছে নাকি? যেটুকু সূর্য উঁকি দিচ্ছে এখনো, সেটুকু ডুবে যাক। যাওয়াই বরং মঙ্গল। কারণ তা'হলে রাত্রি আসবে। আর রাত এলে আবার প্রভাত হবে— নতুন সূর্য উঠবে।

জাফর ও মীর্জা নীলিও দণ্ডায়মান ছিল। নীলি ফুঁসে ওঠে জাহাঙ্গীরের কথায়। কিন্তু জাফর তার উদ্ধত ভ্রাতার উক্তিতে অভ্রান্ত সত্যের ইঙ্গিত পেয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যাকে সে এতদিন লঘু-চিত্ত যুবক বলে ভেবে এসেছে সে এত গভীর চিন্তা করে দেখে ভ্রাতার প্রতি মন তার শ্রদ্ধাবনত হয়। অতি নিকটজন, নিত্য যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে, প্রত্যক্ষ রক্তের সম্বন্ধ যার সঙ্গে, তাকেও চিনতে ভুল হয়। জ্ঞানী-গুণীরা বলে থাকেন, মানুষ নিজেকেও চিনতে পারে না। কথাটির মূল্য অসীম।

পুত্রের কথায় মসনদের দাবিদার মীর্জা নীলি ক্রোধোন্মত্ত হলেও স্বয়ং বাদশাহ্

নীরব থাকেন কিছুক্ষণ। জাহাঙ্গীরের কথা তাঁর মনেও যেন নাড়া দিয়েছে।

—তোমার মনোভাবের জন্য তোমায় তিরস্কার করতে পারি না জাহাঙ্গীর। তবে প্রস্তুত হও। হয়তো লালকেল্লা পরিত্যাগ করবার সময় আসছে।

—সবার ?

—হাঁ।

—লড়বেন না ?

—জানি না।

—ওদের বিরুদ্ধে লড়তে দ্বিধা কেন পিতা ? আমি যুদ্ধ করব।

—আর যদি তোমায় একা নির্বাসনে পাঠানো হয় ?

—আপনি যদি আদেশ করেন আমি মাথা পেতে নেব।

—আমার আদেশের অপেক্ষায় ওরা বসে থাকবে না।

শাহের বাক্য সমাপ্ত হবার পূর্বেই কামানের গর্জন ভেসে আসে বাইরে থেকে। সবাই ছুটে ঝরোখার নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে একদল ফিরিঙ্গি-সৈন্য কেল্লার প্রধান ফটকের নিচ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তারা।

—জাহাঙ্গীর! শাহের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

—আদেশ করুন শাহ্।

—আত্মগোপনের স্থানের অভাব নেই। পালিয়ে যাবারও রাস্তা রয়েছে।

—এ কথা আমায় বলেছেন ?

—হাঁ।

—আমি পালাব না। ওদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবার কথা চিন্তা করতে পারি না।

—ওদের আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে অন্ততঃ তোমায় বধ করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ভুলে যেও না, কেল্লা লক্ষ্য করে একটি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জানি না সে গোলা কোথায় আঘাত করেছে।

—আমায় তবে মরতে দিন।

—বেশ।

ফিরিঙ্গিরা আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তারা আরও নিকটে এগিয়ে আসে। চিৎকার শোনা যায় তাদের স্পষ্ট।

বলছে ওরা—লালপর্দা তোড় দেও—লালপর্দা তোড় দেও।

লালপর্দা অর্থাৎ দেওয়ান-ই-খাস ধ্বংস করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু দু'বার আওয়াজ হবার পরই সেনাপতির ইঙ্গিতে শান্ত হয় সৈন্যদল।

সেনাপতির সঙ্গে সেটন্ এগিয়ে এসে রক্ষীকে বলে,—শাহ্কে ডেকে দাও।

রক্ষী অতি পুরাতন এবং বিশ্বস্ত। মুঘলদের ঐতিহ্য তার ভালভাবে জানা আছে। ভেতরে ভেতরে তেতে উঠলেও মুখে সে কিছু বলতে পারে না। কারণ স্বচক্ষে দেখল লালপর্দার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শাহ্ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। সে বুঝল, আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যেই আত্মসম্মানের বেশ কিছুটা অংশ ধুলায় লুটিয়ে দিলেন শাহ্।

বেশ গম্ভীর কণ্ঠে অথচ বিনীতভাবে রক্ষী সেটন্কে বলে,—এখন শাহের বিশ্রামের সময়। পরে দেখা করতে পারেন।

চেঁচিয়ে ওঠে সেটন্। সেনাপতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে,—গুলির আওয়াজেও কি শাহের বিশ্রাম-সুখ ব্যাহত হয় নি?

—এমন গুলির আওয়াজ জীবনে তিনি বহু শুনেছেন। তিনি জানেন গুলির বিনিময়ে গুলি চালাবার সামর্থ্য আপাততঃ নেই তার। তাই বৃথা উত্তেজিত হতে চান নি।

—অদ্ভুত! সেনাপতির চোখে বিস্ময়।

সত্যিই অদ্ভুদ উক্তি এই রক্ষীর। স্বয়ং শাহ্ দাঁড়িয়ে শুনলেও চিন্তিত না হয়ে পারতেন না।

সেটন্ তার পিস্তল বাগিয়ে ধরে রক্ষীর বক্ষ লক্ষ্য করে। সেনাপতি সেটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে চোখ রাঙায় সেটন্কে।

কামানের মুখ ঘুরে যায় দেওয়ান-ই-খাসের দিকে। দু'বার গোলা বর্ষণ হয়। পাথরের স্তম্ভে প্রচণ্ড আওয়াজ ওঠে বিস্ফোরণের সাথে সাথে। সেটির সমূহ ক্ষতি হয়। শাহানশা শাহ্জাহান এটি নির্মাণের সময় এমন দিনের কথা চিন্তা করেন নি।

রক্ষী বিচলিত হয়। সেনাপতির সামনে গিয়ে বলে,—আপনি গুলিবর্ষণের আদেশ স্থগিত রাখুন।

কুটিল হাসিতে মুখ ভরিয়ে সেনাপতি প্রশ্ন করে,—এবারে শাহ্ সচকিত হতে পারেন বলছ?

—হ্যাঁ। কারণ, একটি পুরাকীর্তি ধ্বংস হতে বসেছে। আপনি অপেক্ষা করুন।

সে রাতে কেল্লার বুকে নেমে এল এক বিষাদাচ্ছন্ন অন্ধকার। ফিরিঙ্গিদের দাবি অনুযায়ী আকবর শাহ্কে আসতে হয়েছিল তাদের সম্মুখে। মীর্জা জাহাঙ্গীরের

মস্তক দাবি করেছিল উদ্ধত বিদেশীরা। শাহ্‌ রাজি হন নি। তাঁর পুত্র যত অন্যায়ই করুক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার ফিরিঙ্গিদের নেই। তা'ছাড়া সে কারও মৃত্যু ঘটায় নি।

শেষ পর্যন্ত মীর্জা জাহাঙ্গীর নির্বাসনে গেল এলাহাবাদে। যাবার সময় জাফরকে একান্তে ডেকে বলে,—নালির ওপর আস্থা রাখি না। তাই তোমায় বলছি, তেমন দিন এলে আমায় সংবাদ দিও, এলাহাবাদ বেশি দূরের পথ নয়।

—খবর তোমাকে তেমন কিছু না ঘটলেও দেব। এমনিতে সম্ভব হলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।

—লুলুর জাত সেটা সহ্য করবে না।

—কে কি সহ্য করল আমি সেদিকে চেয়ে বসে থাক না। প্রাণ যা চায়, করি।

—জানি।

মীর্জা জাহাঙ্গীর এরপর শাহের কাছে এল। শাহ্‌ উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন,—বৃদ্ধ হয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আর সম্ভাবনা রয়েছে কিনা জানি না।

শাহের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

মীর্জা জাহাঙ্গীর হেসে বলে,—চোখের জল বড় বেশী সস্তা হয়ে পড়েছে পিতা।

—না না, এটা অশ্রুজল নয়। অন্য কিছু নিশ্চয়। বৃদ্ধ বয়স তো।

কেল্লায় ঝরোখার অন্তরালে অশ্রুপ্লাবিত নারীরা, বাইরে সারিবদ্ধ পুরুষ। তারই মধ্যে বিদায় নিল মীর্জা জাহাঙ্গীর। হারেমে তার বেগমেরা তৈরী ছিল। স্বামীর পশ্চাতে তাদের শকটও যাত্রা করল। তৈমূরবংশের এক শাহ্‌জাদা পিতার আদেশে নয়, বিদেশীদের আজ্ঞায় নির্বাসনে গেল।

কেল্লার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে তেমন ভাবে কান পাতলে হয়তো প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যেত শাহের স্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বগতোক্তি—হায় হিন্দুস্থান।

শুধু কেল্লাই বা কেন? দীর্ঘশ্বাস সারা দিল্লী নগরীর আকাশে বাতাসে। তাই দু'দিন যেতে না যেতেই নগরবাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল তাদেরই রচিত শ্যার। তাদের বক্তব্য, দেশের অতীত গৌরব যখন অন্তর্হিত তখন অনর্থক সেটন্‌কে খুঁচিয়ে এই দুর্দশা কেন ঘটাতে গেলে মীর্জা?

সেটন্‌ কো লুলু কিঁউ কহা মীর্জা
লাল পর্‌দেসে গোলা বাজ গয়া মীর্জা
রেজমণ্টেভি আয়ে পণ্টনেভি আয়ে

লাল পর্‌দেসে গোলা বাজ গয়া মীর্জা
সেটন্ কো লুলু কিউ কহা মীর্জা ?

জাফর লক্ষ্য করে ওদের রচিত কবিতার মর্মার্থ। ওরা ফুঁসে ওঠে নি, প্রতিবাদ জানায় নি। ওরা ওদের অতিপ্রিয় মীর্জাকে প্রকারান্তরে ভর্ৎসনা করেছে তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। তীব্র ব্যথা পায় জাফর।

কিন্তু ব্যথা অনুভব করলেও সচেষ্ট ভাবে কিছু করবার উপায় নেই। প্রতাপ-হীন হয়েও তৈমুরবংশ যে আজও দেশবাসার হৃদয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাতে ফাটল ধরাবার জন্য বিদেশীদের চেষ্টার অন্ত নেই। তাদের অবিরাম প্রচেষ্টায় কিছুটা যে কাজ হয় নি তা নয়। দেশীয় নৃপতি ও নবাবরা আজ দিল্লার মসনদ থেকে বহুযোজন দূরে সরে গিয়েছে। তাদের অধিকাংশই ফিরিঙ্গির পক্ষছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছে। সাধারণ নাগরিকদের মনেও দোলা দিতে শুরু করেছে সন্দেহের। এই সন্দেহ একদিন না একদিন বিরাট ধসের আকার ধারণ করে সম্মানের সুউচ্চ শিখরটি পাতালে নিক্ষেপ করবে। সেদিনের বোধহয় বেশি দেরি নেই। কারণ আকবর শাহের প্রতিটি অনুরোধ, প্রতিটি দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

আকবর শাহ্ অনুরোধ জানালেন, ওদের হাতে শাসন-ব্যবস্থা ও ক্ষমতা থাকে থাকুক কিন্তু তাঁকেই বাদশাহ্ বলে মানা হোক এবং গভর্ণর জেনারেলের চেয়ে তাঁর পদমর্যাদা বেশী দেওয়া হোক। কিন্তু লর্ড মিণ্টো হেসে বললে, আকবর শাহ্ হচ্ছেন নামকো ওয়াস্তে বাদশাহ্। তাঁর উপাধিটা শুধু তাঁর সম্মানের জন্যেই। এতে ধার বা ভার কিছুই নেই।

এরপর এলো লর্ড আমহার্স্ট। সেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল,—আপনাকে তো শাহ্ বলা হয় খাতির করে।

বেণ্টিংক সাহেব এসে মুঘল শির আরও নিচে নামিয়ে দিয়ে আদেশ জারি করল,—শাহ্ নয়, বাদশাহের পদবী হল 'হুকুম কম্পানী বাহাদুর।'

সব কিছু দেখে জাফর ছটফট্ করে। জানে সে, আজ পিতা শাহ্ না হয়ে যদি সে নিজে হত তবু করবার কিছু থাকত না। ওরা যে বলেছে, ওরা খাতির করে পিতাকে শাহ্ বলে, এর চেয়ে সত্যি কথা ওরা আর একটাও বলে নি।

তবু আক্রোশে গুমরে মরে জাফর এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী নীলি কেমন নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করছে। নীলির মনোভাব সে বুঝতে পারে না। যদি সে দেশের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথাই ভাবত

তা'হলে কিছুটা ফিরিঙ্গিদের দিকে ঝুঁকে তাদের তুষ্ট করবার চেষ্টা করত। তাও করে না বরং মাঝে মাঝে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। বিদেশীরা তাই তাকে ভাল চোখে দেখে না। তারা নির্ভর করতে পারে না নালির ওপর। দোষ নেই তাদের। ওর চরিত্র বিশ্লেষণ করা বা অনুধাবন করা প্রকৃতই দুরূহ।

মন তোলপাড়। দ্রুত পতনশীল কোন অতিখ্যাত বংশের বংশধর হবার মত অভিশাপ বোধহয় দ্বিতীয় আর নেই। এ যেন তুষারাবৃত কোন গিরিশৃঙ্গের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও বাচবার তাগিদে এটা-ওটা আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ প্রয়াস। এর চেয়ে যন্ত্রণা আর কিছুতে নেই। এই পতনশীল অবস্থায় গিরিশৃঙ্গের চূড়ায় আবার উঠে দাঁড়াবার স্বপ্ন যারা দেখে তারা সবচেয়ে হতভাগ্য। নালি কত সুখী। গড়িয়ে পড়লেও সে জানে না তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে—একসময় তার দেহ প্রচণ্ড শব্দ তুলে কোন বস্তুতে গিয়ে আঘাত করবে। সে নিশ্চিন্ত—পতনের সুখটুকু আস্বাদনে ব্যস্ত।

অনেক আগে জাফরের একটি কাকাতুয়া ছিল। এখন সেটি আর বেঁচে নেই। আজ এই চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সে ঠিক আদেশ করত,—শিকারে যা—শিকারে যা। তার মুখের আদেশ পেলে হয়তো যেত জাফর। কিন্তু নিজে থেকে উদ্যম পায় না।

জিন্নৎ এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। জীবনের বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একমাত্র মরুদ্যান—জিন্নৎ!

—কী ভাবছ অত? দিওয়ান রচনার কথা তো নয়!

—না।

—তবে?

—ভাবছি—

মিষ্টি হেসে জিন্নৎ তার চোখ দু'টি জাফরের চোখের ওপর রেখে বলে,—আমি জানি। কিন্তু ভেবে খুব একটা ফল তো হবে না। তার চাইতে একটা কাজ করবে?

—বল, কি কাজ। জাফরের চোখে কৌতূহল।

—এইসব চিন্তা থেকে যাতে নিষ্কৃতি পাও তেমন কিছু?

—কি রকম?

—ধর দু'জনা মিলে একটা পথ খুঁজতে চেষ্টা করি।

জাফর জিন্নৎ-এর চিবুক ধরে তুলে হেসে বলে,—পথ যে নেই বেগম।

তার গ্রীবাদেশ বাহুলতার দ্বারা আবদ্ধ করে জিন্নৎ উত্তর দেয়,—সব কিছুরই

একটা না একটা পথ খোলা রাখেন খুদাতাল্লা। তোমারই রচনায় পড়েছি।

—তা ঠিক।

তুমি যে স্বপ্ন দেখ, আমিও সেই স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। তাই আমার মনে হয় বিদেশীদের কীভাবে সম্পূর্ণ পরাজিত করা যায়, এখন থেকেই সেই চিন্তা শুরু করা উচিত।

—শুরু আমি অনেক আগেই করেছি জিন্নৎ। তবে কিনারা কিছু পাই নি। তবে তুমি যখন নিজে থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ তখন আবার সঙ্কল্প নিলাম।

—আমায় তুমি অত উঁচুদরের ভেবো না। আমি শুধু তোমার দিকেই চেয়ে রইব। তুমি যখন পরিশ্রান্ত হয়ে উঠবে, আমি তোমার শ্রান্তি দূর করব। তুমি যখন অবসাদ অনুভব করবে, আমি চেষ্টা করব সেই অবসাদ থেকে তোমায় মুক্তি দিতে। আমি তোমার সাহায্যকারিণী—এর বেশী হবার ক্ষমতা যে আমার নেই।

—একি কম হল জিন্নৎ ? আমি জানি, আজ যে বিদেশীদের অজেয় বলে মনে হচ্ছে, আঘাতের পর আঘাত হানতে পারলে একদিন তাদের শক্ত ভিত টলে উঠবে—শেষে ভেঙে পড়বে। সেই সুদিন আমি জীবিত অবস্থায় দেখে না-ও যেতে পারি। তবে আসবে সেদিন সন্দেহ নেই।

—হ্যাঁ, আসবে। আমার মন বলছে আসবে।

দূরে, কেল্লার একেবারে বাইরে দৃষ্টি ফেলে জাফর। সেখানে নগরবাসীর আসা-যাওয়া। শাহানশাহ্ আওরঙজেবের সময়ও এমনি যাতায়াত ছিল পথ-চারীর। কিন্তু সেদিন অশ্বারূঢ় বীরবৃন্দ, হস্তীপৃষ্ঠের আরোহী এবং শকটের আনা-গোনার বিরাম ছিল না। কারণ সারা হিন্দুস্থানের হৃদ্‌পিণ্ড ছিল এই কেল্লা। এখান থেকেই রক্ত সঞ্চালিত হত সারা দেশে। আজ সেদিন আর নেই। লোকসংখ্যা সেদিনের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেল্লার আশেপাশে তাদের ভিড় হ্রাস পেয়েছে। এটি আজ আর হৃদ্‌পিণ্ড নয়। দেশের যেসব অসংখ্য দুর্গ অতীত-গৌরব রোমন্থন করতে করতে এখনো ধুঁকছে এটিও তাদের একটিতে পরিণত হয়েছে।

জিন্নৎ জাফরের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রশ্ন করে,—কি দেখছ ?

—ওই যে পথে যারা যাতায়াত করছে, তারা কি এখনো আমাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে ?

—জানি না। ওদের সঙ্গে মিশতে পারি নি, কখনো কথা বলতে পারি নি। তবে এটুকু জানি, প্রত্যাশা করুক আর না করুক, ওরাই আসল শক্তি। শাহ্ নয়,

ফিরিঙ্গিরাও নয়।

জাফর জিন্নৎকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলে,—তুমি জান ? আশ্চর্য !

—তোমার কাছে এসে অনেক কিছুই জানতে শিখেছি।

—কিন্তু আমি নিজেই জানি না জিন্নৎ, ওরা নির্ভর করুক আর না করুক বিশ্বাস করে কিনা।

—তেমন মুহূর্ত না এলে জানতে পারবে কি ?

—বোধহয় না। তবে আমি ওদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশব। ওদের জানতে চেষ্টা করব।

লালবাঈ একাকী বসেছিলেন তাঁর কক্ষে। একটু আগে জিন্নৎ-মহল এসেছিল তাঁর কাছে। নিয়মিত আসে সে এখানে। কারণ সে জানে জাফর তার মাকে কতখানি ভালবাসে। শয্যাশায়ী না হয়ে পড়লেও বেগম লালবাঈ-এর শেষের দিনটি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

আজ জিন্নৎ কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে লালবাঈ প্রশ্ন করেন,—আবু কি এখন ব্যস্ত আছে জিন্নৎ ?

—না। ওর ব্যস্ততা শুধু মনের ভেতরে।

ম্লান হেসে লালবাঈ বলেন,—চিরকালই তাই। তবু তখন শিকারে যেত, ঘোড়ায় চাপত। এতে সময় কাটত। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সচল ছিল। এখন অতটা নিশ্চয়ই নেই।

—না। বারুদের মত কখনো উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে জ্বলে ওঠে, আবার পরক্ষণেই দপ্ করে নিভে যায়। বুঝতে পারি না কিছু। আমারই দোষ।

লালবাঈ পুত্রের আদরের বেগমকে বুকে চেপে ধরে বলেন,—না। তুমি ওর প্রাণ। তোমার জন্যেই এখনো ও ধীর-স্থির। নইলে কী যে হত। ওকে একটু জোর করে বাইরে পাঠিয়ে দিও।

—চেষ্টা করি। যায় মাঝে মাঝে। তবু বড্ড ভাবে।

—ভাববেই তো। ও যে ভাবুক। তা'ছাড়া ওর মস্ত একটা চিন্তা রয়েছে।

—কী ?

—দেশ। তুমি নিশ্চয়ই জান।

—হ্যাঁ। প্রথম দিনেই জেনেছি।

লালবাঈ-এর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। বলেন,—ও এখন কি করছে জিন্নৎ ?

এতক্ষণে বুঝতে পারে জিন্নৎ লালবাঈ-এর মনের বাসনা, দিন দশেক জাফর মাকে দেখতে আসে নি। উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—আমি এখনই গিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে জাফর এসে প্রবেশ করে। মুখখানা তার বিষণ্ণ। বলে,—তোমার কাছে আমার আসতে সঙ্কোচ বোধ হয় মা। অথচ তুমি আমার গর্ভধারিণী।

—সংকোচ? কি বলছিস্ আবু?

—সত্যিই বলছি মা। বহুদিন আগের কয়েকটি দিনের কথা। তুমি হয়তো ভুলে গিয়েছ। কিন্তু আমি ভুলি নি। শাহ্ আলম আমায় যে আগ্নেয়াস্ত্রটি দিয়েছিলেন সেটি নিয়ে আমি প্রায়ই তোমার কাছে বড়াই করতাম। তোমার চোখের সামনে সে-সব দৃশ্য ভেসে ওঠে কিনা জানি না। নিশ্চয় ওঠে। কারণ তুমি আমার মা। কিশোর বয়সের উচ্ছ্বাস ভেবে তুমি উড়িয়ে দাও হয়তো। কিন্তু আমি পারি না। মাথা আমার সব সময় নিচু হয়ে থাকে।

শয্যা ছেড়ে লালবাঈ নিচে নেমে আসেন। পুত্রের সামনে দাঁড়ান। তারপর দীর্ঘদেহী জাফরের মস্তক নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন,—তুই ভুল বুঝেছিস আমায়। সে-সব ঘটনার একটিও আমি ভুলি নি। আমি আজও বিশ্বাস করি তোর মন এতটুকু বদলায় নি। মনেপ্রাণে আজও তুই সেদিনের স্বপ্ন-দেখা কিশোর। শুধু বুদ্ধি আজ তোর সুপরিণত। তাই বুঝতে পারিস, যে কাজটাকে অতি সাধারণ বলে ভাবতিস সেদিন, সে কাজ কত সুকঠিন।

—হ্যাঁ মা। প্রায় দুঃসাধ্য।

—চেষ্টার ত্রুটি থাকে না যেন তবু।

—না।

আবু লক্ষ্য করে মায়ের দেহ কত বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শরীরে রক্তের স্বল্পতা লক্ষণীয়। হাকিম আসানুল্লা নিয়মিতভাবে দেখছে মাকে। আশা নেই। যে কোন বয়সে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে, এমন একটা সময় আসে যখন দাওয়াই-এ কোন কাজ হয় না। মায়ের সেই সময় উপস্থিত। শয্যা ছেড়ে উঠছেন বটে, তবু হঠাৎ নিভে যাবেন যে কোন মুহূর্তে। অতীতের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মায়ের চেহারা ভাসে চোখের ওপর।

লালবাঈ জাফরের হাত দুটো ধরে বলেন,—তুই আজ আমার মাথার ওপর আরও কতটা উঁচু। অথচ একসময় আমার কোলে শুয়ে থাকতিস। অন্য বেগমদের মত তোকে আমি নাজিরের হাতে ছেড়ে দিই নি। মন চায় নি।

—আমার মায়ের মত মা সবার হয় না।

লালবাঈ হাসেন। বড় ক্লান্ত সেই হাসি। তিনি বলেন—আমার জন্যে দুঃখ করিস না আবু। তোরই একটি শ্যার করে যেন পড়েছিলাম। তাতে বলেছিস্—মৃত্যুকে কেউ জয় করতে পারে না। সুতরাং যা অবধারিত তার জন্যে ভেবে ম্রিয়মাণ হওয়া বিধাতার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ।

—ঠিক মা, ঠিক।

লালবাঈ তাঁর প্রিয় পুত্রের গায়ে হাত বোলাতে থাকেন।

বাইরে ভারি পদশব্দ। একজন এসে খবর দেয়, শাহ্ আসছেন।

জাফর উঠতে চায়। লালবাঈ তার হাত চেপে ধরেন।

—চলে যাস্ নে।

—আমাকে দেখে অসন্তুষ্ট হবেন।

—না।

পর পর কয়েকটি পর্দা তুলে ওঠে। আকবর শাহ্ প্রবেশ করেন। পুত্রের দিকে চেয়ে একটু থেমে বলেন,—ও, তুমি।

লালবাঈ বলেন—আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—ভাল।

জাফর লক্ষ্য করে দেওয়ান-ই-খাসে উপবিষ্ট পিতার চেহারার সঙ্গে, এখনকার চেহারার অনেক পার্থক্য। সেখানে পিতাকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলে মনে হয়। বার্ধক্য সেখানে তাঁকে এতটা বিবর্ণ করে রাখে না। একটা অনুকম্পা জাগে জাফরের মনে। ভাবে, মুঘলদের মানসিক গঠন যদি যুবকোচিত না হত তা'হলে তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন একচ্ছত্র বাদশাহ্ থাকা সম্ভব হতো না। কারণ, হুমায়ুন পুত্র আকবর শাহ্ কিশোর বয়সে মসনদে আরোহণ করে এত বেশিদিন জীবিত ছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে খুব কম ভাগ্যবানই যৌবনের রঙিন প্রভাতে মসনদ লাভের সুযোগ পেয়েছে। তবু তারা প্রতাপ সহকারে বাদশাহী চালিয়েছে। মনে তাদের চির-যৌবন—চির অবদমিত।

জাফর ভাবে পিতাও বাদশাহ্ হলেন কত বিলম্বে, মীর্জা নীলির যৌবন এখন আর ঠিক মধ্যাহ্ন গগনে নেই। কারণ নীলি তার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের ছোট। সেদিন জিন্নৎ তার শ্মশ্রুর কয়েকটি অতি সতর্কভাবে পেছনের দিকে সরিয়ে দিল লক্ষ্য করেছে জাফর। হাসি পেয়েছিল। কয়েক গোছা শ্বেতশ্মশ্রু পেছনে লুকিয়ে রেখে যৌবনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মুখে অবশ্য কিছু বলে নি জাফর।

পিতা বলেন,—তুমি হয়তো জান না, আমি আজ বাঙলা দেশের একজন

পণ্ডিতকে 'রাজা' খেতাব পাঠালাম।

—আপনি! বিস্ময়ে ও আনন্দে জাফর অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে। তাঁর চিন্তাধারার যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই যেন পিতার এই উক্তি।

—হ্যাঁ। কেন, অবাক হলে? সেই অধিকার আমার নেই বলতে চাও?

—একশোবার আছে।

—নালিও সেই কথা বলে। তবে কেল্লায় ফিরিঙ্গি-কর্তা যখন মৃদু আপত্তি তুলেছিল, তখন নীলি একটু বেশি মাত্রায় তাদের গালাগালি দিয়েছে।

—ভুল করেছে নীলি। গালাগালি দিয়ে বা একটা গুলি ছুঁড়ে কিছু হবে না। বরং—

—জানি। বয়স আমার অনেক হল।

পিতার কণ্ঠে বিরক্তির রেশ অনুভূত হওয়ায় জাফর থেমে যায়।

—রামমোহন রায়ের নাম শুনেছ?

—হ্যাঁ। তিনি খুবই সুপরিচিত। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর।

—তাঁকেই পাঠালাম খেতাব।

—তিনি খেতাব গ্রহণ করলে ফিরিঙ্গিদের সাধ্য হবে না প্রতিবাদ করার। কারণ ওদের ওপর রামমোহনের প্রভাব খুব বেশি।

—জানি, তাই তাঁকেই পাঠাচ্ছি ওদের দেশে।

—ওদের দেশে?

—হ্যাঁ। কালাপানির ওপারে বিলাতে। আমার হয়ে লড়বেন উনি।

—যুদ্ধক্ষেত্রে না লড়ে আদালতে?

—হ্যাঁ। কেন?

—লাভ হবে না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। তা'ছাড়া এতে আপনি ওদের আদালতকে স্বীকৃতি দিলেন। বরং রামমোহনকে খেতাব দান করে আপনার অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

—ওদের আদালতকে স্বীকৃতি না দিলেও কি ওরা আমায় সমীহ করত?

জাফর লক্ষ্য করে মাতা লালবাঈ-এর মুখ পিতার সর্বশেষ উক্তিতে বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তিনি কিছু বলতে না পেরে ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়ে বসেন।

—আপনি কি 'পেশকাশ'-এর ব্যাপারে রামমোহনকে প্রেরণ করছেন?

—ঠিক ধরেছ। বছরে আমার চাই ত্রিশ লক্ষ টাকা। সাড়ে এগারো লক্ষে আমার কিছুই হবে না।

লালবাঈ শয্যা থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—মুঘল বাদশাহের পক্ষে ত্রিশ

লক্ষও হাতের ময়লা।

পত্নীর উত্তেজনা শাহ্‌কে ক্ষণেকের জন্য নীরব করে দেয়। তারপর তিনি বলেন,—তুমি ঠিকই বলেছ বেগমসাহেবা। তবে মনে রেখো, আমাকে ভুলেও কেউ 'বাদশাহ্' সম্বোধন করে না, 'শাহ্' বলে খাতিরে

এবারে লালবাঈ-এর নীরব থাকবার পালা। এই স্বামীর মুখেহ ।৩।ন কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষার কথা শুনেছেন। বার্ধক্যের প্রান্তে এসে তিনি ভগ্নমনোরথ। সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। সারা জীবন অন্তরে অন্তরে অনেক যুঝেছেন। এই ত্রিশ লক্ষ টাকার জন্য শাহ্ আলমও তাঁর জীবনের শেষ দিকে অনেক চেষ্টা করেছেন। ফলবতী হয় নি সে-সব প্রচেষ্টা। তাঁর পুত্রও সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। শেষ চেষ্টা, কালাপানির অপর প্রান্তে ওদেশের আসল মানুষগুলোর মন যাচাই করে নেওয়া। ওদের মন গললে অন্ততঃ মীর্জা নীলি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বংশধরেরা কিছুটা সুখে থাকবে।

রামমোহন সাগ্রহে দিল্লীর শাহ্-প্রদত্ত খেতাব গ্রহণ করে সাগর পাডি দিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি প্রাণপণ প্রয়াসেও সফল হতে পারলেন না। দেশের নাম ওদের ইংল্যাণ্ড। এ দেশের অধিবাসীরা তাই ওদের বলে আংরেজ বা ইংরেজ। রামমোহন নতুন দেশের মাটিতে পা দিয়েই বুঝলেন ওই আজব দেশটি সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ হলেও অর্থ জিনিসটাকে ওরা খুব ভালভাবে চেনে। জাত-ব্যবসায়ী ওরা। ব্যবসার জন্যেই দেশের পর দেশ পদানত করে চলেছে। ব্যবসায়ের অজুহাতে মাতৃভূমি ব্যতীত অন্য যে কোন দেশকে শুষে নিতে ওরা পেছপা নয়। সুতরাং বলদর্পহীন দিল্লীর শাহের জন্যে বৎসরে অনর্থক ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে এরা কিছুতেই সম্মত হবে না। আইনের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে কাবু করলেও না।

হলোও তাই। শাহের অর্থে বিদেশে এসেও তাঁর কোন উপকার করতে পারলেন না রাজা। শেষে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এবং ব্যর্থতার কাহিনী একদিন শাহের কর্ণগোচর হল। জাফর লক্ষ্য করলেন দেওয়ান-ই-আমে উপবিষ্ট শাহের মুখ এই সংবাদে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সামলে নিয়ে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বললেন,—আমার আর কিছই করবার নেই। দিনও ঘনিয়ে এসেছে। এরপর ভার রইল নীলির ওপর। যদি পারো ওকে সাহায্য করো।

সবাই সম্মত হয়। সত্যি যাকে সাহায্য করার কথা সে উপস্থিত নেই।

শাহ্ এদিক-ওদিক চেয়ে জাফরকে প্রশ্ন করেন,—নীলি কোথায়?

—আমি দেখে আসছি।

দেখবার জন্যে বেশীদূর অগ্রসর হতে হয় না জাফরকে। সোপানশ্রেণীর প্রান্তদেশে এসে দেখে উত্তেজিত অবস্থায় ছুটে আসছে নীলি। এই অবস্থায় তাকে ঠিক জাহাঙ্গীরের মত দেখতে লাগে। বেচারা এখন নির্বাসনে। কিছুদিন ধরে নীলির যা ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে, ওকেও না নির্বাসনে যেতে হয়।

জাফর প্রশ্ন করে,—কি হল ?

—এখানে আর বলতে চাই না।

—চলো তবে।

—তুমি সত্যিই জানো না বলতে চাও ?

—না। আমি শাহের কাছেই আছি। অঘটন কিছু ঘটেছে ?

—অঘটন বৈকি ! আস্পর্ধা।

জাফর নীলিকে অনুসরণ করে শাহের সামনে ফিরে আসে। শাহ্‌কে প্রশ্ন করে নীলি,—ফিরিঙ্গি হকিন-এর ব্যাপার শুনেছেন ?

—না। কী হয়েছে ?

—সে তার এক দোস্তকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কেল্লা দেখতে এসেছিল।

—অনেকেই আসে।

—হ্যাঁ, আসে। দর্শনীয় স্থান নিশ্চয় দেখবে। তাই বলে, কেল্লার ফটকের নিচ দিয়ে প্রবেশ করবার সময় কিংবা নকরখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় অশ্ব থেকে অবতরণ করে সবাই। দিল্লীর শাহ্‌কে সম্মান প্রদর্শনের সেটাই হল চির-কালের প্রথা।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় শাহের। প্রশ্ন করেন—তুমি কি বলতে চাও তারা অশ্বারূঢ় অবস্থায় ভেতরে এসেছে ?

—তারা ওই ভাবেই দেওয়ান-ই-খাস আর দেওয়ান-ই-আমে আসে।

শাহের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়। তপ্ত কণ্ঠে বলেন,—এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি।

কিন্তু আগে না ঘটলেও এখন অমন অনেক কিছু অহরহ ঘটতে থাকে। এই শাদামুখো হকিন-ই কয়েকদিনের মধ্যে এমন এক দুর্বিনীত ব্যবহার করল যে, জাফরের মত স্থির-মস্তিষ্ক ব্যক্তিরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়। প্রবল ইচ্ছা হয় তার, পিতামহ প্রদত্ত বন্দুকটি নিয়ে এসে তার নল হকিনের বুকে চেপে ধরে ঘোড়া টিপে দিতে।

হকিন লালপর্দায় এসেছিল দিল্লীর শাহ্‌কে 'নজর' দিতে। চিরকালীন প্রথা অনুযায়ী দিল্লীর শাহের সামনে বহিরাগতদের দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকতে হয়।

ফিরিঙ্গিরা এতদিনের মধ্যেও এই প্রথাকে ভঙ্গ করতে সাহসী হয় নি। কিন্তু উদ্ধত হকিনকে অত্যন্ত শালীনতার সঙ্গে সেই প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে শাহের সামনে একটি আসনে গিয়ে বসে পড়ে। সম্পূর্ণ শিষ্টাচার বিরোধী এবং অসম্মানজনক এই ব্যবহার। অথচ ক্রোধকম্পিত শাহ্কে নীরবে তা সহ্য করতে হয়।

এরপর নিয়মমাফিক হকিনকে বেগমদের সম্মুখে আনা হয়। মাঝখানে ঝরোখা। সেখানেও একই ভঙ্গি। তবু শাহের উত্তরাধিকারী মীর্জা নৌলি মুঘল বংশের রীতি অনুযায়ী অতিথি হকিনকে উপহার দেবার জন্য এক ঝুড়ি ফল নিয়ে এল। তার ইচ্ছা ছিল না শয়তান হকিনকে এই উপহার দিতে। শাহ্ই জোর করে পাঠালেন তাকে। মুঘলদের তরফ থেকে কোনরকম খারাপ ব্যবহার তিনি করতে চান নি। কিন্তু গায়ে পড়ে যে বিবাদ করতে চায় তার অছিলার অভাব হয় না। নৌলির প্রদত্ত ফলের ঝুড়ি প্রত্যাখ্যান করে সদর্পে বিদায় নেয় হকিন।

অত কিছু দেখেশুনে, একজনের একটি উক্তির সারবত্তা অনুভব করে জাফর। উক্তিটি তার নির্বাসিত ভ্রাতার। সে বলেছিল,—ওই ডুবন্ত সূর্য ডুবে যেতে দাও। রাত্রি এলে নতুন সূর্য ওঠবার সম্ভাবনা থাকবে।

কথাটা মর্মে মর্মে সত্য। এত অপমান সয়ে শাহ্গিরির মোহে বন্দী হয়ে থাকার কোন প্রয়োজন হয় না।

বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়।

শাহ্ বার্ধক্যে জরাজীর্ণ। জাফর একদিন সহসা দেখতে পায় তারও যৌবন কবে কোথা দিয়ে চলে গিয়েছে। বুঝতে পারে নি সে। সদা-সঙ্গিনী জিন্নৎ মহল বেগমের অফুরন্ত যৌবন তাকে নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন করে রেখেছিল। শুধু যৌবন নয়, প্রৌঢ়ত্বও যে পার হতে চলেছে, এ খেয়াল তার ছিল না। থাকবার কথা নয়। কারণ মুঘল শাহ্জাদাদের যৌবন বড় দীর্ঘ। যৌবনের পরই কোন এক আঘাতে কিংবা আপনা হতেই সহসা একদিন রাত পোহাতে দেখা যায় জরা এসে আক্রমণ করেছে, জেঁকে বসেছে প্রতি ইন্দ্রিয়ে—সর্ব অবয়বে। এমন ঘটনা তাদের বংশেই কয়েকবার ঘটেছে। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পরদিনই শাহানশাহ্ শাহ্-জাহানের কৃষ্ণকেশদাম শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছিল। দেহের চর্ম হয়েছিল লোল। নিজের পিতাকেও সে দেখল, পুত্রকে এলাহাবাদ নির্বাসনে প্রেরণের পরদিন থেকেই তিনি যেন আর পূর্বদিনের আকবর শাহ্ রইলেন না।

ভ্রাতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছে। নির্বাসনেই মৃত্যু হয়েছে তার এলাহাবাদে।

বড়মুখ করে বলেছিল একদিন জাফর, সাক্ষাৎ করবে গিয়ে তার সঙ্গে। যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। ইচ্ছা থাকলেও উদ্যমের অভাব ছিল। পিতার হতাশা যেন তাকেও দিনের পর দিন পেয়ে বসেছে।

জীবিত অবস্থায় যে ভাই তার অতি প্রিয় দিল্লী নগরী আর দেখবার সুযোগ পেল না, মৃত্যুর পর তাকে আনা হল সেখানে। দিল্লীতেই সমাধিস্থ করা হল তাকে। এর জন্যে সম্মতি নিতে হল ফিরিঙ্গিদেরই কাছ থেকে, যারা আজ প্রকৃত-পক্ষে হিন্দুস্থানের মালিক হয়ে বসেছে। এই উৎকট সত্যটি অস্বীকার করে লাভ নেই যে, তারা দিল্লীর শাহেরও প্রভুর পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে—শাহ্ আলমের সময় যা পুরোপুরি হতে পারে নি।

বছর গড়িয়ে চলে। বহুমূল্য সময়ের অপচয়। পিতামহ প্রদত্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি নিভৃতে পড়ে রয়েছে কতদিন, কত মাস, কত বছর। যোগ্য ভেবে অযোগ্যের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন সেটি শাহ্ আলম। অল্প বয়সের আদর্শ আর উদ্যমকে তিনি সত্য ভেবে নিয়েছিলেন। প্রতারিত হয়েছেন তিনি। এর চাইতে ওটি যদি জাহাঙ্গীরের হাতে পড়ত তা'হলে অন্ততঃ সেটন্‌-এর মস্তক ভেদ করত তার নিক্ষিপ্ত গুলি।

সময়ের অপচয়, যৌবনের অপচয়—সব কিছুর অপচয় ঘটিয়েছে সে। আজ হঠাৎ প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছে চমকে উঠে লাভ নেই।

নিজের প্রৌঢ়ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল সে নিজের চেহারা দেখে নয়—অন্য ভাবে। আরশিতে মুখ দেখার মতই সে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পেল অপর একজনের মুখে।

দিবালোকে জাফর বেগম-মহলে কদাচিৎ প্রবেশ করে। প্রবেশ করলেও জিন্নৎ-এর বিশ্রাম কক্ষে। সেদিন কী এক কৌতূহল হল কিংবা বোধহয় সমবেদনা অনুভূত হয়েছিল তার বিগত দিনের বেগমদের প্রতি। যারা নিজের দোষে নয়, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে জাফরের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। ওরা অজ্ঞ, বেগম হয়েও যে স্বামীকে প্রগাঢ় ভালবাসা যায়, একথা ওরা জানত না। তাই ঠকেছে।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় জাফর, একটি কক্ষের সামনে। তার ধারণা ছিল না, এই অসময়ে বেগমরা কত অপ্রস্তুত থাকতে পারে। মোতিবাঈকে, মাঝে একদিন দেখেও খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কিন্তু আজ হঠাৎ এ-সময়ে যাকে দেখে চমকে ওঠে জাফর—ললাটে বলিরেখা, অর্ধপক্ক কেশ, স্থূলাঙ্গী মোতিবাঈ সামনে এগিয়ে এসে, তাকে দেখতে পেয়েই ছুটে ভেতরে চলে যায়।

—শোন, বেগমসাহেবা।

—না, না। তুমি যাও। জিন্নৎ রয়েছে—যাও।

—শোন, লজ্জার কিছুই নেই। বয়স হওয়াটা অপরাধ নয়। বরং তুমি মনে করিয়ে দিলে যে আমারও বয়স হয়েছে। আমিও যুবক নই।

মোতিবাঈ হেসে ওঠে। লজ্জা তার কেটে যায়। ঢিলে শরীরটাকে টানতে টানতে কাছে এনে বলে,—পুরুষের আবার বয়স। তবু আজ ভাবতে ভাল লাগে, তোমার আর আমার মধ্যে এককালে অন্য কেউ ছিল না। আমার কাছে আসতেই হত তোমাকে। বসন্তের এই একটি দরজাই খোলা ছিল। সেইসব দিন বহুকাল গত হয়েছে।

—হ্যাঁ, অনেক বছর পার হয়েছে। আমি তোমাদের প্রাপ্য কিছুই দিই নি। ছোট করেছি তোমাদের। সেইসঙ্গে নিজেও ছোট হয়েছি।

—বয়স বেড়ে তাহলে তোমার জ্ঞান হয়েছে দেখছি। মোতিবাঈ হাসতে থাকে। রসলেসহীন কণ্ঠের প্রৌঢ়ত্বের হাসি।

জাফর চুপ করে থাকে। তার ইচ্ছে হয়, বেগমদের কক্ষে কক্ষে ঘুরে ক্ষমা চেয়ে বেড়ায়। মনে তার ধারণা ছিল, ওরা তাকে ভাল বাসতে পারে নি, প্রেরণা দিতে পারে নি। তাই মহৎ কিছু করা—দেশের জন্যই হোক অথবা কাব্য-রসিকদের জন্যেই হোক—কিছুই করতে পারে নি সে। ভুল—সব ভুল। আসলে তার নিজের ভেতরটাই অন্তঃসার শূন্য, যার ফলে সে অন্যের হৃদয়গুলোকেও ফাঁপা বলে ভেবেছে। এও এক ধরনের আত্মম্ভরিতা।

—মোতিবাঈ, পারলে আমাকে ক্ষমা করো।

আবার হাসে মোতিবাঈ। তার হাসিতে মাধুর্য ছিল এককালে। এই হাসি শুনে প্রথম যৌবনে মুগ্ধও হয়েছে জাফর। এখন সেই হাসিতে বয়সের ভঙ্গুরতা।

হাসি থামিয়ে সে বলে,—নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছি। আমরা সবাই তোমাকে ক্ষমা করেছি। যতদিন যৌবন ছিল পারি নি—এখন পেরেছি। বিশ্বাস না হয়, অন্যান্য বৃদ্ধাদের কাছে যাও। জিজ্ঞাসা করে দেখো, সত্যি বলেছি কিনা।

জিন্নৎ ছুটে আসে।

মোতিবাঈ বলে,—এই যে এসে গিয়েছে। তোমার শরীরে একটু সুঘ্রাণ রয়েছে, আমরা যা আগে বুঝতে পারতাম। জিন্নৎ এখনো সেই ঘ্রাণ পায়। তাই টের পায় তোমার উপস্থিতি। যাও দেরি করো না। আহা, বেচারী!

জিন্নৎ মোতিবাঈ-এর দিকে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে,—না, শাহ্ ডেকে পাঠিয়েছেন এই মুহূর্তেই।

—এখন? এই অসময়ে?

—হ্যাঁ, শুনলাম কলকাতা থেকে খবর এসেছে।

কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা। হিন্দুস্তানের কত ইতিহাস বিজড়িত এই দিল্লী নগরী। আর কলকাতা হল সম্পূর্ণ নতুন। গঙ্গার তীরে নতুন গড়ে ওঠা ব্যবসাকেন্দ্র মাত্র। এই কলকাতাকেই ফিরিঙ্গিরা রাজধানী নির্বাচিত করেছে। কারণ এ-দেশের যত কিছু সম্পদ, নিজেদের দেশে পাচার করাবার রাস্তাটির ওপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। তবে বেশিদিন এ-সুখ ভোগ করতে হবে না আর। অগনিত দেশবাসী একদিন না একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। বলবে, হটাও ওদের। ওরা শত্রু। সেদিন আগুন জ্বলে উঠবে। সেই আগুনে পুড়ে মরবে ওরা, আর তা যদি না মরে, তবে কলকাতা ছেড়ে দিল্লী আসতেই হবে। রাজ-ধানীর চিরকালের সম্মান দিতে হবে একে। কারণ এখান থেকে সমস্ত দেশের ওপর দৃষ্টি রাখবার মত দ্বিতীয় স্থান আর একটিও নেই।

কিন্তু সেদিন যেন না আসে। জাফর, শাহের কক্ষের দিকে চলতে চলতে ভাবে, কলকাতা থেকে আসা সংবাদে আজ কতখানি গুরুত্ব। এই গুরুত্ব দিল্লীর মসনদে আসীন ব্যক্তিটিও অস্বীকার করতে সাহস পান না। কিন্তু তাকে কেন ডেকে পাঠালেন শাহ্? অনেক সংবাদই তো আসে—তাকে ডাকা হয় না।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে পিতার কক্ষে প্রবেশ করে জাফর। মনে পড়ে তার, মুসম্মান বারজ-এর এই একই কক্ষে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে একদিন প্রবেশ করেছিল সে। সেদিন এই শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন স্বয়ং শাহ্ আলম। সেদিন আর এদিনে কত পার্থক্য। সেদিনের আশা ভরা কচি বুকখানি কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

মীর্জা নীলি দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। মুখখানা তার থমথমে। পিতার মুখও অতিমাত্রায় গম্ভীর। তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নেয় জাফর, অঘটন কিছু ঘটে গিয়েছে। সে সম্মুখে এসে উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করে,—কী হয়েছে?

উভয়ের কেউ-ই কোন জবাব দেয় না।

জাফর নীলির দিকে চেয়ে বলে,—কোন দুঃসংবাদ?

নীলি নীরব।

তার একটু পরে শাহ্ নড়েচড়ে বসে বলে ওঠেন,—ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে তোমার কতদিনের সখ্যতা?

—সখ্যতা?

—হ্যাঁ।

জাফর হতবাক্। পিতার প্রশ্নে মর্মাহত। সে মীর্জা নীলির মুখের দিকে চায়

ব্যাপারটা জানবার জন্য। কিন্তু নীলি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

অস্বাভাবিক কোন সংবাদ এসেছে ফিরিঙ্গিদের রাজধানী থেকে এবং সেটি তাকেই কেন্দ্র করে। কিন্তু কি সেই সংবাদ। এই বয়সে অতি বৃদ্ধ পিতার তিরস্কারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জাফরের মন।

সে বলে,—সখ্যতা প্রকারান্তরে আপনিই কামনা করেন। তাই ত্রিশ লক্ষ টাকার জন্যে ওদের আদালতকে এককালে আপনিই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যখনই আমরা ওদের কোনও কার্যের প্রতিবাদ করতে চেয়েছি, আপনি বাধা দিয়েছেন।

—চুপ কর।

—আমার চেয়ে কম কথা লালকেল্লায় কোন বাদশাজাদা বলে না কিন্তু বছরের পর বছর কেন আপনি আমার প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করেছেন? আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে জন্মেছি সেটা তো আমার অপরাধ নয়।

—না, সে দোষ আমার ভাগ্যের।

—কিন্তু কী এমন ঘটল যার জন্যে ডেকে এনে এই তিরস্কার। আমি তো আসতে চাই নি। অনেক ব্যাপারেই আমি আসি না।

—তার আগে বৃদ্ধ বয়সে তোমার অনুযোগের কৈফিয়ৎটা দিয়ে নি। তোমার পিতামহকে তুমি দেখেছ। ত্রিশলক্ষ টাকার দাবি তাঁরই। শেষ বয়সে দৃষ্টি হারিয়েও সেই দাবি তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। আমিও আজ মৃত্যুপথযাত্রী বলতে পার। পিতার দাবি শত বাধাবিঘ্ন আর অবিরাম চাপের মধ্যে আমি আঁকড়ে রেখেছি। আদালতকে স্বীকৃতি দেবার কথা বলছ! লালকেল্লার প্রাঙ্গণ ফিরিঙ্গিদের পদশব্দে কম্পিত হতে দেখো না? কি করতে পারি আমি? বাস্তবে যে ক্ষমতার কোন অস্তিত্ব নেই, আইনের চোখে তাকে বজায় রেখে কি হবে?

কথা শেষ করে শাহ্ একখানি পত্র তুলে নিয়ে জাফরের হাতে দেন। জাফর দেখে সেটি বিদেশী ভাষায় লেখা, তবে নিচে উর্দুতে তার তর্জমা করা রয়েছে। পত্রটি পাঠ করে জাফর বিস্ময়াবিষ্ট হয়। সে নীলির কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলে,—আমি চেষ্টা করব যাতে ওরা এটি প্রত্যাহার করে নেয়।

শাহ্ রূঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন—না।

—নয় কেন? আপনি নীলিকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে রেখেছেন। ওদের এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার নেই। খুশীমত ওরা এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। দিল্লীর শাহের সব ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটলেও উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকারটুকু ওরা ছিনিয়ে নিতে পারে না। লালকেল্লায়

ওদের জুতোর মস্‌মস্‌ আওয়াজ শোনা গেলেও নয়।

—ওরা পারে। সব পারে।

বলিষ্ঠ কণ্ঠে জাফর বলে ওঠে—না। আমি দেখব যাতে ওরা না পারে।

শাহের কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে তাঁর। বলেন,—না আব্বু, না। সে চেষ্টা করতে যেও না। তোমায় ওরা পরবর্তী শাহ্ করতে চায়। তাই করুক। তুমি বাধা দিয়ে তৈমুরবংশকে মসনদ থেকে সরিয়ে দিও না। যে ক্ষীণধারাটুকু এখানে বয়ে চলেছে তাকে শুকিয়ে যেতে দিও না।

পিতার বাক্যে প্রার্থনার স্বর। জাফর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলি বলে,—আমিও তাই বলি। তবে বহুদিন থেকে নিজেকে পরবর্তী শাহ্ হিসাবে ভাবতে শিখে বড় আঘাত পেয়েছি। সয়ে নিতে কয়েকদিন সময় লাগবে। আমি কালই শিকারে বার হয়ে যাব। ফিরব যখন, দেখবে তোমরা, কোন খেদ থাকবে না আমার মনে।

শাহ্ বলেন,—তবু আবু রইবে শাহ্। তোমার ভাই। লালকেল্লায় থাকতে পারবে তোমরা।

জাফর পিতার দিকে এগিয়ে যায়। নতজানু হয়ে বলে,—আমায় মার্জনা করুন। রূঢ় হয়েছি আপনার প্রতি। নীলিকে আপনি সবচেয়ে বেশি স্নেহ করেন সেটা আপনার অপরাধ নয়। আমি জানি, আপনি কতবড় দেশপ্রেমিক। ওরা শত চেষ্টাতেও আপনার উন্নত মস্তককে নুইয়ে দিতে পারে নি। এ অবস্থায় এটা যে কতখানি কঠিন, আমি বুঝতে পারি। এই দেখুন আমার কেশও শুভ্র। বিগত যৌবনের দুর্বলতার হাতছানি আমিও দেখতে পাই। কারণ প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখাও আমি ছাড়িয়েছি।

শাহ্ জাফরকে আলিঙ্গন করে বলেন,—তোমার মনে যে দীর্ঘদিনের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল, তুমি তাই প্রকাশ করে ফেলেছ মাত্র। আমি আঘাত পাই নি। আমার শেষ একটি বাসনার কথা তোমায় এইবেলা জানিয়ে রাখি। শক্তিহীন হলেও ওরা যেন বুঝতে পারে প্রতি পদে, সৈন্যশক্তি না থাকলেও অগণিত দেশবাসী রয়েছে তোমার পেছনে। আমি ওদের এটা বোঝাতে পারি নি।

—আমি চেষ্টা করব।

পরদিন সারা হিন্দুস্থান জানল দিল্লীর পরবর্তী শাহ্ মীর্জা নীলি নয়—কবি জাফর।

বাহাদুর শাহ্

[আবু মুজাফ্ফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ্ গাজী]

তিন

পিতার মৃত্যুকালেও সেই একই আক্ষেপ অবলোকন করল জাফর, যা একত্রিশ বছর আগে পিতামহের মধ্যে লক্ষ্য করেছিল শেষ সময়ে। তবে আক্ষেপের প্রবলতা যেন অনেক স্তিমিত। পিতামহের মত ছট্‌ফট্‌ করে দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করেন নি তিনি। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠেছেন বার বার। বুঝতে না পারলেও উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় নি। শাহ্‌ আলমের পর এই একত্রিশ বছরে ফিরিঙ্গিরা অনেক ভালভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস আর মনোবল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই হয়তো পিতার শেষ মুহূর্তের আক্ষেপ অনেক স্তিমিত। কিংবা মুঘল রক্তধারার শক্তি কি কমে আসছে ধীরে ধীরে?

না, না। সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং বলা যেতে পারে, বাবরের রক্ত একদিক দিয়ে নতুন ধরনের প্রেরণা পেয়েছে। এক নতুন ধরনের দেশাত্মবোধ। বুঝতে পেরেছে দেশের জনসাধারণের রক্ত আর সেই রক্ত একই দেশের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় চঞ্চল। শোনিতে শোনিতে ভেদসৃষ্টির প্রবণতা শেষ হয়ে এসেছে। মুঘল বলে আত্মতৃপ্তি লাভের চেয়ে দেশেরই একজন বীর ভাবতে অনেক বেশী সুখ। সব রক্তই লাল—সব শোনিতই একই পদার্থের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে।

সম্বিত ফিরে আসে জাফরের। পবিত্র কোর-আন থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সুগম্ভীর বাণী। পিতা শায়িত। মা অনেক আগেই চলে গেছেন। মায়ের শেষ সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে নি সে। জিন্নৎ ছিল। জিন্নৎকে খুব ধীরে ধীরে তিনি বলেছিলেন,—আবু বড় অসময়ে জন্মেছে। ওর মূল্য কেউ দেবে না। দুশো বছর আগে কিংবা দুশো বছর পরে জন্মালে ভাল হত।

এদিকে ওদিকে চায় জাফর। জিন্নৎ নিশ্চয়ই রয়েছে কোথাও কাছাকাছি। হয়তো অন্য কক্ষে। পিতামহের মৃত্যুর সময় জাফর অপর কক্ষে চাপা ক্রন্দনধ্বনি শুনেছিল। বৃদ্ধা বেগমদের ক্রন্দনধ্বনি। কিন্তু আজ অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে চতুর্দিকে।

তার নিজেরও চোখে জল নেই। বয়স চোখের জল শুষে নেয়। বয়স আরও অনেক কিছুই শুষে নেবার চেষ্টা করে। পঙ্গু হয় শরীর-মন সবই। উদ্যম যায়

কমে, প্রেরণা হয় উধাও। এই মুহূর্তে নিজেকেও স্থবির বলে মনে হয় জাফরের। তাই দেহকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে ভ্রাতা মীর্জা নীলির গায়ে হাত রেখে ফিরিঙ্গি শাসিত দিল্লীর নতুন শাহ্ বলেন,—ব্যবস্থা করে ফেলতে হয়।

নীলি খুবই বিচলিত। পিতা তাকে ভালবাসতেন। তবু নিজেকে সামলে সে বলে,—হ্যাঁ।

কক্ষ থেকে জাফর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়। সে লক্ষ্য করে না তার পুত্ররা এবং অন্যান্য শাহাজাদারা তার দিকে চেয়ে রয়েছে। স্খলিত চরণে অনেক কক্ষ অতিক্রম করে নিজের অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে। পিতামহ প্রদত্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে বলে,—এই বয়সে কি সুকঠিন কর্তব্যভার অর্পিত হল আমার ওপর। তোমার আশা ব্যর্থ হয়েছে দাদু। আমি অনুপযুক্ত।

নিজামুদ্দিন আউলার দরগার চত্বরে প্রভাতের একফালি সোনালী রোদ সবে এসে উঁকি দিয়েছে।

গুলাম হাসান সুদীর্ঘকাল এই পবিত্র স্থানটির তত্ত্বাবধায়ক। এখন সে বয়সের ভারে ঈষৎ নত। তবু কর্তব্যের ত্রুটি নেই কোন। দিল্লীর শাহ্ বাহাদুর শাহ্ ওরফে জাফর শুধু তার বন্ধুই নন, দু'জনার মন দু'টি বড় বেশি কাছাকাছি—একই সুরে বাঁধা ও সাধা।

ঊষার আলো ফুটে ওঠবার পূর্বেই হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হয় প্রতিদিন। কিন্তু আজ বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। উঠতে গিয়েও মাথা তুলতে অক্ষম হয় হাসান। তবে কি আল্লা এতদিন পরে তাকে স্মরণ করলেন? তাই যদি হয় তবে ক্ষতি নেই। কিন্তু কী যেন এক অতি পবিত্র কর্তব্য বাকি রয়ে গেল জীবনে—সেটি সমাধা হবার আগেই কি তার মৃত্যু হবে? সুদূর অতীতে, প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে, এমনি এক প্রভাতে কোথা থেকে যেন সহসা উচ্চারিত হয়েছিল—হাসান, মন দিয়ে শোন। তোমার কাছে যে অতি পবিত্র সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে তার উপযুক্ত হবার জন্য সারা জীবন ধরে মনকে পবিত্র কর।

সেদিন সে সচকিত হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, ছুটে রাস্তায় বার হয়ে গিয়েছিল, তবু জনপ্রাণী দেখতে পায় নি। ফিরে এসেছিল আবার। উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপছিল। কে বলল, এই কথা! জবাব পায় নি। কিন্তু তবু সেই গুরুগম্ভীর অথচ সুমিষ্ট নির্দেশ অবহেলা করবার মত স্পর্ধা তার এক দণ্ডের তরেও হয় নি। সারা জীবন ধরে সে পবিত্র কোর-আন পাঠ করল। মনকে পবিত্র করবার শ্রেষ্ঠ উপায় এর চাইতে আর কী থাকতে পারে ভূমণ্ডলে? এই কোর-

আন পাঠ তাকে অনেক প্রলোভন, অনেক দুর্বলতা জয়ে সাহায্য করেছে। এখন আর কোন কিছুতে বিন্দুমাত্র মোহ নেই—মোহ রয়েছে শুধু ঈশ্বর-চিন্তায়।

কিন্তু কোথায় সে পবিত্র সম্পদ যা তার কাছে গচ্ছিত রাখা হবে? এখনো তো সে পেল না। কে দেবে? আর কবেই বা দেবে? আর যে সে মাথা তুলে চলাফেরা করতেও পারবে না।

—ভুল করছ। পারবে।

চমকে ওঠে হাসান। পারবে সে? মাথা তুলতে পারবে আবার? কিন্তু কে বলল এ কথা? তার মন? কখনই নয়। সুস্পষ্ট ধ্বনি এল বাইরে থেকে। বেশ, পরীক্ষা করা যাক। এই যে সে উঠছে। মাথা তুলতে পারে কিনা দেখাই যাক।

আশ্চর্য! শরীরে যে অসীম বল। মনে এত স্ফূর্তি এল কোথা থেকে? মাথাটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল যে।

হাসান ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিজামুদ্দিন আউলার সমাধির ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তোমারই দয়ায় আল্লার দয়া লাভ করেছি। তুমিই আমার পথপ্রদর্শক।

—হাসান।

—কে?

—আমি—আমি জাফর।

—ও, কতক্ষণ এসেছ শাহ্।

—এইমাত্র।

—ও। তবে তুমি নও।

—তুমি কাঁদছ হাসান!

—হ্যাঁ, বাদশাহ্।

—এই প্রবঞ্চনা আমায় করে তোমার লাভ হাসান?

—প্রবঞ্চনা?

—হ্যাঁ। তুমি কাঁদছ? সত্যিই কাঁদছ!

—হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ তো নিজেই।

—তবে তোমার সারা দেহে আনন্দের রোমাঞ্চ কেন?

হাসান দুই হাতে বাহাদুর শাহ্কে জড়িয়ে ধরে। মুখ ফুটে বলবার সাধ্য তার থাকে না কিছুই।

জাফর হেসে বলেন,—আমি জানতাম।

এরপর তারা বহুক্ষণ ধরে নানান্ কথা বলে। শেষে একসময় লালকেল্লা অভিমুখে রওনা হন শাহ্। দরগায় আসবার সময় তিনি সাধারণতঃ শকট ব্যবহার করেন না। তাই পথচারীর দৃষ্টি এড়াবার জন্য তাঁর অতি সাধারণ বেশবাসকে সাধারণ নাগরিকের মত করে ফেলেন। শাহ্ বলে চিনতেও ভুল হয়। শুধু কেল্লায় প্রহরীরা চিনতে পারে তাঁকে। আর পারে ফিরিঙ্গিরা। বাহাদুর শাহ্ নিজেও জানেন না। তাঁর অলক্ষ্যে ফিরিঙ্গিরা দেশীয় লোকদের দ্বারা তাঁর ওপর কড়া নজর রাখবার চেষ্টা করে।

দরগার বাইরে আসতেই এক বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন করে। অনেক বছর আগে এইখানেই বাহাদুর শাহ্ তাঁর প্রিয় গুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। হাতে ছিল তাঁর কোর-আন শরিফ। সেই গ্রন্থ তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র শাহের হাতে সমর্পণ করে বিদায় নিয়েছিলেন। আর দেখা হয় নি তাঁর সঙ্গে। মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

—কে তুমি!

—আমায় চিনবেন না শাহ্। আমি দিল্লীর মানুষ নই। বহু দূরদেশ থেকে এসেছি।

—আমায় চিনলে কেমন করে?

—কেল্লার পাশে তিনদিন অপেক্ষা করে আপনাকে লক্ষ্য করেছি, যতবার আপনি আসা-যাওয়া করেছেন।

—আমি তো অধিকাংশ সময়ে শকটে যাতায়াত করেছি।

—তবু চিনেছি। কারণ আপনি যাবার কিছু পরেই ফিরিঙ্গিদের একটি শকট বার হয় রোজ। অন্তত এই তিনদিন যতবার আপনি বাইরে এসেছেন, শকটটি পেছনে পেছনে গিয়েছে। ওরা আপনার নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন হয়তো।

বাহাদুর শাহ্ চিন্তিত হন অপরিচিতের কথায়। একজন বাইরের মানুষ তিনদিনে যা সন্দেহ করল, কেল্লায় কারও এতদিনেও তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল না? তবু মনোভাব চেপে রাখেন তিনি অপরিচিতের সামনে।

—আমার অনুসরণ করে এখানে কেন এসেছ?

—বাদশাহ্, আপনার পিতামহ যখন জীবিত, তখন একদিন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলাম।

—বহু আগের কথা। মনে পড়ছে না।

—স্বাভাবিক। আমার নাম সামসুদ্দিন। বাঙলা দেশ থেকে এসেছি।

—বল, কেন এসেছ।

—আপনার হয়তো একথাও মনে নেই যে, শিকার করে ফিরছিলেন একদিন রাতের অন্ধকারে। আপনার অশ্বটি আমার বাহনটির সন্ধান পেয়ে সেদিন এগিয়ে গিয়েছিল কেল্লার প্রাচীরের ধার ঘেঁষে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। অমন একটি ঘটনা ঘটেছিল বটে। বহু আগে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সামসুদ্দিন ফিঁকে হেসে বলে,—আপনার স্মৃতিশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ জনাব।

—হ্যাঁ, এখন তাই প্রমাণ হচ্ছে বটে। কারণ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, তুমি লোক পাঠাবে বলেছিলে, কিন্তু পাঠাও নি। ধর্ম নিয়ে অনেকের সঙ্গে অনেক আলোচনাই হয়। বাঙলা দেশ থেকে তো কেউ কখনো আসে নি।

—না, কেউ আসে নি। উদ্যম পায় নি এতদিন। কেন পায় নি, তার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না অনুগ্রহ করে।

—সারা দেশের নাড়ীর স্পন্দন জানবার জন্যে একটি উপায় ঠিক করে রেখেছি! শিগ্‌গিরই সেটা চালু করব। আশা করি তোমার মুলুকের বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তার সুযোগ নেবে।

—নিশ্চয়ই নেবে। কী সেই উপায় বাদশাহ্?

—তোমায় আমি এতটুকু অবিশ্বাস করি না সামসুদ্দিন। যদিও চল্লিশ বছরের মধ্যে মাত্র দুটো দিন তোমায় দেখেছি সামান্য সময়ের জন্যে, কিন্তু একথা জানি, সখ করে এতদিন পরে অতদূর থেকে তুমি আমার কাছে আসো নি। তোমার সামর্থ্য হয়তো আমার মতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তুমি স্বপ্ন দেখো, তুমি উদ্যমী, ভবিষ্যতের প্রতি এবং দেশ-বাসীর প্রতি তোমার রয়েছে অবিচল আস্থা। সর্বোপরি, তুমি দেশপ্রেমিক। বাঙলার শিক্ষিতদের মত তুমি ফিরিঙ্গি ঘেঁষা নও। শোন, আমি ধর্ম সম্বন্ধে যখন আলোচনা করব, তখন যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী তারা একটি করে গোলাপী রুমাল গ্রহণ করবে আমার কাছ থেকে। সেই রুমাল নিয়ে তারা নিজ নিজ মুলুকে ফিরবে এবং আমার উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করবে। যাতে তারাও সচেতন হয়ে ওঠে। শুধু ফিরিঙ্গিদের সেনা-বিভাগের মানুষ নয়, দেশের সাধারণ মানুষকেও এ সম্বন্ধে বলতে হবে।

সামসুদ্দিন বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলে,—আপনি সুফীবাদে বিশ্বাসী। দেশে ধর্ম সম্বন্ধে বহু মত রয়েছে।

বাদশাহ্ বলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু আমার আসল ধর্মটির বিষয়ে মতভেদ থাকা উচিত নয়। সেটি হল দেশকে ভালবাসা। গোলাপী রুমাল তারই প্রতীক।

সামসুদ্দিনের মনের অন্ধকার মুহূর্তেই দূরীভূত হয়। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে,—আমি বৃদ্ধ হয়েছি। হয়তো দেখে যেতে পারব না সবটা। বাঙলার চাষীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের চাষের লাঙল এক অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্যত হতে চায়। শত্রুকে তারা চিনতে পারছে না। আপনার নেতৃত্ব তাদের শত্রু সম্বন্ধে সচেতন করবে।

—আমি জানি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা সোনা ফলায় তারাই হল সংগ্রামের শক্তি। অন্যেরা, বিশেষ করে বাঙলার 'বাবুরা' ফিরিঙ্গিদের পোষা কুকুর। হিন্দুস্থানের নবাব, রাজা আর জমিদাররা বিদেশীদের নকল করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা যে কোন রকমে ওদের এদেশে রাখবার জন্যে পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে রক্তপাত ঘটাতেও পেছপা নয়। আর সেই রক্ত এই বাদশাহের নয় সামসুদ্দিন—তৈমুর বংশের কারও নয়। কারণ বাদশাহ্ মাত্র একজন। তার রক্তপাতে কিছুই এসে যায় না। সে রক্ত সারা হিন্দুস্থানের।

—আপনার দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ।

—না। স্বচ্ছ করবার চেষ্টা করি মাত্র। কারণ বাদশাহী বংশের গর্ব এতটুকু বিসর্জন দিতে পারি নি। যদি পারতাম তা'হলে স্বচ্ছ হতে পারতো কিছুটা।

সামসুদ্দিন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে স্পষ্ট স্বরে বলে,—আপনি যথার্থ বলেছেন। নিজেকে যে আপনি কিছুটা চিনতে পেরেছেন, সেইটুকুই হল দেশের ভরসা।

ফিরিঙ্গি কর্তারা লিখে পাঠালো, আকবর শাহ্ যে টাকার দাবি করেছিলেন বছরে, সেই পরিমাণ টাকার দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত বাহাদুর শাহের। অসহ্য মনে হল এই অন্যায় আবদার। আবদার তো নয়, বলা যেতে পারে প্রকারান্তরে আদেশ। প্রতিবাদ জানালেন বাহাদুর শাহ্ পত্রপাঠ। শাহ্ আলমের এই দাবি তাঁর পিতা আঁকড়ে রেখেছিলেন বলে একদিন সে আকবর শাহ্‌কে কটু কথা শুনিয়েছিল। আজ প্রকৃতই অনুতাপ হয় সেজন্যে। দেশের সম্মান যেন আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই দাবিটুকুর ওপর। দেশের অপমান তিনি হতে দেবেন না।

ফল ফলতে খুব বেশি দেরি হল না। বাদশাহ্‌কে এতদিন সম্মান প্রদর্শনের যে প্রথা চালু ছিল উপহার বা নজর দেবার মাধ্যমে, বড় কর্তা লর্ড অকল্যাণ্ড সেই ব্যবস্থা বাতিল করে দিল। শুধু তাতেই সে সন্তুষ্ট রইল না। বাদশাহের 'খিল্লাত' দেবার অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আর এক আঘাত। দেওয়ান-ই-আম বন্ধ করে

দেওয়া হল। দেওয়ান-ই-খাসের দরজা শুধু খোলা রইল। কিন্তু তা বন্ধ করলেই সম্ভবত ভাল ছিল। কারণ এর পরই এল বিদেশীদের তরফ থেকে প্রচণ্ডতম আঘাত। দেওয়ান-ই-খাসের রৌপ্য-সিংহাসন অপসারিত করে মাটির নীচের একটি প্রকোষ্ঠে বন্ধ করে রাখা হল।

ক্রোধকম্পিত বাদশাহ্ মুসম্মান রায়ত-এর স্বীয় শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তিনজনকে—দারা বখত্, জওয়ান বখত্ এবং মীর্জা মুঘল। তারা সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করেন—আমার ধমনীর রক্ত কি শীতল হয়ে গিয়েছে বলে মনে কর তোমরা ?

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বখত্ গম্ভীর স্বরে বলে—মনে হয় না।

জওয়ান বখত্ ঘাড় হেলিয়ে দারার কথায় সায় দেয়।

মীর্জা মুঘল স্পষ্ট বলে,—আপনার ধমনীব রক্ত ঠাণ্ডা হলে বুঝতে হবে হিন্দুস্থানে মৃত্যুর শীতলতা নেমে আসছে।

—কিন্তু আমার তো তাই মনে হচ্ছে। পিতামহ শাহ্ আলমকে দেখেছি, পিতা আকবর শাহ্‌কেও দেখলাম,—শুধু অসহায় অবস্থায় মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখে শেষদিনে একটা আক্ষেপ-জনিত যন্ত্রণার অব্যক্ত ধ্বনি তুলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। আমিও সুনিশ্চিত ভাবে সেই একই পথে এগিয়ে চলেছি।

তিন পুত্র শুধু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বক্তব্য তাদের কিছুই থাকতে পারে না। কারণ তারা জানে পিতা তাদের জ্ঞানবান। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাদের চাইতে বহুগুণ বেশি।

নিরুত্তর তিন পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বাহাদুর শাহ্ ভাবেন, ফিরিঙ্গিরা দিনের পর দিন, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের মাজা ভেঙে দিয়ে নবাব আর নৃপতিদের বশে এনে অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছে। তারা দেশের একদল বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মাভিমানের জন্ম দিয়ে সুকৌশলে তাদের স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। হিন্দুস্থানের প্রকৃত শক্তি সঞ্চিত রয়েছে যেখানে, সেই কোটি কোটি কৃষকদের, বলপ্রয়োগে কিংবা আইনের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। কোথাও বা নেশা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা যতদিন নেশাগ্রস্ত হয়ে নিদ্রিত থাকবে ততদিন বিদেশীরা নিশ্চিন্ত, আর নিশ্চিন্ত রাজন্যবর্গ, ধনী এবং বিশেষ সুবিধাভোগী তথাকথিত শিক্ষিতরা। এই শিক্ষিতরা বাঙলা মুলুকে নবযুগের সূত্রপাতের ছলনায় সাধারণ-মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর গহ্বরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাহাদুর শাহ্ বলে ওঠেন—সারা জীবন ধরে ভুল করেছি।

মীর্জা মুঘল বলে ওঠে,—আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভুল আপনি করতে পারেন না।

—ভুল দুই রকমের হয়। একটি মস্তিষ্ক-জনিত, অন্যটি মজ্জাগত। বুদ্ধি বা বিদ্যার ভুলকে সংশোধন করবার উপায় আছে। কিন্তু মজ্জায় মজ্জায় যে ভুল মিশে রয়েছে, তাকে ভুল জেনেও শুধরে নেবার মানুষ বিরল।

দারা বখত্‌ বলে,—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝবে না। এটা উপলব্ধি করা কঠিন। আমিও বুঝতাম না অল্প বয়সে। এমন কি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও বহুদিন বুঝি নি। এখন বুঝি—কিন্তু বড় বিলম্বে।

আমাদের যদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেন।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় বাদশাহের চোখে। পুত্রত্রয়ের মুখের দিকে একে একে দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠেন,—পারবে? পারবে তোমরা মুঘলবংশের অভিমান পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেতে? পারবে? একাত্ম হতে পারবে তাদের সঙ্গে? তবেই তো জানতে পারবে কোথায় তাদের প্রকৃত ব্যথা—কোথায় তাদের আফশোস। জানি পারবে না। কোন নবাব বাদশাহ্‌ পারে নি কখনো। পারতে পারে না। লালকেল্লার মিনারে দাঁড়িয়ে অভাগা দেশবাসীকে মিথ্যা আশার বড় বড় বাণী শোনানো যায়—তাদের সীমাহীন গলদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, তাদের প্রতি দোষারোপ করা যায়। কিন্তু তাদের মঙ্গল একবিন্দুও করা যায় না।

জওয়ান বখত্‌ বলে,—মুঘল বাদশাহ্‌রা ছদ্মবেশে তো তাদের সঙ্গে মিশতেন। সেইভাবে তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতেন।

বাহাদুর শাহ্‌ হেসে ওঠেন। একটা প্রচণ্ড ধিক্কারের হাসি। শেষে বলেন,—ছদ্মবেশ! শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু তাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে সচেতন ছিলেন যে বাদশাহ্‌ হিসাবে উপকার করবার জন্যেই তাঁরা সঙ্‌ সেজেছেন। মিশে যেতে পারেন নি কখনো। গরীবের দুঃখে করুণা প্রদর্শন এক ধরনের বিলাসিতা। এই বিলাসিতা ত্যাগ করতে আমিও পারি নি—তোমরাও পারবে না।

পুত্ররা বাদশাহের কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে ভাবে, এও এক ধরনের কবি-কল্পনা।

পুত্রদের বিদায় দিয়ে বাদশাহ্‌ আবু মুজাফ্‌ফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌ গাজী বাতায়নপথে দূর নীলাকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। ওই আকাশের নীচে কত শত গ্রাম, কত জনপদ। ওই সব গ্রামের মানুষের মনে একসঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলে ফিরিঙ্গিদের সাধ্য নেই এদেশে তিষ্ঠাতে পারে। সেই আগুন কি জ্বলবে তাঁর জীবিত কালে? জানেন না তিনি। কিন্তু যদি একটি স্ফুলিঙ্গও তাঁর চোখে পড়ে

তবে সেই স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে পরিণত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। শাহ্ আলম প্রদত্ত একটি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদেশীদের বিতাড়িত করা যায় না। এটা নিছক ভাববিলাসিতা। রাজন্যবর্গের মিলিত সেনা নিয়েও নয়। কিন্তু ওইসব জনপদের কোটি কোটি মানুষ যদি তাদের জীবিকার্জনের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার নিয়েও ছুটে আসে, তা'হলে সমুদ্রের পরপারে নির্মিত শক্তিশালী কামানগুলিও স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বাহাদুর শাহ্ তাঁর লেখনী হাতে নেন। সেইটির দিকে চেয়ে অস্পষ্ট হাসি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর মুখে। লোকে বলে অসির চেয়ে শতগুণ তীক্ষ্ণ ধার এটির। তেমন হস্তে পড়লে হয়তো সত্যই অগ্নিবর্ষী। কিন্তু এই মুহূর্তে হস্তের এই লেখনীকে দেখে মনে হচ্ছে হিন্দুস্থানের দুর্বলতম ব্যক্তির শেষ আশ্রয়স্থল। মুঘল মসনদ ওরা অপসারিত করেছে—দেশের বুকে এঁকে দিয়েছে পদাঘাতের চিহ্ন। ওই মসনদ ছিল এ-দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। তবু তিনি নিশ্চেষ্ট। অক্ষম বলেই তো।

কিংবা বাদশাহী আমল কি শেষ হয়ে এল পৃথিবী থেকে? হয়তো একটি নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে—যে যুগে মসনদের মূল্য কানাকড়িও রইবে না।

কল্পনার তরী আরও ভেসে চলে বাদশাহের। হাতের লেখনী ধীরে ধীরে আঁচড় কাটতে থাকে—

আয় জাফর জো কুচ্ কিয়ে হাম্‌নে
জবরদস্তী সে কাম
উন্‌কে বদ্‌লে মিল রহে হেঁ জবরদস্তী
মেঁ হামে।

হায় জাফর, এখন আমরা দুর্বল। তাই অতীতের কৃতকর্মস্বরূপ এখন নির্যাতন ভোগ করছি।

কয়েকবার শ্যারটি পাঠ করে জাফর আরও রচনার জন্য মনোনিবেশ করেন। ভাবেন, যতবড় বাদশাহ্‌ই হোন না কেন, দেশের প্রধানতম অংশকে বাদ দিয়েই সবাই চলেছেন। তাই শেষ বংশধরদের এই দুর্গতি। এই দুর্গতির মধ্যে দিয়ে যদি দেশের সবার মঙ্গলের সূচনা হয় তা'হলে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু তা কি হবে?

শ্যার আর দিওয়ানের মধ্যে ডুবে থেকে তৃপ্তি পেলেন না বাহাদুর শাহ্। ঘটনার গতি দ্রুত তাঁকে কর্মজীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। বাঙ্‌লা মুলুক থেকে যেমন সামসুদ্দিন এসেছিল একদিন, তেমনি পাঞ্জাব, দক্ষিণ-ভারত, বারাণসী থেকে আসতে থাকে অনেকে। সুফী সমাজের শিরোমণি বাদশাহের দর্শনপ্রার্থী হয়ে

আসে তারা। বাদশাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়। আর সঙ্গে করে নিয়ে যায় বাদশাহ্ অর্পিত গোলাপী রুমাল। সেই রুমাল ফিরিঙ্গিদের দেশী ফৌজের বৈচিত্র্যহীন পোশাকের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে হামেশা।

সদাসতর্ক বিদেশীদের নজর এড়ালো না এটি। সন্দেহের ছায়াপাত ঘটল তাদের মনে। লালকেল্লায় ফিরিঙ্গি পাহারা জোরদার করা হল। বাদশাহের গতিবিধির উপর নজর তীক্ষ্ণতর হল।

ঠিক এই সময়, আর একটি ঘটনা ঘটল। বিদেশী কর্তৃপক্ষ গোয়ালাদের ওপর আদেশ জারি করল, সমস্ত খাটাল স্থানান্তরিত করতে হবে দিল্লী নগরীর বাইরে। অসহায় গোয়ালারা এ ধরনের আদেশ শুনে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। তাদের পিতৃপুরুষেরা বিপদ-আপদে বাদশাহের কাছে ছুটে যেত এককালে। তাতেই ফল হত। কিন্তু এখন তারা সচেতন যে, ওই রাঙা-মুখো বাঁদরগুলোর বড় বেশি প্রতাপ। শাহের হাতও তারা বেঁধে ফেলেছে প্রায়। কী করবে ভেবে না পেয়ে রাতের অন্ধকারে একটি খাটালের চৌহদ্দির মধ্যে বসে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু অন্ধকার কেটে গিয়ে পুবের আকাশ ফিঁকে হয়ে আসে, তবু সমাধান খুঁজে পায় না।

শেষে একজন বৃদ্ধ গোয়ালা, সে সর্বক্ষণ ধরে ঢুলছিল, খেঁকিয়ে ওঠে,—অত চিন্তার কি আছে—এঁ্যা?

—সে কি খুড়ো, এতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, এখন যে একেবারে পবিত্রাতা মধুসূদনের মত কথা বলছ!

—তোদের নরক গুলজার শুনছিলাম আর মনে মনে হাসছিলাম।

—হাসছিলে? এই ঘোর বিপদে ওই পোড়ামুখে হাসি এসেছিল?

—আসবে না কেন? আমার যে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—তাই হাসছি। এতো যে বক্-বক্ করলি, এই বুড়ো যে সারারাত জেগে বসে আছে, একবারও তার কাছে পরামর্শ চেয়েছিস্?

সবাই কৌতূহলী হয়ে বৃদ্ধকে ঘিরে বসে বলে,—বল, তোমার পরামর্শটা বল।

বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—তোদের বাপ-ঠাকুর্দা যা করেছে তাই কর গে, যা।

—তার মানে?

—মানে আবার কি? এই সোজা কথাটার মানে?

—তোমার মত বুদ্ধি যে নেই খুড়ো। রাগ কর কেন?

—দেওয়ান-ই-খাসে গিয়ে হাজির হ। দরবার বসে না সেখানে? কিন্তু শাহ্ আসেন। তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

একসঙ্গে কথা বলে ওঠে ওরা,—কী যে বল, সেদিন কি আছে? থাকলে এত ভাবনা?

—সেই দিনই আছে এখনো। তোরাই থাকতে দিচ্ছিস্ না বোকা। যা বললাম কর গে, যা—

বৃদ্ধের পরামর্শ শুনে সবাই আবার আলোচনায় বসে। শেষে স্থির হয়, কিছুই যখন করবার নেই, শাহের দর্শনপ্রার্থী হবে তারা।

ওদের কথা শুনলেন বাহাদুর শাহ্। ধৈর্য ধরে শুনলেন বটে। কিন্তু শোনবার পরই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। সারা দেশ কুক্ষিগত করে শেষে দিল্লীনগরীর ওপর বার বার ওরা হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। দিল্লীবাসীর মনে ওরা গেঁথে দিতে চায় লালকেল্লার শাহ্ গুরুত্ববিহীন একজন মনুষ্যমাত্র। প্রকৃতই তিনি তাই। কারণ ওদের হুকুমনামা সরাসরি নাকচ করে-দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তবু একটা কিছু তাঁকে করতে হবে। দেশের মধ্যে অন্ততঃ এই ধারণা বজায় রাখতে হবে, দিল্লীতে শাহের অস্তিত্ব রয়েছে।

কেল্লার সবাইকে কেল্লা ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। কেল্লায় আর একটি প্রাণীও থাকবে না। তাঁরা সবাই গোয়ালাদের সঙ্গে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে শিবিরে বসবাস করবেন। যে নগরীতে প্রজার স্থান নেই, সেখানে শাহের স্থান হতে পারে না।

বাদশাহের আদেশ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে, প্রথমে কেল্লার প্রতিটি প্রকোষ্ঠে—শেষে সমস্ত নগরীতে।

স্থানীয় ফিরিঙ্গি অধিকর্তা রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। ছুটতে ছুটতে আসে শাহ্ সমীপে। কাতর কণ্ঠে বলে,—এ আদেশ তুলে নিন।

বিদ্রূপের হাসি হেসে বাহাদুর শাহ্ বলেন,—আদেশ কোথায়? এটা একটা পরিবারগত ব্যাপার। এতে নাক গলাবার অধিকার কারও নেই। আমি আমার পরিবারবর্গকে নিয়ে কোথায় বাস করব সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

ফিরিঙ্গি অধিকর্তা শাহের যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করতে পারে না। তবু সে জানে, এই ঘটনায় সারা দেশ কেঁপে উঠতে পারে। কারণ বাহাদুর শাহ এখনো দেশবাসীর বাদশাহ। দেশবাসীর মনে যে আসনে শাহ প্রতিষ্ঠিত সেই আসন থেকে তাঁকে নামাতে হবে। দরকার হবে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে তাঁর চরিত্র হরণ করা। কিন্তু সেই কাজে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

তাই সে একটু নত হয়ে বলে,—তবু আমার অনুরোধ দিল্লী ছেড়ে যাবেন না।

—একটিমাত্র শর্তেই এই অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারি। গোয়ালারাও আগের মত দিল্লী নগরীতে থাকবে।

—বেশ।

বুলবুল্ পাখিটা আপন মনে সুমিষ্ট গান গেয়ে চলে। বাহাদুর শাহ্ দাঁড়িয়ে পড়েন খাঁচার পাশে। সহস্র চিন্তার মধ্যেও পাখির গান অনেকদিন পরে তাঁকে আকৃষ্ট করে।

বুলবুল্ গান বন্ধ করে।

—থামলি কেন? গেয়ে যা। নাম রেখেছি তোর "বুলবুল্-ই-হাজার-দস্তান।" আমার মত গোমড়া-মুখো হয়ে থাকা তোকে মানায় না। তোরা তো প্রতিদানের আশায় গাইবি না। গান গাওয়া তোদের স্বভাব। আকাশের চাঁদ কি মানুষ দেখলে জ্যোৎস্না বিতরণে ক্ষান্ত হয়? গাছের কুঁড়ি কি ফুল হয়ে উঠতে দ্বিধাবোধ করে?

বুলবুল্-ই-হাজার-দস্তান, বাদশাহের কথায় কিনা বলা যায় না, আবার গাইতে শুরু করে।

—বাঃ, এই তো। তোদের কাজ করে যা। তোরা মানুষ নোস্। মানুষের বড় দুঃখ। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখে। এক দেশ অপর দেশের বুকের রক্ত শুষে খায়। তারা নিজে মানুষ হয়েও অপর মানুষের দুঃখ বোঝে না। বুঝতে গেলে যে স্বার্থসিদ্ধি হয় না। আমায় দেখছিস না, কতখানি স্বার্থপর? আমার যে কিছুই নেই, তবু কত আরামে আছি। তোকে পুষে দু'দণ্ড তোর সঙ্গে কথা বলার বিলাসিতা উপভোগ করছি। এই বিলাসিতা পরিত্যাগ করে সবার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারবো? কখনই নয়। অথচ মুখে আমার কত বড় বড় বুলি। লোকে বলে আমার বক্তৃতা দেবার শক্তি অসাধারণ। যে কোন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে তাদের বিবশ করে রাখতে পারি। তবু দিই না। শুধু পবিত্র ঈদের দিন ছাড়া। কেন দিই না জানিস? লজ্জা করে। কারণ আমি জানি, শত চেষ্টাতেও ভেতরটা আমার সম্পূর্ণ খাঁটি—নয়। নিজের স্বার্থচিন্তা চোরের মত মনের অলিতে-গলিতে বিচরণ করে।

কার করস্পর্শে চমকে পশ্চাতে চেয়ে দেখে বাহাদুর শাহ্। জিন্নৎ বেগম।

—কী পাগলের মত প্রলাপ বকছ?

—কথা বলাই। বুলবুল্-ই-হাজার-দস্তান আমার কথা রেখেছে। আমি বলতে গান গেয়েছে।

—ও, তাই বুঝি ?

—কিন্তু জিন্নৎ, লক্ষ্য করেছ তুমি ? ওর সঙ্গে আমার একটা সাদৃশ্য রয়েছে ?

—কী ?

—দু'জনাই বন্দী। ভাবছি ওকে ছেড়ে দেব। মিলিয়ে যাক নীল আকাশের বুকে।

—ছেড়ে দিলেও ও যাবে না।

—কেন ?

নিজের ওপর নির্ভরতা নেই ওর। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার ইচ্ছা হলে।

বাদশাহ্ খাঁচার দরজা খুলে দেন। পাখিটি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নেয়। চোখে তার ভীতি। সে আবার খাঁচার কোণটিতে সরে যায়।

রাগ হয় বাদশাহের। হাত দিয়ে তিনি পাখিটিকে বার করে তাকে খাঁচার মাথায় বসিয়ে দেন। সে আড়ষ্টভাবে বসে থাকে।

বাদশাহ্ ওর রকম-সকম দেখে হাসিতে ফেটে পড়েন। বলেন,—ঠিক আমার মত। খাঁচাটি ওর লালকেল্লা। আর ওই কোণটি হল মুসম্মান বারজ। যত লম্ফঝম্ফ ওইখানেই। তাই না জিন্নৎ ? ঠিক বলি নি !

আহত কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে জিন্নৎ বলে,—তুমি তা নও।

—হুবহু তাই। তুমি আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ জিন্নৎ! তুমি আমার ভুয়ো পুরুষাত্মাভিমানকে আস্কারা দিচ্ছ।

জিন্নৎ জবাব দিতে পারে না। বাদশাহের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা তাকে বিরত করে। দিনের পর দিন সে সবই লক্ষ্য করছে। ফিরিঙ্গিরা যেন দিনের পর দিন বাদশাহের অঙ্গের ভূষণগুলি একের পর এক খুলে নিয়েছে। এখন পরিধেয় বস্ত্র মাত্র সার।

—আচ্ছা জিন্নৎ, এই যে মাঝে মাঝে সংবাদ আসে হিন্দুস্থানের নানা প্রান্ত থেকে, ছোটখাটো যুদ্ধে ফিরিঙ্গিরা হেরে গিয়েছে, শুনতে তোমার ভাল লাগে ?

—তোমার ?

বাদশাহের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—খুব ভাল। উত্তেজনা অনুভব করি। ওইগুলোই তো আশার বিদ্যুৎ-চমক।

—তোমার আনন্দই আমার আনন্দ।

—তবু তোমার নিজস্ব বলতে তো কিছু রয়েছে।

—হ্যাঁ, দু'চারটে সখ। এই বংশের আগেকার বেগমদের মত শুধু সখ।

—ওগুলো না থাকাই ভাল।

—সবাই কি তোমার মত? হাকিম আসানুল্লা বলেন, তুমি হলে এ যুগের ইব্রাহিম আদম। তোমার মধ্যে দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য মিলে মিশে একাকার।

—হাকিম বড বেশি বাডাবাড়ি করেছে।

—না। তুমি তা-ই।

—এইভাবে অনর্থক একটি মানুষকে উঁচুতে বসিয়ে তার মধ্যে মিথ্যে গবের সৃষ্টি করা মানুষের একটা বিশ্রী স্বভাব।

—যাক গে, আমার কুটিরে কবে যাবে?

—যেতে হবে বৈকি একদিন। অত সুন্দর মহল তৈরি করলে লাল-কোন-সডকে। না গেলে চলবে কেন?

—আমার কিন্তু মনে মনে একটা দুঃখ রয়েছে।

—কী সেই দুঃখ বল।

—লাল-কোন-সড়কের প্রাসাদ যতই সুন্দর হোক, আমার একটা ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল।

—বল।

—বাদশাহ্। তুমি শুধু কবি নও, তুমি বার যোদ্ধা, তুমি নিপুণ শিকারা, তুমি অসাধারণ বাগ্মা, অশ্ব চালনায় তোমার পারদর্শিতার তুলনা হয় না। তুমি অশ্বের জাতি চিনতে পার এবং তাদেব বন্য স্বভাবকে যেভাবে বশে এনে শিক্ষিত করে তোল, জগতে তাব জুডি আছে কিনা সন্দেহ। তুমি প্রাণীদের কথা বুঝতে পার কিনা জানি না, কিন্তু অসংখ্য বাব প্রমাণ পেয়েছি কী অশ্ব, কী পক্ষী, কী হস্তী—সবাই যেন তোমায় বিশেষভাবে চেনে। তুমি ধার্মিক। পৃথিবীতে তোমার জন্ম খুবই দুঃসময়ে। নইলে সব দিক বিচার করলে ব্যক্তিগতভাবে মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তুমিই—

—জিন্নৎ। চুপ্, চুপ্। উন্মাদ বলবে লোকে। বাদশাহ্ জিন্নতের মুখ দু'হাতে চেপে ধরেন।

ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নেয় জিন্নৎ। একটু দূরে সবে গিয়ে বলে,—এটা আমার দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত মতামত। মুখে চাপা দিয়ে মনকে চাপা দিতে পারেন না শাহ্। শাহ্‌জাহান্ তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কতটুকু জ্ঞান ছিল বাদশাহ্? তুমি নিজে স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদ।

—কে বলল।

—আমি জানি। একাধারে এতগুলো গুণের সমাবেশ পৃথিবীতে আর কত-জনের ভেতরে সম্ভব হয়েছে শাহ্?

—কে বলেছে স্থাপত্যশিল্প আমার আয়ত্তে?

—হীরা-মহল তোমারই সৃষ্টি ভুলে যাও কেন?

—হয় তো হঠাৎ সেটা ভাল হয়ে গিয়েছে।

—এ তোমার বিনয় বাদশাহ্।

—না, এই আমার বিশ্বাস। তা'ছাড়া এগুলোকে আমি বিলাসিতা বলে মনে করি। হিন্দুস্থানের প্রতি আমি আমার কর্তব্য করতে পারি না। অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকলে পাছে চিন্তার ভিড় আমায় পাগল করে দেয়, তাই ডুবে থাকি অনেক কিছুর মধ্যে। আমার গাছপালার সখও তেমনি একটি।

—তোমার অকর্মণ্যতা তবু যা হোক, তোমার ভেতরের এক অতি উচ্চ মনের শিল্পীকে প্রকাশ করে দিয়েছে—যে শিল্পীর প্রতিভা বহুমুখী।

—না জিন্নৎ। এর জন্যে আমি লজ্জিত। যমুনার ওপারে ওই যে গ্রামের আভাস পাওয়া যায়, ওই রকম কোটি কোটি গ্রাম নিয়ে এই হিন্দুস্থান। ওই সব গ্রামের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে যে কোন একজনকে ডেকে প্রশ্ন কর, আমার দিওয়ান, আমার স্থাপত্য, আমার চিত্র, আমার সবকিছু—যাকে একটু আগে তুমি বিরল প্রতিভা বলে বর্ণনা করছিলে, ওদের কোন কাজে এসেছে কিনা? এসব থেকে ওরা বিন্দুমাত্র সহায়তা পেয়েছে কিনা? ওদের নিপীড়িত জীবনে আমার গুণাবলী ক্ষণেকের তরেও ওদের মুক্তি দিতে পেরেছে কিনা? জিজ্ঞাসা কর? দেখবে, একসঙ্গে কাজীর বিচারের মত তারা শুধু একটি মাত্র ছোট ভাবলেশহীন কঠোর ভাষায় রায় দেবে,—"না"।

—তবু এইসব কীর্তিই বেঁচে থাকে।

—হ্যাঁ, স্বার্থপর মুষ্টিমেয় একদল মানুষের চেষ্টায় এরা বেঁচে থাকে। সাধারণ মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না তাতে।

—তোমার কি কোন সখই নেই?

—আছে বৈকি? না থেকে পারে না। যদিও সেগুলোও বাদশাহী সখ। আমার সখ শিকার, আমার সখ উদ্ধত অশ্ব আর বন্য হস্তীকে বশে আনা। যদিও বয়স হয়েছে বলে সেইসব সখ মেটাতে পারি না আর।

—তোমার হামদাম্ নামে অশ্বটি কেমন আছে?

—খুব ভাল। তেজী হয়ে উঠেছে এই বয়সেই।

—মৌলাবক্স্ হস্তীটি!

—সে তো আমাকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

—কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

—হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পার। যদি কখনো তেমন দিন আসে প্রমাণও পাবে।

জিন্নৎ বুল্বুলের খাঁচার দিকে চেয়ে বলে,—ওই দেখ। বুল্বুল্-ই-হাজার-দস্তান্ অতি কষ্টে খাঁচার ভেতরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বাদশাহ্ বললেন,—ঠিক যেন আমারই প্রতীক।

জিন্নৎ বেগম হেসে ওঠে।

—তুমি হাসছ?

—হাসি পেল। তুমি কবে যাবে আমার কুটিরে বললে না তো?

—দু'চার দিনের মধ্যে।

—তখন একটি অনুরোধ করব।

—না, সেখানে কোন অনুরোধ করো না আমায়। যদি কিছু করবার থাকে এখানে করো।

—কিন্তু মন যে এখন তোমার ভাল নয়।

—কবে ভাল ছিল? তোমার কাছে তো কিছুই লুকানো নেই। বল, কি তোমার অনুরোধ, আমি রাখব।

—রাখবে? বেশ। আমার ইচ্ছে ছিল লাল-কোনের মহলটি তোমার স্থাপত্য-বিদ্যার স্বাক্ষর হয়ে থাক। কিন্তু তা যখন হল না, তখন হায়াৎ বক্স্ বাগে একটি লালপাথরের মহল তৈরি করবে। তোমার নির্দেশে গড়ে উঠবে সেটি। তার নাম রাখব আমি, "জাফর-মহল।"

বাহাদুর শাহ্ মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেও কিছু বলতে পারেন না।

দুর্নাম ছড়াতে শুরু করল ফিরিঙ্গিরা। সেই সঙ্গে বিদ্রূপের কশাঘাতও। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে বংশ সারা হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মনে সমীহ-সম্মানের আসনে রয়েছে, বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থে ধীরে ধীরে সেই আসনে আঘাত করে ভাঙতে চেষ্টা করেছে বহুদিন পূর্ব থেকেই—বলা যেতে পারে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে। কিন্তু এবারে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটি সন্দেহের ছায়া তাদের মনের মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে। দিল্লীর বাদশাহ্কে প্রকারান্তরে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতরে আবদ্ধ রেখেও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না এতটুকু। হামেশা

একটা অমঙ্গলের হাতছানি দেখতে পেয়ে শিউরে উঠছে—যার কেন্দ্রবিন্দু এই লালকেল্লা। তাই দিল্লীর শাহের সবটুকু প্রভাব তারা একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

বাদশাহ্ কতভাবেই তো লালকেল্লা থেকে পথে বার হন—পায়ে হেঁটে, অশ্বে, হস্তীতে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে মাঝে মাঝে যখন তিনি নগরী পরিভ্রমণে বার হন, তখন তাঁর শকট ষোলটি অশ্ববাহিত। সেই শকট দূর থেকে দেখে পথচারীরা রাস্তার দু'ধারে সরে যায়—সম্ভ্রমে অভিবাদন জানায় শাহ্কে। তেমনি জিন্নৎ-মহলেও শকট রয়েছে। শাহের প্রধানা বেগম বলে তার শকট আটটি অশ্বচালিত। তবে তার নগর পরিদর্শনের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তার শকটের পশ্চাতে পশ্চাতে ডংকা বাজাতে বাজাতে চলে বাদ্যকরের দল। বহু দূর থেকে নগরবাসীরা বুঝতে পারে জিন্নৎ বেগম বার হয়েছেন। তারা ছুটে এসে রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে দাঁড়ায়। ফিরিঙ্গিরা এই জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারল না। ওদিকে কলকাতা থেকে বড়কর্তা ডালহৌসী বার বার হুমকি দিতে লাগল স্থানীয় ফিরিঙ্গিদের। সুতরাং বলতে গেলে ডালহৌসীর প্ররোচনায় জিন্নৎ বেগমের নাম রাখা হল "ডংকা-বেগম।" কিন্তু যা আশা করেছিল বিদেশীরা, সেই ফল ফলল না। ওদের পদলেহী দু'চার জন ছাড়া সে নামে কেউ ডাকল না জিন্নৎ বেগমকে।

ইতিমধ্যে অপর একটি সুযোগ মিলল ফিরিঙ্গিদের। দিল্লীর উপকণ্ঠে বাদশাহের একটি সুন্দর উদ্যান রয়েছে। তাঁর মৃত-ভ্রাতা মীর্জা সালিমের পত্নী হুসেনী বেগম সহসা একদিন সেই উদ্যানটির স্বত্ব দাবি করে আদালতে অভিযোগ করল। বলা বাহুল্য, আদালতের রায় গেল বাদশাহের বিরুদ্ধে। বাহাদুর শাহ্ পরামর্শদাতাদের বারংবার অনুরোধে এবারে আবেদন করলেন আগ্রার ফিরিঙ্গি বিচারকের নিকট উদ্যানটির ওপর তাঁর দাবির কথা উল্লেখ করে। ফল একই ঘটল। পরামর্শ-দাতাদের মুখ চুন হল। কারণ বাদশাহের কোন কালেই ওদের আদালতের স্মরণাপন্ন হবার বাসনা ছিল না বা নেই।

বাহাদুর শাহের লেখনীমুখ থেকে সে-রাতে নিঃসৃত হল নিম্নোক্ত শ্যার :

কিস্সায়ে গাম সে মেরে খুশ্ ইয়ে হুয়া উয়ে বে রহম্।
ফির কহানি না কোই উস্নে জাফর আউর শুনি।

হয় তো মনের অপরিসীম জ্বালায় শান্তিবারি সিঞ্চনের মত আরও অনেক কিছুই তাঁর লেখনী হতে নির্গত হত, যদি না নবাব জিন্নৎ মহল বেগম সেই মুহূর্তে সেখানে প্রবেশ করত।

—জিন্নৎ ?

—হ্যাঁ।

—জান জিন্নৎ, এদের এই দুর্ব্যবহার হয়তো হিন্দুস্থানেরই মঙ্গলের জন্য। এরা যদি অহরহ আমাকে অসম্মান না করত, প্রতিনিয়ত যদি আমার বাদশাহীর ওপর কর্দম নিক্ষেপ না করত, তা'হলে হয় তো বহুদিন আগেই আমার ভেতরের প্রজ্জ্বলিত বহ্নি নিভে যেত। নিভতে দিল না এরা। এ বৃদ্ধ বয়সেও শীতল হতে দিল না। শুনি না কি ওরা খুব চতুর। কিন্তু আমার বেলায় ওরা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

—তুমি শোবে চল।

—হ্যাঁ, শোবো তো বটেই। আরও কত শান্তিতে শুতে পারতাম, যদি ওরা আমাকে মৌখিক সম্মান দেখাত, অহরহ আর্থিক অনটনের সৃষ্টি না করত। কিন্তু জিন্নৎ, সেটা হতো কবরের শান্তি। আমি চাই নি—একমুহূর্তের জন্যেও তেমন শান্তি চাই নি। উল্কার মত ব্যর্থতার আগুনে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব তাও ভাল।

জিন্নৎ বাদশাহের পাশে বসে তার বলিষ্ঠ হাত দু'খানি নিয়ে খেলা করে। কতদিন থেকে এইভাবে খেলা করেছে সে জাফরের হাত নিয়ে। কৈশোর শেষ হতেই। তেমনি বলিষ্ঠ আজও।

—স্বার্থ বড় সাংঘাতিক জিনিস জিন্নৎ। ওরা আমার স্বার্থ রক্ষা করে চললে, আমি হয়ে পড়তাম স্বার্থপর। দেশের কথা যেতাম ভুলে। ওদেরই সুবিধে হত।

—তুমি তা করতে না।

—বলা যায় না। মানুষের দুর্বলতা কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউ বলতে পারে না।

—তোমার অমন দুর্বলতা নেই। তোমার হৃদয়ে সেই দুর্বলতা প্রবেশে সাহসী হবে না।

—যাই হোক। আমার স্বার্থ নিয়ে ওরা অহরহ টানাটানি করছে ব'লেই ওদের ওপর আজ আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। এই ঘৃণা হীরা-জহরতের চেয়েও মূল্যবান। কারণ এই ঘৃণা যতদিন না জন্মায় মানুষ ততদিন বজ্রকঠিন হতে পারে না। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ভেলোরে একটা বিদ্রোহ ঘটেছিল সেনানীদের মধ্যে। সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ নেতৃত্ব দেবার কাউকে সেদিন পায় নি বিদ্রোহীরা। তেমন সুযোগ যদি আজ আসতো, আর আমায় যদি নেতৃত্ব করবার উপযুক্ত ভাবত বিদ্রোহীরা, আমি কখনই আপত্তি করতাম না।

—নেতৃত্ব কেউ দেয় না শাহ্। নেতৃত্ব নিজে থেকে নেবার জন্যে এগিয়ে

যতে হয়।

—কথাটা হয়তো অসত্য নয়, তবে পুরোপুরি সত্যও নয়। তুমি তোমার ারণাটা অতীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছ। এগিয়ে গেলেই নেতৃত্ব পাওয়া ায় না জিন্নৎ। নেতার যোগ্যতার বিচারক সে নিজে নয়—দেশের মানুষ।

যে হাত দু'খানি নিয়ে এতক্ষণ খেলা করছিল জিন্নৎ, এবারে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে সই দু'টিকে আকর্ষণ করে। বাদশাহ্ উঠে দাঁড়ান।

—আমার মহলে শুধু একদিনই গেলে।

—তোমার লাল-কোন-মহলে?

—হ্যাঁ, বলেছিলে কিছুদিন থাকবে সেখানে।

বাহাদুর শাহ্ হেসে বলেন,—বেশ তো, যাব। ভাল কথা, আমি হায়াৎ বক্স্ াগে লালপাথরের মহল তৈয়ারির ব্যবস্থা করেছি।

—সত্যি? নাম রাখতে হবে কিন্তু জাফর-মহল।

—বুঝলে জিন্নৎ, শত হলেও বাদশাহী রক্ত আমার ধমনীতে। সস্তায় কিস্তিমাৎ ণবার প্রলোভন দুর্নিবার আমার মধ্যে। তাই তোমার ফাঁদে ধরা পড়লাম। াইলে জাফর-মহল তৈরি করতে কিছুতেই রাজি হতাম না।

দু'দিন পরে বাদশাহ্ গেলেন লাল-কোন-সড়কে জিন্নৎ বেগমের প্রাসাদে। লালকেল্লায় ফিরিঙ্গিদের একটি কিতাব রক্ষিত ছিল বাহাদুর শাহের গতিবিধির খবরাখবর লিপিবদ্ধ করতে। কিতাবটির নাম "খুলাসা আকবর"। তাতে লেখা হল যে, বাহাদুর শাহ্ চলে গেলেন তাঁর ষোড়শ অশ্ব-চালিত শকটে নবাব জিন্নৎ মহল বেগমের লাল-কোন-সড়কের বাসভবনে। এরপর বারো দিন ধরে তাতে শুধু লেখা হল, বাদশাহ্ লাল-কোন-সড়কে রয়েছেন—কেল্লায় অনুপস্থিত।

এই বারো দিনে জিন্নৎ বেগমের ব্যয় হল বিশসহস্র রৌপ্য মুদ্রা। বাদশাহ্কে সবপ্রকারে সুখী করে তুলতে বেগমের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। সে জানে, নিরন্তর বাদশাহের অন্তরে কি ঝড় বয়ে চলেছে। কয়েকটা দিন অন্তত যদি তাঁকে নিশ্চিন্ত করা যায়—ভুলিয়ে রাখা যায়।

কিন্তু বাদশাহ্ ভুলতে পারলেন না। বেগমের এই অপব্যয়ে তিনি মনে ব্যথা পেলেন, অথচ মুখে কিছু বলতে পারলেন না জিন্নৎ-এর মুখ চেয়ে।

তবে তিনি মুখ না খুললেও, মুখ খুলল দিল্লী নগরীর কিছু মানুষ ফিরিঙ্গিদের প্ররোচনায়। তারা রটনা করল, দৈনিক দেড় হাজার রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করতে পারলে বাহাদুর শাহ্কে যে কেউ তার বাসভবনে দিনের পর দিন রাখতে পারে।

সুতরাং তাঁর শাহত্ব আর বজায় নেই। আর পাঁচজনের মত তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র।

জিন্নৎ-এর কানে এল এই রটনা। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তারই জন্যে বাদশাহের এই দুর্নাম। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে, এভাবে লাল-কোন-সড়কে আসার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না শাহের। তাঁকে একরকম জোর করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

দুর্নাম বাদশাহেরও কর্ণগোচর হল। তিনি বুঝলেন, এই শেষ নয়। বরং বলা যেতে পারে সূত্রপাত। কোথাও না গিয়ে লালকেল্লার শীর্ষে বসে দিনরাত খুদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করেন যদি তিনি, তবু দুর্নাম রটবে। খুদাতাল্লারই অভিপ্রায় এটি, মানুষেরা কী করবে? এই অভিপ্রায়ের মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে কিনা তিনি জানেন না। জানতে পারলে লেখনীমুখ হতে কান্না ঝরত না —অগ্নি বর্ষণ হত।

এমনভাবে যখন বাদশাহের চরিত্রের ওপর কলঙ্ক লেপনের অন্ত ছিল না। ঠিক সেই সময়ে একদিন সকালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হাকিম আসানুল্লা বাদশাহের কাছে এসে ধীর অথচ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে,—একটি দুঃসংবাদ দিতে এসেছি।

—কী এমন দুঃসংবাদ থাকতে পারে?

—এটি ব্যক্তিগত।

—আমি প্রস্তুত।

—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বক্স্ মৃত।

বাহাদুর শাহ্ উঠে দাঁড়ান। প্রচণ্ড আঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড দুলে উঠে নয়নদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হতে চায়। তবু শক্ত হয়ে দাঁড়ান তিনি। ধীরে ধীরে হাকিমের দিকে এগিয়ে এসে বলেন,—ওর যে এত খারাপ অবস্থা আমায় তো বলেন নি।

—হয় তো আমার ভুল হয়েছিল রোগ নির্ণয়ে। কিংবা—

—কিংবা—

—বোধহয় বাঁচবার ইচ্ছা ছিল না শাহাজাদার।

—কেন?

—ঠিক জানি না। তবে শাহাজাদার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সব কিছুতেই একটা নিস্পৃহ ভাব। নিজেকে ভবিষ্যৎ বাদশাহ্ জেনেও কোন উৎসাহ ছিল না। একটা কথা শুধু মাঝে মাঝে বলতেন,—ফিরিঙ্গিরা আমাদের বাঁচতে দেবে না। ওরা আমাদের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে।

বিষে মারতে চায়। আমি জানি, বাহাদুর শাহ্ই হলেন শেষ বাদশাহ্। যারা আমাকে ভবিষ্যৎ শাহ্ বলে ভাবে, তারা মূর্খ।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উক্তি হাকিমের মুখে শুনে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে শাহের। তাঁর পুত্র চিন্তাশীল ছিল। তাই সবাই যখন সামান্য ব্যাপার নিয়ে উৎসাহে মেতে উঠত, সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করত। জগতে যেন তার কিছুই করবার নেই। আল্লার ডাক শুনেছে সে।

গোলাপী রুমাল বিতরণ একেবারে বন্ধ করতে না পারলেও অনেকটা কমিয়ে আনল ফিরিঙ্গিরা। কিন্তু একটি জিনিস তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। তারা লক্ষ্য করল না সিপাহীদের মধ্যে ফকির আর সাধু সন্ন্যাসীদের যাতায়াত অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফকির আর সাধু-সন্ন্যাসীর দেশই তো এই হিন্দুস্থান। তা যদি না হত, তবে কি আর ব্যবসায়ীর রূপ ধরে এসে জেঁকে বসে রাজত্ব করবার সুযোগ হত? সুতরাং ওদের বিশ্বাস নিয়ে ওদের থাকতে দাও। উদ্ভট সব ভবিষ্যৎ-বাণী করে এই সাধু ফকিররা। করতে দাও। সিপাহীরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মশগুল থাকুক।

বাহাদুর শাহ্ লক্ষ্য করলেন, লালকেল্লায় ফিরিঙ্গিদের ঘাঁটি দিন দিন শক্ত হয়ে উঠলেও প্রকৃত জায়গা সম্বন্ধে ওরা অন্ধ। ওদের বিশ্বাস বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোজিত হলে এই কেল্লা থেকেই হবে। সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকুক ওরা। জানে না, দিকে দিকে বারুদের অসংখ্য স্তূপ প্রজ্জলিত হলে ওরা দগ্ধ হয়ে মারা পড়বে।

একান্ত সচিব মুকুন্দলালকে ডেকে পাঠিয়ে বাহাদুর শাহ্ বললেন,—সারা দেশের সিপাহী সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ আমাদের জানানো হয়েছে, এনে দেখাও।

মুকুন্দলাল অতি সত্বর সেগুলো এনে উপস্থিত করে শাহের সামনে।

একটির পর একটি উল্টে যান শাহ্। মুখে তাঁর হাসি ফুটে ওঠে। বলেন,—হাকিম আসানুল্লাকে একটু খবর পাঠাতে হবে মুকুন্দলাল। মুন্সী জীবনলালও যেন আসে সঙ্গে।

তারা এলে বাদশাহ্ আসানুল্লাকে বলেন,—হাকিম সাহেব, পিতার সময় থেকে দাওয়াই দিয়ে রোগ বিতাড়িত করতে করতে আপনি অবসন্ন, বলেছিলেন না সেদিন?

—হ্যাঁ, বাদশাহ্।

—এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলে নিষ্কৃতি

পাবেন।

—আপনি বরাবরই মানুষের মনের ভেতরে সহজে প্রবেশ করতে পারেন।

—বেশ, কিছুদিন আমীরী করুন। আশা করি যোগ্যতা দেখাতে পারবেন।

আসানুল্লা স্পষ্টতই পুলকিত হয়ে ওঠে। কারণ শাহের অতীত গৌরবে কিছুই অবশিষ্ট নেই যদিও, তবু যা রয়েছে, তার এক্তিয়ারও বড় কম নয়।

—হাকিম সাহেব, এই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার। আমি একটি প্রশ্ন করছি। বর্তমান দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

আসানুল্লা একটু ভেবে নিয়ে বলে,—অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে দিয়ে চলেছে দেশ তবে এ ব্যাপারে আপনি নিরুপায়। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ছাড়া আপনার পথ নেই। কারণ বিদেশীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে আপনার মঙ্গল হবে না। অন্তত আমার পরামর্শ চাইলে আপনাকে বলব, একটা ভালমত সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন ওদের সঙ্গে। কারণ আমি আপনার হিতৈষী।

—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু কথাটা কি জানেন, হিতৈষীরা সব সময় হিত করতে পারে না। কারণ তাদের হিত করবার পদ্ধতি তাদেরই বুদ্ধি অনুযায়ী। আপনার প্রথম মতামতে আমি নিরাশ হলাম। তবে নিরুৎসাহ করব না আপনাকে। শুধু একটা কথা বলি। আপনি আমার মনোভাব জানেন আমার সেই মনোভাবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কী কী পরিকল্পনা আপনার বুদ্ধিতে আসে জানাবেন।

হাকিম আসানুল্লার মুখখানা বিষণ্ণ দেখায়। সে বলে,—মাফ্ করবেন বাদশাহ্। আপনার নির্দেশ মনে থাকবে।

বাহাদুর শাহ্ মৃদু হাসেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে আসে তিনি জীবনলালকে বলেন,—আমি যা বলছি লেখ।

জীবনলাল প্রস্তুত হয়ে বাদশাহের দিকে চায়।

বাদশাহ্ বললেন,—পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হতে আর সামান্য বাকি শতবর্ষ পূর্ণ হতে না হতেই ফিরিঙ্গিরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হবে। হিন্দুস্থান আবার আমাদের হবে। আবার আমরা একটি সুখী পরিবারে পরিণত হব।

মুকুন্দলাল চঞ্চল হয়ে উঠে বলে,—সত্যি জনাব?

—তুমি অবিশ্বাস কর?

—আপনার মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ-বাণী কেউ অবিশ্বাস করবে না।

—শোন মুকুন্দলাল, এটি আমার ভবিষ্যৎ-বাণী নয়। তবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমাকে এবং আমাদের দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে। নইলে অনিশ্চয়তার

অন্ধকারেই চিরকাল মাথা কুটতে হবে। এদেশের হিন্দু-মুসলমান আমাকে বিশ্বাস করে। হিন্দুদের মন্দিরে তিলক পরে উপস্থিত হলে পুরোহিত বলে,—ইনি ব্রাহ্মণ। ইনি যদি ব্রাহ্মণ না হন, তবে কে ব্রাহ্মণ? কতখানি গভীর ভালবাসা বল তো তোমরা!

হাকিম আসানুল্লা বলে,—এ বিষয়ে আপনি একটা শ্যার লিখেছিলেন মনে পড়ে।

বাহাদুর শাহ্ হেসে আবৃত্তি করেন:

বাতখানো মে যব্ গয়া ম্যায় খেঁচকর কুয়াসকা জাফর
বোল উথা উয়ো বাত্ ব্রাহ্মণ ইয়ে নাহি তো কৌন হ্যায়।

জীবনলাল মাথা নাড়িয়ে বলে,—ঠিক কথা। সবাই একথা বলবে।

বাহাদুর শাহ্ বলেন,—ফিরিঙ্গিরা বলবে না। শুনুন হাকিম সাহেব, ভবিষ্যৎ-বাণী আমি করছি না। কিন্তু এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে হবে সিপাহীদের মধ্যে, যারা বাধ্য হয়ে ফিরিঙ্গি ফৌজে কাজ করে—ছড়িয়ে দিতে হবে দেশব্যাপী।

—কী ভাবে?

—যেভাবে ওরা গোলাপী রুমাল পায়।

হাকিম আসানুল্লা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে,—বুঝেছি বাদশাহ্।

মুঘল বংশকে হাকিম ভালবাসে। তাই বাদশাহ্কে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত-ভাবে বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে এগিয়ে যেতে দেখে মনে মনে শংকিত হয়। দিল্লীতে মুঘল থাকবে না, একথা সে চিন্তা করতে পারে না। শক্তিহীন হলেও মুঘল তো! তবু সে-কথা বলতে পারে না। সে নবনিযুক্ত পরামর্শ-দাতা মাত্র, কোন কিছুর নিয়ামক নয়। নিয়ামক স্বয়ং বাহাদুর শাহ্।

—মুকুন্দলাল!

—শাহ্।

—আমাদের সেই পুরোনো চাপাটি-বিতরণের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

—হাঁ জাঁহাপনা।

—মনে হয় সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। পলাশীর যুদ্ধের একশত বর্ষ পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই।

সবাই বাদশাহ্কে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে। এত চাঞ্চল্য, স্থির-ধীর এবং গম্ভীর প্রকৃতির বাদশাহের মধ্যে কেউ কখনো লক্ষ্য করে নি। কী যেন করা হল না। ষাট বছর বয়সে শাহ্ হয়ে ভেবেছিলেন, এখনো সময় রয়েছে। সত্যাই সময় ছিল। কারণ সেই বয়সেও যুবকের মত তাঁর দৈহিক কর্মক্ষমতা।

কিন্তু তারপর আরও বিশ বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। বাদশাহ্ শাহ্ আলমকে যে ব্রত উদ্‌যাপনের কথা দিয়েছিলেন, সে ব্রত বুঝি এ-জীবনে আর উদ্‌যাপিত হল না। উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই দিন বয়ে গেল। তাই শাহ্ চঞ্চল।

—মুকুন্দলাল!

—শাহ্।

—মৌলাবক্স্ হস্তীটিকে সজ্জিত রাখা হয় যেন আজ অপরাহ্নে।

—আপনি কেল্লার বাইরে যাবেন? হাকিম আসানুল্লা প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ। অস্বাভাবিক কাজ করছি নাকি?

—না।

বাহাদুর শাহ্ একবার হাকিম সাহেবের মুখের দিকে চকিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। তিনি বুঝতে পারেন, হঠাৎ একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে হাকিম সাহেব স্নায়ুর চাপে ভুগছেন। কয়েকদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

হায়াৎ বক্স্ বাগে একটি সুন্দর লাল প্রাসাদ গড়ে ওঠে বাদশাহের স্থাপত্য-প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ। জিন্নৎ বেগমের বাসনা অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়েছে জাফর-মহল।

একদিন মুসম্মান বারজ্-এর কক্ষে দাঁড়িয়ে জাফর-মহলের দিকে চেয়ে এই পরিণত বয়সেও বাদশাহের গলদেশ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করে জিন্নৎ বলে,—কী সুন্দর।

—এই শেষ। সেকালের বাদশাহী অহমিকার এইখানেই ছেদ টানলাম জিন্নৎ, বড় বেশি ব্যয় হয়েছে। তুমি তো জান, ওরা কত কম অর্থ দেয় আমাকে। উপহার দেবার রেওয়াজ বন্ধ এখন। অথচ তেমন দিন আসতে বেশি দেরি নেই, যখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। জানি না, সে অর্থ কী ভাবে সংগ্রহ করা হবে।

—খুদাতাল্লাই যুগিয়ে দেবেন।

—হ্যাঁ, তিনি চিরকালই যুগিয়ে থাকেন। কিন্তু তার পেছনে মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নিশ্চেষ্ট মানুষ আল্লার প্রিয় হতে পারে না।

বাইরে পদশব্দ। কোন সংবাদ জানাতে চায় কেউ। বাদশাহ্ বাইরে এলেই একজন প্রহরী 'মিজ্‌দা' করে বলে,—হাকিম সাহেব আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—অপেক্ষা করতে বল, যাচ্ছি।

বাহাদুর শাহ্ ভেতরে এসে জিন্নৎকে বলেন,—যে কথা বলছিলাম। টাকার

খুবই প্রয়োজন হতে পারে। তেমন দিন যদি আসে তোমার সমস্ত অলঙ্কার, হীরে-চুনি-পান্না চেয়ে বসলে তুমি আমাকে দেবে জিন্নৎ?

জিন্নৎ বেগম একটু চিন্তিত হয়। তারপর বলে,—প্রথম দিনের কথা চিন্তা করুন বাদশাহ্।

—প্রথম দিন? সেই সমাধির প্রান্তে?

—না। তারও আগে। এতদিনে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কথা আমি কী করে ভুলব? আপনার মায়ের শয়ন-কক্ষের বাইরে।

—আমিও ভুলি নি।

—সেদিন আমি শুধু আপনাকেই কামনা করেছিলাম। আর কিছু নয়। মুঘল ঐশ্বর্যের চমক রয়েছে বাইরে থেকে। কারণ এযুগের মানুষ আগেকার মুঘল ঐশ্বর্য দেখে নি। তবু সেদিন আমি একজন কবি-প্রাণ শাহাজাদাকে আকুলভাবে চেয়েছিলাম।

—তোমার মনোভাব বুঝলাম জিন্নৎ। তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে।

—না। এখনো সব কথা বলা হয় নি। ভুলে যাবেন না বাদশাহ্, আমি নারী। বয়স নির্বিশেষে অলঙ্কার আর সাজসজ্জার ওপর আমাদের জন্মগত লোভ। তার ওপর আমি মুঘলবংশের বেগম। যদি মনে করে থাকেন আমি মনের মধ্যে কোন দ্বিধা না রেখে সব দিয়ে দেব, তা'হলে ভুল বুঝবেন। কিন্তু সে দ্বিধা আমি কাটিয়ে উঠব বলেই বিশ্বাস।

বাহাদুর শাহ্ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্রিয়তমা বেগমের দিকে চেয়ে থাকেন। সপ্রশংস স্মিতহাস্য তাঁর মুখমণ্ডলে। জিন্নৎ-এর মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত রেখে তিনি বলেন,—তুমি উচ্ছ্বাসের বশে কিছু বলে ফেলো নি। আমি সত্যিই খুব খুশি। অলঙ্কারের প্রতি তোমাদের লোভের কথা বলছ। বিলাসিতার দিকে আমারও কি কম ঝোঁক? পুত্রদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারব না, এত ব্যয় সংকোচের মধ্যেও তারা কিভাবে চলে? নিজে আমি সাধারণ ভাবে চলি বলে, ওদের অপব্যয় দেখে রাগ হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। ওরা বড় দুঃখী।

বাদশাহ্ কক্ষ পরিত্যাগ করে বাইরে আসেন। অনেক প্রকোষ্ঠ পার হয়ে তিনি একটি স্থানে এসে দাঁড়ান। হাকিম আসানুল্লা অপেক্ষা করছিল সেখানে। বাদশাহ্কে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদন করে।

—বলুন হাকিম সাহেব।

—এক ব্যক্তি আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—কোথা থেকে এসেছেন?

—কিছুই বলতে চাইলেন না। শুধু বললেন, সব কথা আপনাকে জানাবেন।

—সে কি। আপনি আপনার পরিচয় দেন নি ?

—হাঁ, দিয়েছিলাম। তবু সবিনয়ে জানালেন, মুখ তাঁর বন্ধ। তবে নাম জানিয়েছেন। আজিমুল্লা।

—আজিমুল্লা—আজিমুল্লা। নামটা খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না ?

—এ নামের মানুষ দিল্লী নগরীতেও বহু রয়েছেন।

জানি। তবু বিশেষ যেন এক অর্থ বহন করছে এ নাম। স্মরণে আসছে না এই মুহূর্তে।

—তাঁকে কি আপনার কাছে নিয়ে আসব ?

—নিশ্চয়ই। এক্ষুনি আনুন।

—আমি থাকলে চলবে না। তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথা বলতে চান।

—বেশ তো। আপনি বাইরে অপেক্ষা করবেন।

হাকিম আসানুল্লা কিছুক্ষণ পরে আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে আসেন। বেশবাসের বিশেষ পরিপাট্য নেই ব্যক্তিটির। সমস্ত অবয়বে অতিরিক্ত পরিশ্রমের স্বাক্ষর। মনে হয়, এর কাছে দিনরাতের সীমারেখা বলে কিছু নেই, রৌদ্র-ঝড়-ঝঞ্ঝা এর নিত্যসঙ্গী।

আজিমুল্লা অত্যন্ত মার্জিতভাবে বাদশাহ্‌কে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী সুষ্ঠু ভঙ্গীতে অভিনন্দন জানায়। তার অতি উচ্চ মানের কেতায় বিস্ময় জাগে বাহাদুর শাহের মনে। পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে লেশমাত্র সঙ্গতি নেই মানুষটির ব্যবহারে। আগন্তুক পারস্য, বোগদাদ অথবা তুরস্কের দরবারের সঙ্গে যেন বংশপরম্পরায় সংযুক্ত।

—আপনাকে চিনতে পারলাম না।

—আমাকে আপনি আগে দেখেন নি শাহানশাহ্‌। আমার পরিচয় আপনাকে দিতেই আজ এসেছি। তবে এখানে নয়। কেল্লায় প্রবেশের সময় ফিরিঙ্গিরা আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মনে হল, তাদের একজন ছায়ার মত আমার পেছনে পেছনে এসেছে।

—এখানে আসবার সাধ্য এখনো তাদের হয় নি।

—সেই খবর আমি রাখি। আপনি অহর্নিশি যে ভাবে ওদের সঙ্গে যুঝে চলেছেন সাধারণের তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, প্রতিটি দেশপ্রেমিক তার খোঁজ রাখে।

বাহাদুর শাহ্‌ চমকিত হন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি কি ফিরিঙ্গিদের অনুচর ? মনোভাব জেনে নিতে চায় কৌশলে ? কিংবা সত্যিই এমন কেউ যে

তাঁরই ব্রত অন্তরে গ্রহণ করে জীবনপণ করে রেখেছে। ফিরিঙ্গিদের তিলমাত্র বিশ্বাস করাও মূর্খতা। ওরা এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এক নয়া কৌশল অবলম্বন করেছে কয়েক বছর হল। কখনো হিন্দুদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং মুসলমানদের হেয় করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত। কখনো বা মুসলমানদের প্রশংসার স্বর্ণশিখরে উঠিয়ে দিয়ে হিন্দুদের নামিয়ে দিচ্ছে গভীর পাতালে। দেশের মানুষ এই নয়া কৌশল এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। বুঝতে পারে নি, কী ভয়ঙ্কর এক বিষবৃক্ষের বীজ সযত্নে বপন করে চলেছে এ-দেশের সরল মানুষের মনে। হিন্দুদের মনে মুসলমান-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে ওরা ঘোষণা করল মামুদ গজনী সোমনাথ মন্দির লুঠ করে সেই মন্দিরের প্রবেশদ্বার নিয়ে গিয়েছিল কাবুলে। তাই একটি কল্পিত প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়ে সেটি কাবুল থেকে আনয়ন করা হল। তারপর শোভাযাত্রা সহকারে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হল পুনরায় যথাস্থানে। এইভাবে ক্রমাগত বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তারা হতভাগ্য দেশটিকে রক্তলোলুপ শ্বাপদের মত নিশ্চিন্তে শোষণ করবার জন্য।

—বাদশাহ্।

—চলুন, নির্জনেই যাওয়া যাক।

চলতে চলতে আজিমুল্লা প্রশ্ন করে,—শাহানশাহ্, আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?

—একেবারে সরল বিশ্বাসে কাউকে অভ্যর্থনা করতে পারি না। এখানকার আবহাওয়া তেমন নয়।

আজিমুল্লা নীরব থাকে। কী যেন চিন্তা করে সে পদক্ষেপের সাথে সাথে।

একটি কক্ষে প্রবেশ করেন বাদশাহ্। নিজে উপবেশন করে আজিমুল্লাকে বসতে বলেন।

বাহাদুর শাহ্ একটু চুপ করে থেকে বলেন,—আপনার আচরণে ইসলামী এবং ফিরিঙ্গি কেতার সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। সুতরাং সন্দেহ হওয়াটা কি খুব বিচিত্র আমার পক্ষে?

আপনার পর্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ; সত্যিই ফিরিঙ্গিদের দেশে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল আমার।

বাদশাহের সন্দেহ প্রবলতর হয়। তবে নিরুত্তর থাকেন তিনি।

আজিমুল্লা বলে,—বাংলার রাজা রামমোহন ওদের দেশে একসময় গিয়েছিলেন আপনার পিতার হয়ে লড়তে, ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। আমিও ব্যর্থ হয়েছি! কারণ ওদের দেশের সেরা আদালতে ন্যায়-বিচার বলে কিছু নেই। ওদের ন্যায়-

বিচার ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাকে পাঠিয়েছিলেন নানা সাহেব, তাঁর পাওনা আদায়ের জন্য।

—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। আপনার নাম প্রথম থেকেই আমার খুবই পরিচিত বলে বোধ হচ্ছিল।

—আপনি কি এখনো আমাকে সন্দেহ করেন শাহ্?

সহাস্যে বাহাদুর শাহ্ বলেন, -বিন্দুমাত্রও নয়। আপনি নানা সাহেবের কাছ থেকে এসেছেন। আমি জানি তিনি কী দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছেন একাকী। হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পযন্ত আপনারা দু'জনে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কিসের জন্য তা কি জানি না?

—অজানা থাকবার কথা নয়। কারণ সর্বত্রই কিছু না কিছু গোলাপী রুমালের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। সাধুসন্ত আর ফকিরের আনাগোনাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে ফৌজের মধ্যে।

—এবার আপনার আগমনের উদ্দেশ্য বলুন।

—ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ আমাদের পক্ষে। আর রয়েছেন তাঁতিয়া টোপী—এক অসাধারণ দেশপ্রেমিক।

—কিন্তু অন্যান্য নবাব আর রাজারা?

—তারা ফিরিঙ্গিদের পক্ষপাতী। বিলাতি কায়দার মোহে তারা আবিষ্ট। কিন্তু তার জন্যে পেছিয়ে থাকা কি আমাদের উচিত হবে?

—কখনই নয়। বিশেষতঃ যে জায়গা সম্বন্ধে মনে মনে আমার ভীতি ছিল সেই বাংলার সংবাদ খুবই আশাপ্রদ। কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেখানে। মীরাট কালপী আর গুজরাটের খবরও ভাল। তবে বিহারের সংবাদ বিশেষ পাই নি।

—বিহার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওখানে রয়েছেন পীর আলি। তাঁকে সাহায্য করছেন শাহ্ মহম্মদ হোসেন, মৌলবী আহমদুল্লা, ওয়াজির-উল-হক প্রভৃতি। তা'ছাড়া নানা সাহেবের নিজের লোক রঙ্গ বাপুজী রয়েছেন সেখানে।

—নানা সাহেবের তুলনা নেই।

—কিন্তু আপনি হলেন সব প্রেরণার উৎসস্থল।

—আমি বৃদ্ধ। স্বপ্ন আমিও দেখেছি। কিন্তু সক্রিয় হয়ে উঠতে পারি নি কখনো।

—আপনার স্বপ্নই সমগ্র দেশকে সক্রিয় করে তুলেছে। দেশ জানে, আপনার কাছে এলে তারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যাবে না। আপনি সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

উভয়ের মধ্যে আরও বহুবিধ আলোচনা হয়। শেষে একসময়ে আজিমুল্লা বিদায় গ্রহণ করে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হবে।

সময় এগিয়ে আসছে দ্রুত। এগিয়ে আসছে পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্তির আয়োজন।

বহুদিনের একাকীত্ব আজ আজিমুল্লার আকস্মিক আবির্ভাবে যেন কেটে যায় বাদশাহের। হিন্দুস্থানে তিনি একা নন। আরও অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছে তাঁর সাথী। একই পথের যাত্রী। যে আত্মবিশ্বাস বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল বলে মনে হত, আজ বুঝলেন তা অটুটই রয়েছে। কোথাও তার এতটুকু চিড় খায় নি।

হাকিম আসানুল্লা এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছিল। আগন্তুক বিদায় গ্রহণের পরও শাহ্‌কে বার হতে না দেখে কক্ষে প্রবেশ করে দেখে, গভীর চিন্তায় মগ্ন তিনি।

—তিনি চলে গিয়েছেন বাদশাহ্‌।

—ও, হ্যাঁ। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম হাকিম সাহেব।

—আজ সন্ধ্যায় আপনার মীর্জা গালিব এবং অন্যান্য কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।

—মনে রয়েছে আমার। দেখুন হাকিম সাহেব, আমি লক্ষ্য করেছি শিল্পীদের সভায় আমাদের জহীর থাকে না। অথচ সে একজন চমৎকার কবি। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতও জানে।

—আট বছর যখন ওর বয়স তখন থেকে জহীর লালকেল্লাতে নিযুক্ত হয়েছে। তাই স্বয়ং বাদশাহ্‌ যেখানে উপস্থিত, সেখানে অংশগ্রহণে সে স্বভাবতই সংকুচিত।

—ও যেন নিঃসংকোচে যোগ দেয়। সেখানে কারও কোন পদবা নেই। সবাই শিল্পী।

—আমি জহীর-উদ্দিন হাসানকে আপনার অভিপ্রায়ের কথা জানাব।

—মীর্জা গালিব এসেছেন?

—হ্যাঁ। আরও অনেকেই এসেছেন। তাঁদের বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—মতবাখ্‌-এর পরিচালিকা আহ্‌মদী খানাম্‌কে বলে পাঠাবেন, এঁদের জন্যে যেন ভাল খানার বন্দোবস্ত করা হয়।

—তাকে বলা হয়েছে।

—আচ্ছা, জীবনলালকে আজকাল এত কম দেখা যায় কেন? কেমন যেন অন্যমনস্ক।

—সম্ভবত পারিবারিক দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।

—কী ধরনের দুশ্চিন্তায়?

—আমি ঠিক জানি না। উনি বলতে চান না। এমন ব্যাপারে আমাদের মাথা না গলানোই ভাল হবে।

—কিন্তু, বেচারা যে কষ্ট পাচ্ছে, একথা বুঝছেন না কেন? বলতে পারলে শান্তি পেত।

সেদিন সন্ধ্যায় সম্মেলন, বাদশাহুকে ঘিরে হিন্দুস্থানের অনেক নামকরা শিল্পী। তাঁদের অধিকাংশই বিদ্রোহী কবি—শ্যারের মধ্যে তাঁদের আগুন। তাঁরা হলেন ফজল্ হক্, ইমাম বক্স্ সাব্বাই, মহম্মদ বকীর, মীর্জা রহিম-উদ্দিন হায়া, মসরুফ এবং এঁদের মধ্যমণি মার্জা গালিব।

সংকুচিত জহীরও সেখানে উপস্থিত। বাদশাহের অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হয় নি।

সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় বাহাদুর শাহ্ জহীরের দিকে স্মিত হেসে চাইলেন। তারপর বললেন,—একটি গান শোনাও জহীর।

সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে জহীর স্বরচিত একটি সঙ্গীত সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন করে। বাদশাহের সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রশংসা না করে পারে না।

জহীরের মস্তক অবনত হয়।

সেই নত মস্তকের দিকে চেয়ে বাদশাহ্ একটি শ্যার বলেন :

যো নখল্ পর সমর হ্যায়, উথা শক্তি সার নহিঁ
সরকাশ হুয় উয়ো দরখ্‌ত্ কে জিস্ সমর নহিঁ।

অর্থাৎ ফলবর্তী বৃক্ষ মাথা তুলতে পারে না। যারা মাথা তুলে থাকে, তাদের ফল নেই।

মীর্জা গালিব বাদশাহের শ্যার রচনার এই তৎপরতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উপস্থিত সবাই তাঁর রচিত শ্যারটির উচ্চমানে অভিভূত না হয়ে পারেন না।

ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়। মীর্জা গালিবের মন একটা বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেন যে এই বিষণ্ণতা তিনি নিজেও প্রথমটা উপলব্ধি করতে পারেন না। শুধু মনে হতে থাকে, সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী।

বাদশাহের দৃষ্টি এড়ায় না গালিবের ভাবান্তর। কিন্তু আশেপাশে আরও অনেকে থাকায় একান্তে প্রশ্ন করতে পারেন না। তিনি জানেন, শিল্পী মাত্রেই সাধারণতঃ বিষণ্ণ। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস বর্ষায় দু'কূল প্লাবিত জলরাশির মতই সাময়িক এবং বাঁধভাঙা। তবু গালিবের এই ভাবান্তর বড় আকস্মিক।

এই সময় পুত্র জওয়ান বখত্ প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে বাদশাহের কাছে

এসে বলে,—নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের বেগম আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—লখনৌ ?

—হ্যাঁ।

—এত রাত্রে ?

—নবাব ফিরিঙ্গিদের দ্বারা গদীচ্যুত হবার পর থেকে তিনি এইরকম অস্থির হয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে।

—বেগম সাহেবার সেবা-যত্নের ব্যবস্থা কর। আমি কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

জওয়ান বখত্ কক্ষ ত্যাগ করে। তার কিছু পরেই শিল্পীরা বিদায় নেন।

বাদশাহ্ মীর্জা গালিবকে নিকটে আহ্বান কবে বলেন,—হঠাৎ এমন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন কেন ?

—আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। এ ধরনেব শিল্পী-সমাবেশ আগামী বছর থেকে আর হবে না।

—আপনি কি এমন একটি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন যা অন্ধকার আচ্ছন্ন ?

—সঠিক বলতে পারি না বাদশাহ্। তবে এটুকু বুঝতে পারছি নিকট ভবিষ্যৎ খুবই অস্থিব। উত্থান, পতন আর অরাজকতা। তার পবে কী হবে জানি না।

—সব থেমে গেলে স্বাধীন হিন্দুস্থানে আরও বিরাট আকারে শিল্পী-সমাবেশ হবে। লাঙ্গল-ধরা কড়া হাতের মানুষও তখন শ্যার লিখবার মেজাজ আর অবসর পাবে। আপনাদের লেখনী তখন বিদেশী এক জাতির ভয়ে কথায় কথায় থর থর করে উঠবে না।

—হয় তো তাই। কিন্তু সত্যিই কি কাঁপে বাদশাহ্ !

—না। কিন্তু লেখনী ধারণ করে যে কবি, তার মনে ছায়াপাত ঘটায় বৈকি !

—আপনি সত্য বলেছেন।

ওয়াজিদ আলির বেগমের বক্তব্য একই ছিল। ফিরিঙ্গিদের খতম্ করতে হবে। কিন্তু নবাব নিজে বড়ই দুর্বল। বিলাসিতা তাঁর মজ্জাগত। জীবনের আসল সময়ে চূড়ান্ত ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত থাকায়, উদ্যম এবং কর্মক্ষমতা বলতে তাঁর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই বেগম প্রার্থনা জানাতে এসেছিল বাহাদুর শাহ্‌কে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। বাদশাহ্ ধৈর্য এবং সহানুভূতির সঙ্গে বেগমের সমস্ত বক্তব্য শুনে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে তাকে বিদায় করলেন।

এদিকে নানা সাহেব আর লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রচেষ্টা ফলবতী হতে শুরু করল। বাদশাহের নিযুক্ত ফকির আর সাধু-সন্তের প্রভাব প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেল ফৌজের মধ্যে। জনসাধারণও তাদের প্রভাব এড়াতে পারল না। তাদের প্রভাবের মূল-মন্ত্র হল এই যে, ধর্মহীন বিদেশীরা ছলে-বলে-কৌশলে এ-দেশের হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। তার পয়লা দৃষ্টান্ত, মুসলমান সিপাহীদের চিরাচরিত শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে নতুন ধরনের টুপি পরতে দেওয়া হয়েছে যা শূকর-চর্মে নির্মিত। প্রচণ্ড অসন্তোষের আলোড়ন উঠল দেশের প্রতিটি প্রান্তে। নাজেহাল ফিরিঙ্গিরা অতি কষ্টে সে উত্তেজনা চাপা দিল। চাপা দিল বটে, কিন্তু নির্মূল করতে পারল না। ধিকি-ধিকি অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে চলল প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানের মনে। ওদের মধ্যে কোনদিনই বিভেদ নেই। আজ ওরা পরস্পরের ওপর আরও নির্ভরশীল, একে অন্যের প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠল। কারণ ওরা বুঝতে পারল যে, উভয়ে একই শত্রুর শিকার, যে শত্রু ওদের ধর্ম কেড়ে নিতে চায়। কেড়ে নিতে চায় বৈকি। মুসলমানদের মস্তকে ওরা শূকর-চর্ম নির্মিত টুপি পরিয়েছে। তেমনি কালাপানি পার হলে ধর্ম যায় একথা জেনেশুনেও হিন্দুদের জোর করে জাহাজে উঠিয়ে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছে যুদ্ধ করতে। তারপর সে দেশে পৌছে অসন্তুষ্ট হিন্দু ফৌজের একাংশকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড করিয়ে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ওরা দুশমন্—ধর্মের দুশমন্, দেশের দুশমন্।

বাদশাহের প্রচার-কুশলতার তারিফ করেন নানা সাহেব। তিনি ইন্ধন যুগিয়ে চলেন। যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে, এই আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সেই উত্তাপকে শীতল হতে দিলে চলবে না। কারণ পলাশীযুদ্ধের পর শতবর্ষ পার হতে আর বেশি দেরি নেই। সুতরাং পরিপূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এত গোপনীয়তার মধ্যেও ফিরিঙ্গিরা কিছুটা আঁচ করতে পারে। কারণ তাদের পদলেহী কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ছদ্মবেশে দেশপ্রেমিকদের বন্ধু অথবা কর্মচারী হয়ে রয়েছে। তারা তাদের সন্দেহের কথা সবই জানায় গোপন সূত্রে। ফলে বিদেশীরা অতি বিপদের ছায়া দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ শুধু ছায়াই। কায়া দেখতে পায় না তারা। অশরীরীর পশ্চাতে ধাওয়া করতে গিয়ে বার বার নিষ্ফল হয় তারা। সাধু-সন্ত-ফকিরদের ধীরে ধীরে নির্যাতন শুরু করে—তবু প্রমাণ মেলে না। আগ্নেয়াস্ত্রের নলের মুখে দাঁড়িয়ে জীবন বলি দেবার আগের মুহূর্তেও ধৃত ব্যক্তিরা কোন কিছু কবুল করে না।

এমনি যখন অবস্থা দেশের, তখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল একটি কারণে। ফিরিঙ্গিরা এক ধরনের গুলির আমদানি করল যা বন্দুকে ব্যবহার করার পূর্বে দাঁত

দিয়ে কেটে নিতে হয়। চতুর্দিকে রটে গেল, বন্দুকের গুলি শূকর ও গরুর চর্বি দিয়ে নির্মিত। শয়তান বিদেশীরা ধর্ম বিনষ্ট করবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও সর্বনাশা পথ বার করেছে।

আগুন জ্বলল। বাঙলা দেশ থেকে বিস্ফোরণের বার্তা এসে পৌছালো। এসে পৌছালো আরও নানান দিক থেকে। দিল্লীর লালকেল্লায় সেই বিস্ফোরণের ঢেউ এসে ধাক্কা দিতে লাগল—ওঠো, জাগে,—নেতৃত্ব দাও। বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ্ বুঝলেন, এতদিনে সময় এসেছে।

মুঘল-মসনদ ওরা অপসারিত করেছে। সামান্য রৌপ্য নির্মিত এই মসনদ—ময়ূর-সিংহাসনের ন্যায় মণিমুক্তা খচিত নয়। তবু তার মর্যাদা ময়ূর-সিংহাসনের চাইতে বিন্দুমাত্র কম নয়। ওরা লালপর্দা বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ান-ই-আমও বন্ধ। দরবারে মিলিত হবার স্থান নেই। অথচ এখন সবার সঙ্গে মিলিত হবার জরুরী প্রয়োজন বাদশাহের। একসঙ্গে সব ক'টি পুত্রকেও পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে চোখে দেখেন নি তিনি। দেখবার ইচ্ছে যে কখনো হয় নি, তা নয়। সুযোগ হয়ে ওঠে নি। একমাত্র জিন্নৎ-এর গর্ভজাত পুত্র জওয়ান বখত্-এর আনাগোনাই তার কাছে বেশি। কিন্তু এই মুহূর্তে সবাইকে একসঙ্গে দেখতে চান। আচ্ছা, ওদের সবার নাম মনে আছে তো? নাম নিশ্চয়ই মনে আছে। কিন্তু ক'টি পুত্র তাঁর, কেউ প্রশ্ন করলে হয়তো সহসা সঠিক জবাব দিতে পারবেন না। বাদশাহ্ আপন মনে গুনতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা, বখত্ মৃত। খুদাতাল্লা তাকে শান্তি দিন। এরপর পুত্র ফকরুদ্দিন, কোয়াইস, আবুল হাসান, জহীরুদ্দিন, সোহ্‌রাব-ই-হিন্দী, আবু নাস্‌র, উলুগ্ তাহের। তাহেরের পর কে যেন? ও, মনে পড়েছে, খিজির সুলতান, তারপর জওয়ান বখত্, বক্তিয়ার শাহ্, কোচক সুলতান, আব্বাস, শের শাহ্। আঙুল গুনে বাদশাহ্ দেখেন কন্যাদের বাদ দিলে এই তেরোজন পুত্রসন্তান। এদের প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান। এতগুলি পুত্র তাঁর অথচ এদের মধ্যে ক'জন যে দেশের মঙ্গলের জন্য জীবনপাত করতে চাইবে তিনি জানেন না। বছরের পর বছর কর্মবিহীন অবস্থায় থেকে এরা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে দু'পাঁচজন ব্যতীত কেউ শিকারেও যায় না। তাঁর মত নতুন অশ্বকে বশে আনবার মত পারদর্শীতা এদের কারও আছে বলে জানা নেই তাঁর। তবু এরা শাহাজাদা, দেশকে প্রাণমন দিয়ে সবাই ভালবাসুক আর না বাসুক, মুঘল-বংশের মর্যাদার কথা বললে, এরা রক্ত দিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

জীবনলালকে ডেকে তিনি বলেন,—প্রত্যেক শাহাজাদাকে যেন আজ সন্ধ্যায়

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলা হয়।

—সাক্ষাতের স্থান কোথায় বলব বাদশাহ্‌ ?

— মুসম্মান বারজ।

—তার চাইতে হায়াৎ বক্‌স্‌ বাগে বললে হয় না ?

—না, ব্যাপারটা ঠিক লোক-দেখানো নয়। মুসম্মান বারজ-এর চতুর্দিকে অন্যান্য দিনের চেয়েও কড়া প্রহবার ব্যবস্থা করা হয় যেন।

জীবনলাল চলে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে হাকিম আসাগুল্লা এসে প্রবেশ করে।

—বাদশাহ্‌ বলেন,—আচ্ছা, হাকিম সাহেব, জীবনলালকে বড চঞ্চল বলে মনে হল!

—চঞ্চল তো আমিও বাদশাহ্‌।

—কেন ? আপনারা সবাই হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ?

—প্রতি রাত্রেই প্রায় দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছি।

—কাসের দুঃস্বপ্ন।

—অমঙ্গলের। জীবনলালও হয়তো তাই দেখে।

—ফিরিঙ্গিদের ?

—হ্যাঁ।

—কত ফিরিঙ্গি রয়েছে এদেশে ?

—নগণ্য। কিন্তু তাদের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী ধনিক সম্প্রদায়—রাজা-মহারাজাও রয়েছেন।

—তেমন দিন এলে কেউ-ই থাকবে না ওদের পক্ষে।

—তাই যেন হয়।

—মনকে বলিষ্ঠ করুন হাকিম সাহেব। নিশ্চিন্ত জীবন পরিত্যাগ করে কোন ঝুঁকির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলে যে-ধরনের মজবুত মন দরকার নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করুন। দূর থেকে অনেক বিপদকেও বিকট চেহারার মনে হয়।

—আমি নিজেকে তৈরি করছি জাঁহাপনা। অন্ততঃ চেষ্টার কসুর করছি না।

—সুখী হলাম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। কোষাধ্যক্ষ বারাণসী-লালকে আজ রাতে একবার দেখা করতে বলবেন। আমাদের আর্থিক অবস্থাটা একবার যাচাই করে নিতে চাই।

—আমি এখনই তাকে খবর পাঠাচ্ছি।

একটু হেসে বাদশাহ্‌ বলেন,—অবিশ্যি কোষের অবস্থা আমার অজানা নয়। বারাণসীলাল প্রাণপাত করেও জমার ঘরে কিছু রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

—বারাণসীলাল না পারলে আর কেউই পারবে না।

—সন্দেহ নেই।

হাকিম আসানুল্লা বিদায় নেবার পর বাদশাহ্ তাঁর একান্ত সচিব মুকুন্দলালকে ডেকে পাঠান। সে এলে তিনি প্রশ্ন করেন,—লখনৌ থেকে মীর্জা খাঁ বক্স্-এর পুত্র মার্জা মুরাদ এসে আমাকে কী বলেছিল স্মরণে আছে আপনার?

—হাঁ বাদশাহ্, পারস্যের সুলতানের কাছে দূত প্রেরণের প্রস্তাব করেছিলেন সাহায্য পাঠাবার জন্যে।

—সিদি কামবারকে পাঠিয়েছিলাম একশো টাকা পথ-খরচা দিয়ে। সুলতান আশ্বাস দিয়েছিলেন।

—মনে আছে জাঁহাপনা।

—আমি আবার একজনকে পাঠাতে চাই। আপনি একটি পত্র লিখে ফেলুন আমার নামে। তাতে উল্লেখ করবেন, আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মার্জা হায়দারকে পাঠালাম ব্যক্তিগত দূত হিসাবে। সাহায্যের আরও প্রয়োজন—সৈন্য ও অর্থ দিয়ে। আর একথা জানাতেও ভুলবেন না যে, আমি শিয়া ধর্ম গ্রহণ করলে সাহায্য যদি ত্বরান্বিত হয়, তবে তাতেও আমি সদা প্রস্তুত।

চমকে উঠে মুকুন্দলাল প্রশ্ন করে,—সত্যিই একথা লিখব?

—হ্যাঁ। অন্ততঃ আপনার কাছে আমি কোন কিছু গোপন করি না।

—কিন্তু—এ তো একধরনের ধর্মত্যাগ বাদশাহ্।

—মুকুন্দলালজী, ধর্মত্যাগ খুবই পরিতাপের। মানুষ রক্তের বদলে চিরকাল স্বীয় ধর্মকে অটুট রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্মুখে এখন শুধু একটিই ধর্ম—সেটি হল দেশের স্বাধীনতা। ধর্মও সেখানে অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তা'ছাড়া, আমি তো ধর্ম পরিত্যাগ করছি না। আমি এখন মুসলমান—পরেও তাই থাকব। আর না থাকলেই বা কী এসে যায়, আমার একার ধর্মত্যাগের পরিবর্তে যদি ধর্মহীনদের এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা যায়, তবে তাই কি শ্রেয় হবে না!

মুকুন্দলাল দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে,—আমি সামান্য মানুষ বাদশাহ্। উচ্চ আদর্শ আমার মধ্যে কিছুই নেই বলতে গেলে। শুধু এইটুকু শিখেছি পিতাজীর কাছ থেকে যে, কখনো নিমকহারামী করবো না, প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যার আশ্রয় নেব না, আর সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করব।

—যথেষ্ট। এর চাইতে বেশি প্রয়োজন হয় না। এইটুকু মেনে চললেই বেহেস্ত্-এর পথ পাকা।

মুকুন্দলাল বাদশাহের নামে পারস্যের সুলতানকে পত্র লেখার জন্য গাত্রোত্থান করে স্থানত্যাগের উদ্দেশ্যে।

বাদশাহ্ বলেন,—হাসান আশকারী যদি কেল্লায় থাকে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

—এখানেই ?

—হ্যাঁ।

তাপদগ্ধ দিল্লী নগরী। প্রভাতের সূর্য কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড অগ্নিগোলকে পরিণত হয়ে সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়।

মুসম্মান বারঙ্গ এ বাদশাহ্ একটি সুদৃশ্য রৌপ্যপাত্রে শীতল পানীয় পান করে পাত্রটি জিন্নৎ-এর হাত ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বলেন,—বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর নিশ্চয়ই এ-সময়ে এই নিরামিষ সরবং পান করতেন না।

বাদশাহের হাসি জিন্নৎ বেগমের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে,—তুমি তাঁর অযোগ্য বংশধর।

—একশোবার। তাঁরা ছিলেন বিরাট পুরুষ। তাই অনেক কিছুই তাঁদের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যেত। আমি যদি আফিম কিংবা সুরা পান করতাম কেউ সহ্য করত না।

—তোমার কোন রকম নেশা না থাকলেও এই চত্বরে অনেকের আছে।

—দোষ দিই না তাদের। তবে ব্যক্তিগতভাবে নেশাকে আমি ঘৃণা করি শুধু এই আলবোলা—তাও মাত্র সেদিন ধরলাম, কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে।

কেল্লার বাইরে কলরব শোনা যায়।

—কীসের যেন গোলমাল হচ্ছে ? জিন্নৎ প্রশ্ন করে।

—গরমের দিনে মানুষের মস্তিষ্কও চড়া থাকে। ঝগড়া বেঁধেছে বোধ হয়।

কলরব বৃদ্ধি পায়। অস্বাভাবিক গোলমাল। বিবাদমান দুই পক্ষের কলরব হওয়া সম্ভব নয়। উৎকণ্ঠিত জিন্নৎ দ্রুত বাতায়নের কাছে সরে যায়। বাদশাহও ধীরে ধীরে তার পশ্চাতে এসে দাঁড়ান।

ঠিক সেই মুহূর্তে হাকিম আসানুল্লা বাদশাহের কক্ষের দিকে ছুটে আসে। তার আগমন-বার্তা পেয়ে জিন্নৎ বেগম পশ্চাতের দরজা দিয়ে বেগম মহলের দিকে চলে যায়। একটা কিছু ঘটেছে, যা সচরাচর ঘটে না। অশুভ কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। নইলে হাকিম অমনভাবে আসত না। তবু বাদশাহ্কে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

জিন্নৎ কক্ষ পরিত্যাগের পরমুহূর্তেই হাকিম এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,—সর্বনাশ হয়েছে বাদশাহ্।

—কী হয়েছে?

—সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে।

—লালকেল্লার? মানে, আমার ফৌজরা বিদ্রোহ করেছে?

—না। ফিরিঙ্গিদের সিপাহিরা।

—আপনি কি বলতে চাইছেন, ফিরিঙ্গি ফৌজের হিন্দুস্থানী সিপাহী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাদশাহ্।

—তা কেমন করে হবে? বিদ্রোহ ঘোষণার দিন তো এখনো আসে নি। দুই কুড়ি দিন বাকি রয়েছে।

—আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—বলছি। যাদের কথা আপনি বলছেন তারা অন্ততঃ আজকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না।

—কিন্তু এরা তারাই। ওদের একজন হিন্দু সিপাহী দেওয়ান-ই-খাসে এসে রক্ষীদের কাছে বলেছে, মীরাটে কারা সমস্ত শাদা চামড়াকে খতম্ করেছে। একটিও ফিরিঙ্গি অবশিষ্ট নেই সেখানে। মীরাট থেকে সোজা দিল্লী চলে এসেছে সবাই। অগ্রবর্তী দল কেল্লাতে প্রবেশ করেছে। বাকি সবাই এসে পড়ল বলে।

ঠিক সেই সময় শত শত কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা যায়।

বাদশাহ্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে দৃক্‌পাত করে বলেন,—ঠিকই বলেছেন হাকিম সাহেব। ওরাই এসেছে। হিসাবে ভুল করে ফেলেছে হয়তো। কিংবা অন্য কোন উপায় হয়তো ছিল না। ওরাই এসেছে। ওই দেখুন অশ্বারোহী সৈন্যেরা মীর-বগরোকার পথে এগিয়ে আসছে। ওদের মধ্যে শুধু পোশাক-পরা সৈন্যই নেই, সাধারণ পরিচ্ছদেরও অনেকে রয়েছে। কী আনন্দ! কিন্তু আজই এলো? হিন্দুস্থানের অন্য সব জায়গায় ফৌজেরা যে একটি বিশেষ দিনের জন্যে প্রতীক্ষারত!

—আমি ফটক বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি বাদশাহ্।

একটু হেসে বাদশাহ্ বলেন,—চেষ্টা করুন।

কাতারে কাতারে আসছে ওরা। হাকিম সাহেব লোকজন নিয়ে ফটক বন্ধ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই আট-দশজন অশ্বারোহী ভেতরে প্রবেশ করে। তারা বাতায়নে বাদশাহ্‌কে দেখে চিৎকার করে ওঠে—দোহাই বাদশাহ্, ফটক বন্ধ করে দেবার হুকুম দেবেন না। আপনার সাহায্য পাব বলেই ছুটে এসেছি। আপনি আমাদের আশ্রয় দিন, পরিবর্তে আমরা বুকের রক্ত ঢেলে দেব।

আমরা হিন্দুস্থানের ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করছি। মীরাটের একটি বিদেশীও জীবিত নেই।

বাদশাহ্ জানেন, তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা এদের তিনি ক্ষিপ্ত করে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে বিপদ বাড়বে। ফিরিঙ্গিরা শয়তান হতে পারে। তাই বলে কেল্লায় মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি অসহায় অবস্থায় নিহত হোক এটাও তিনি স্বচক্ষে দেখতে চান না। অথচ মর্মে মর্মে অনুভব করেন, যে তীব্র ঘৃণা বিদ্রোহীদের মধ্যে জন্মেছে ফিরিঙ্গি সম্বন্ধে, সেই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশে বাধা দেওয়া অন্যায়।

সম্পূর্ণ শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন,—শোন ভাইসব, আমার ওপর তোমরা যতখানি নির্ভর করতে চাইছ, সত্যিই আমি নির্ভরযোগ্য কিনা, সেটা একবার যাচাই করে নেওয়া উচিত তোমাদের। তোমরা দেখছ আমি বৃদ্ধ। আমার অর্থবল বলতে কিছুই নেই। আমি ফকির। তোমাদের আশ্রয় দেবার মত ক্ষমতা কি আমার আছে? তোমাদের এই বিপুল উদ্যমকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার দক্ষতা কি আমার আছে?

—আপনার আশীর্বাদ বাদশাহ্—আপনার আশীর্বাদই আমাদের আশ্রয়। আমরা অর্থ চাই না। শুধু এইটুকু জানতে চাই, বাদশাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।

বাদশাহ্ ভালভাবে চেয়ে দেখেন। ওরা জীবনে প্রথম দিল্লীতে এসেছে। তবু তাঁকে ওরা চেনে। হয়তো তাঁর ছবি দেখে থাকবে। কী গভীর ভালবাসা তাঁর প্রতি ওদের।

সেই সময়ে আইন-বিশারদ গুলাম আব্বাস বাদশাহ্ সমীপে উপস্থিত হয়।

—আব্বাস!

—বাদশাহ্।

—ফিরিঙ্গি ফ্রেজার আর ডগলাসকে খবর পাঠাতে হবে।

—আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তারা এলে যে এদের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে।

—না। একটি গুলি ছুঁড়লে এদের কেল্লায় প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা দেব।

গুলাম আব্বাস চলে যায়।

বাদশাহ্ বাতায়ন থেকে সরে আসেন। কলরব প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমুদ্রের বাঁধ ভেঙেছে। দলে দলে ওরা এসে পড়েছে কেল্লার সম্মুখে। ভেতরে ঢুকে পড়েছে যারা তাদের সংখ্যাও কম নয়। রক্ষীরা নিশ্চয়ই ওদের রুখতে চেষ্টা করে নি।

ফ্রেজার এসে বলে,—আপনি ভীত হবেন না শাহ্। আমি ওদের সমুচিত

শাস্তি দিতে যাচ্ছি।

—শোন ফ্রেজার, আমার ভয় তোমাদের জন্য। বরং যদি পার পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাও। কেল্লায় আছো বলে তোমাদের প্রতি আমার একটা কর্তব্য রয়েছে। কেল্লার মধ্যে তোমরা নিহত হও এ আমি চাই না।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ফ্রেজার বলে,—অমন কালাকুত্তাদের শিক্ষা দেবার অভ্যাস আমাদের রয়েছে জেনে রাখুন।

—আমি জানি, মর্মে মর্মে জানি। কারণ আমার রঙও তোমাদের মত শাদা নয়।

—মানে, আমি—

—ঠিক আছে। কতটা খেল্ দেখাতে পার দেখাও গে।

—ফ্রেজার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ্ মুসম্মান বারজ্ থেকে বার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন দেওয়ান-ই-খাসের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে জওয়ান বখত্ ছুটে এসে বলে,—ফ্রেজারকে খুন করেছে ওরা, খুন করেছে কাদের দাদ খাঁ। কাবুল থেকে এসে আমাদের এখানে ছিল।

—বেশ করেছে। ফ্রেজারকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম কর্তব্যবোধে। নইলে ওদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র দরদও নেই। শোন জওয়ান, চারিদিকে তীব্র দৃষ্টি রেখে চলো। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে।

জওয়ান বখত্ যেতে না যেতেই জহীর এসে সংবাদ দেয়,—ওরা ডগ্লাসের কক্ষের দিকে গিয়েছে। সেখানে আরও কয়েকজন ফিরিঙ্গি রয়েছে।

—ডগ্লাসের ঘর ওরা চিনল কি করে?

—আমাদের সিপাহীরা বিদ্রোহীদের পথ-প্রদর্শক।

—বুঝেছি। সব একাকার হয়ে গিয়েছে, তাই না জহীর?

—হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

—তোমাদের দুঃখ হচ্ছে, না আনন্দ হচ্ছে?

—এখনো বুঝতে পারছি না বাদশাহ্।

মুকুন্দলাল ছুটতে ছুটতে এসে বলে, ডগ্লাসকে ওরা হত্যা করেছে।

—জানি।

—এক্ষুনি হল।

—জানতাম মুকুন্দলাল। তুমি আজ কাছাকাছি থেক। দরকার হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে পাই। হাকিম সাহেব কোথায়?

—দেওয়ান-ই-খাসে।

—আমিও যাচ্ছি। দেওয়ান-ই-খাসের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। দরবার বসবে আজ। দীর্ঘ পনেরো বছর বন্ধ থেকে দরবার কক্ষে অনেক ধুলোর স্তর জমেছে। সমস্ত ধুলো উড়িয়ে দিতে হবে। সেই ধুলো গিয়ে জমা হোক ফিরিঙ্গিদের ভাগ্যের ওপর।

সেদিন সহস্র সহস্র সিপাহী লালকেল্লার প্রান্তর পূর্ণ করে ফেলল। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র এবং একটি করে ছোট্ট বিছানা। তারা আশ্রয় নিল লালকেল্লার ভেতরে দেওয়ান-ই-খাসে এবং উন্মুক্ত স্থানে। দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে ঘন ঘন ধ্বনি উঠল,—বাদশাহ্ কী জয়।

বাদশাহ্ ওদের মধ্যে গিয়ে ঘুরলেন চারিদিকে, অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। শুনলেন কীভাবে বন্দুকের গুলিতে শূকর ও গরুর চর্বি মাখিয়ে ফিরিঙ্গিরা ওদের জাতধর্ম নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেছে। দু'চারজন হিন্দু ও মুসলমান কাঁদতে কাঁদতে বলে—তাদের ধর্ম আর নেই। কারণ না জেনে তারা ওই গুলি মুখে স্পর্শ করেছে।

বাদশাহ্ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,—তাতে ধর্ম যায় না। অত ভঙ্গুর নয় কোন ধর্ম। তা'ছাড়া তোমরা সজ্ঞানে ওসব মুখে ঠেকাও নি।

—তবু ধর্ম গেলে কি আর ফিরে পাওয়া যায় বাদশাহ্?

—তোমরা আমার সন্তানের মত। আমায় বিশ্বাস কর। ধর্ম তোমাদের যায় নি। সুতরাং ফিরে আসার প্রশ্নই ওঠে না।

বাদশাহের প্রবোধ পেয়ে, ওরা আনন্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বাদশাহ্ বলেন,—তোমাদের অনেকের দেখছি শোবার জায়গা নেই।

জীবনলাল বলে ওঠে,—ওরা কেল্লার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে।

—না। ওদের স্থান শালিম গড়ে হবে। কিন্তু তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গিয়েছে কেন জীবনলাল?

—শরীর ঠিক সুস্থ নয় বাদশাহ্।

—তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। বিশ্রাম নিতে যাও।

জীবন ধীরে ধীরে বাদশাহের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কিন্তু সে বিশ্রাম নিতে যায় না। গেলে ঘটনা-প্রবাহ পুরোপুরি দেখতে পাবে না। এখন থেকে প্রতিটি ঘটনা তাকে দেখতে হবে, জানতে হবে।

রাত্রে আপন কক্ষে বসে জীবনলাল খুব দ্রুত একটি পত্র লিখতে থাকে। বাইরে অপেক্ষারত পত্রবাহক। প্রভাতের সূর্য দিগন্তে উঁকি দেবার আগেই পত্রবাহককে

চলে যেতে হবে অনেক দূরে—বিদ্রোহীদের নাগালের বাইরে।

লিখতে লিখতে কেঁপে ওঠে জীবনলাল। প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে ছায়া দেখতে শুরু করেছে সে। সহসা বাইরে তোপধ্বনি। জীবনলালের হাতের লেখনী খসে পড়ে। মনে হয় গোলাটি যেন সোজা তারই দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু না, তা নয়। আরও তোপধ্বনি হয় পর পর। গুনতে থাকে জীবনলাল। এক—দুই—তিন—একুশবার হয়ে থেমে যায়। বাদশাহের সামনে কামান দাগল বিদ্রোহীরা। সবাই এদের বলছে তেলিঙ্গা।

জীবনলালের পত্র শেষ হয়। সযত্নে সেটা বন্ধ করে বাইরে এসে পত্রবাহকের হাতে দিয়ে বলে—তেজী ঘোড়া তো?

—হ্যাঁ।

—এক্ষুনি যাও।

—সেলাম।

গভীর রাতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেও অতি প্রত্যুষে বাদশাহের নিদ্রা টুটে যায়। ঘুমের মধ্যেও তিনি যেন সচেতন ছিলেন আগামী দিনের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে।

মুসম্মান বারজ নিস্তব্ধ। কিন্তু কেল্লার চত্বরে একাধিক অশ্বের হ্রেষারব তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তেলিঙ্গারাও জেগে উঠেছে বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরেই বাদশাহ্ গুলাম আব্বাসকে ডেকে পাঠালেন। আব্বাস এলে তিনি বলেন,—আইনতঃ আমিই হিন্দুস্তানের বাদশাহ্। ক্ষমতা আমার ছিল না, ফিরিঙ্গিরা বেআইনী ভাবে সেটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই দেওয়ান-ই-খাস খুলে দিয়েছি কাল।

—আপনি ঠিকই করেছেন বাদশাহ্।

—কিন্তু দরবার খুললেই তো শুধু হল না, মসনদ কোথায়? দরবারে আমার বসবার স্থান নেই।

—একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

—হ্যাঁ, রৌপ্যসিংহাসনটি বার করতে হবে মাটির নীচের কক্ষ থেকে। পরিষ্কার করতে হবে সেটি।

—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

—যাচ্ছ তো, চাবি আছে তোমার কাছে?

গুলাম আব্বাস খুবই অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। তার মত আইনজ্ঞের পক্ষে এতটা

ছেলেমানুষী শোভা পায় না। বিশেষতঃ বাদশাহের সম্মুখে। এতে তার সুনামই নষ্ট হবে। আইনজ্ঞের হওয়া উচিত ধীর শান্ত, অচঞ্চল। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে আজ সে অভিভূত।

বাদশাহ্ হেসে বলেন,—আমি জানি, তুমি দরজা ভেঙে রৌপ্য সিংহাসন বার করতে। কিন্তু চাবিটি যখন বারানসীলালের কাছে রয়েছে তখন অনর্থক তাতে লাভ কি?

গুলাম আব্বাস ছুটতে থাকে বারানসীলালের কাছে। বারানসীলাল তার গৃহেই রয়েছে নিশ্চয়। তার আবার সকালের পুজো আহ্নিক রয়েছে। পাকা এক ঘণ্টা। মনে মনে বিধাতার উদ্দেশে বলে আব্বাস,—হে খুদাতাল্লা, তোমার পুজোটা কোষাধ্যক্ষ যেন একটু তাড়াতাড়িই সেরে নেয়। কেল্লার চাবিগুলি সে আবার নিজের ট্যাঁক ছাড়া আর কোথাও রাখে না।

আব্বাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দলাল এসে খবর দেয়,—একদল নগরবাসী আপনার দর্শনার্থী। তেলিঙ্গারা তাদের দোকান লুঠ করেছে।

—সে কি!

—তেলিঙ্গারা উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নগরীর মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যা দেখছে সব লুঠ করে নিচ্ছে।

বৃদ্ধ বাদশাহের শরীরে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। আশার রঙীন সূর্য উঠতে না উঠতেই অস্তমিত হবার অশুভ ইঙ্গিত।

মুকুন্দলালকে তিনি বলেন—শাহাজাদা জওয়ান বখত্‌ আর জাহীর-উদ্দীনকে এখুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। না, ওদের বল দেওয়ানই-খাসের সামনে যেতে। আমি নিজে যাচ্ছি সেখানে।

বাদশাহ্ দেওয়ান-ই-খাসের সামনে যেতে শাহাজাদারাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। সিপাহীরা তাঁকে দেখে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

বাদশাহ্ উচ্চকণ্ঠে বলেন,—তোমাদের জয়ধ্বনি অকৃত্রিম, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কঠিন কর্তব্যের বোঝা তোমরা কাঁধে নিয়েছ, তাকে সুষ্টুভাবে নিষ্পন্ন করতে হলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর সংযমের প্রয়োজন রয়েছে। নইলে ফিরিঙ্গিদের কামানের গোলা তোমাদের সঙ্গে আমাকেও উড়িয়ে দেবে অতি শীঘ্র।

—আপনি যা হুকুম করবেন, আমার প্রাণ দিয়েও তাই তালিম করব।

—তোমাদের একটি কথা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই। তোমাদের আমি 'সন্তান' বলে সম্বোধন করেছি কাল। কিন্তু তোমরাই শুধু আমার সন্তান

একথা ভেবে নিলে ভুল করবে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আমার সন্তানেরা ছড়িয়ে রয়েছে। একমাত্র এই দিল্লী-নগরীতেই অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা আমার উপর নির্ভরশীল। আমার কাছে খবর এসে পৌঁছেচে তোমাদের অনেকে অস্ত্র আর সংঘবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করছে। এ ধরনের কোন কিছু সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা বল আর যা-ই বল, সব কিছু মানুষ চায় সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধির জন্য। কোথায় জনগণ তোমাদের মুক্তি ফৌজ হিসাবে অভিনন্দিত করবে, তা না হয়ে যে ধরনের নমুনা তোমাদের মধ্যে কয়েকজন দেখাচ্ছ, তাতে তাদের মন বিরূপ হয়ে উঠবে। সাহায্যের পরিবর্তে কিছুদিন পর তারা তোমাদের শত্রুতা করবে। একটা কথা মনে রেখ, সৈন্যদের আসল শক্তি কামান কিংবা বন্দুক নয়, তলোয়ার কিংবা বল্লমে নয়, অশ্ব কিংবা গজেও নয়। তাদের প্রধান শক্তি তাদের পেছনের অগণিত সাধারণ মানুষ, তারা যদি বিরূপ হয়, তোমাদের ভিত্তিমূল থরথর করে কেঁপে উঠবে।

স্তব্ধ তেলিঙ্গারা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। বাদশাহের অগ্নিদৃষ্টির দিকে চাইবার দুঃসাহস তাদের নেই।

ইতিমধ্যে গুলাম আব্বাস বারানসীলালকে টানতে টানতে কেল্লায় এনেছে। ভূতল-কক্ষের দ্বার খুলে রৌপ্য সিংহাসন বার করেছে। সেটিকে বহু লোকের সাহায্যে সত্বর পরিষ্কার করে দরবার-কক্ষে স্থাপন করেছে। জোর বরাত, বারাণসীলালকে সে পূজায় বসবার আগেই ধরতে পেরেছে। দেওয়ান-ই-খাসে মসনদ স্থাপন করে সে বাদশাহের নিকট এসে দাঁড়ায়। তাঁর বক্তৃতা শোনে। বাগ্মীতায় বাদশাহের অসাধারণ ক্ষমতা, যাকে নিঃসন্দেহে প্রতিভা বলা যায়। সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে শুনছিল। বাহাদুর শাহ্ নীরব হলে, অন্যান্যদের মত সেও বহুক্ষণ কিছু বলতে পারে না।

শেষে বলে,—মসনদ লালপর্দায় স্থাপন করা হয়েছে বাদশাহ্।

—এত তাড়াতাড়ি? তুমি খুব কাজের লোক আব্বাস। কিন্তু কী ঘটেছে সব তো শুনেছ। সকালে উঠে মন একরকম ছিল, এখন একেবারে বদলে গিয়েছে। অবিচল পদে মসনদে গিয়ে বসতে ইতস্ততঃ বোধ করছি।

আব্বাস বলে,—একটা কথা বলবার অনুমতি দেবেন বাদশাহ্?

—নিশ্চয়। বল।

—আপনি একাধিক স্থানে লিখেছেন মহৎ কাজে বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হতেই হবে। তাতেই প্রমাণ হয়, কাজটি মহৎ। তাই বিচলিত হলে চলে না।

—কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু রাত না কাটতেই এ-ধরনের সংবাদ বড় অশুভ।

সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দরবার কক্ষ উন্মুক্ত হল মধ্যাহ্নে। মুঘলবংশের প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্য বা আড়ম্বর এই দরবারে নেই। কিন্তু এমন একটা কিছু রয়েছে, এমন একটা প্রেরণা, একটা বর্ণনাতীত স্বাধীনতা-স্পৃহা, যা একশো বছরের মধ্যে দেওয়ান-ই-খাসে কখনো পরিলক্ষিত হয় নি।

হাকিম আসানুল্লা কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভাবে, এখনও সময় রয়েছে। বাদশাহকে সম্মত করিয়ে ফিরিঙ্গিদের কাছে পত্র প্রেরণ করা যায়। যা ঘটেছে সব কিছু জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে মুঘলবংশ আরও কয়েক পুরুষ লালকেল্লায় বসবাস করতে পারে।

—হাকিম সাহেব। বাহাদুর শাহের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

দরবারী কেতায় হাকিম আসানুল্লা বাদশাহকে অভিবাদন জানিয়ে বলে,—জাঁহাপনা।

—আপনি নিশ্চয়ই পত্র প্রেরণের কথা ভাবছেন।

চমকে ওঠে হাকিম। বাদশাহ্ খুবই উচুদরের ফকির বটে। কিন্তু তিনি কি অন্তর্যামী? তবু আসানুল্লা উৎসুক হয়ে ওঠে মনে মনে, আবার বিস্মিত হয়, এই ভেবে, তেলিঙ্গা সেনানায়কদের সামনে এ ধরনের আলোচনা বাদশাহ্ শুরু করতে চাইছেন কেন?

—হ্যাঁ, বাদশাহ্।

—একটি পত্র লিখলে চলবে না। অনেকগুলো লিখতে হবে। পত্র দিন পাতিয়ালার রাজাকে, পত্র লিখুন ঝাঝর, বল্লভগড, বাহাদুরগড আর আলোয়ারের রাজাকে। ওঁদের দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে যোগ দিতে লিখুন। আমি সই করে দেব।

হাকিমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কোনমতে বলে,—যে আজ্ঞে।

—হ্যাঁ, লিখবেন, তারা যেন দেশপ্রেমী সৈন্যদলে যোগদান করেন। কারণ ফিরিঙ্গিরা দিল্লী আক্রমণ করবেই। সেই আক্রমণ প্রতিরোধে আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজা এবং নবাবদের আহ্বান জানাতে চাই।

—আমি লিখে আনছি।

—অপেক্ষা করুন একটু। তার আগে আমি আর একবার স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই—স্বাধীনতা অর্জনই আমার লক্ষ্য, দেশবাসীর সর্বনাশ নয়। লুণ্ঠনে আমাদের স্বাধীনতা এগিয়ে আসবে না, আরও একশো বছর পেছিয়ে যাবে। হয়তো বা তার চেয়েও বেশি। আপনারা, বিশেষ করে মীরাট থেকে যাঁরা

এসেছেন, তাঁরা আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কি ?

বিদ্রোহীদের কয়েকজন দলপতি বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়। তারা বলে,—আমাদের অনেক গলদ। আপনি শুধরে নিন। যারা এখানে এসেছে তারা অত্যন্ত গরীব। স্বাধীনতা তারা চায়। সেই সঙ্গে এতদিনের নিয়মিত অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে ভেবে ভীত। অনিশ্চয়তা তাদের ঘিরে ধরেছে। তাই তাদের অনেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। আপনি তাদের পরিচালিত করুন। আর আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তাদের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করুন।

বাদশাহের নির্দেশে হাকিম সাহেব পত্র লিখতে চলে যায়। আর বাহাদুর শাহ্ রৌপ্য নির্মিত মসনদে বসে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা সিপাহীদের একের পর এক মস্তক স্পর্শ করেন।

অতি নিকটে দণ্ডায়মান ছিল বাদশাহের দুই পুত্র—সোহ্‌রাব-ই-হিন্দা ও বক্তিয়ার শাহ্। বাহাদুর শাহ্ তাদের বলেন,—রাম সহায় এবং দিলওয়ালী মলকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আজকের মধ্যেই যেন পাঁচশো টাকার ডাল এবং আটা পাঠায় সৈন্যদের জন্যে।

সোহ্‌রাব-ই-হিন্দা তখনি চলে যায়।

পাহাড়গঞ্জের থানাদার মহিরুদ্দিন খাঁ দেওয়ান-ই-খাসের পশ্চাতের সারিতে আসন গ্রহণ করেছিল। মন তার বিষণ্ণ। ফিরিঙ্গিদের নেক-নজরে পড়ে ইতিমধ্যেই তার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। হঠাৎ কী সব ঝামেলা। স্বাধীনতা না ছাই।

—মহিরুদ্দিন খাঁ।

কেঁপে ওঠে থানাদার। বাদশাহ্ স্বয়ং তাকে ডাকছেন। অত্যন্ত সংযত পদক্ষেপে সে বাদশাহের সামনে গিয়ে অভিবাদন জানায়।

—মহিরুদ্দিন, ফ্রেজারের কাছে তোমার প্রশংসা শুনেছি। আশা করি সেই প্রশংসা তুমি তোষামোদের দ্বারা অর্জন কর নি। তুমি যে বিদেশীদের পদলেহী নও, সত্যিই করিৎকর্মা ব্যক্তি, এবারে তার প্রমাণ দিতে হবে। তোমায় আমি দিল্লী নগরীর কোতোয়াল পদে উন্নীত করলাম। তোমার প্রধান কর্তব্য হবে নগরীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কোনরকম লুণ্ঠনের সংবাদ আর যেন না শোনা যায়।

—কিন্তু এরা যে লুণ্ঠন করতেই এসেছে বাদশাহ্। এদের কি আমি দমন করতে পারব ?

ক্রোধান্বিত বাদশাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে বলে,—শোন মহিরুদ্দিন, লুণ্ঠন করতে

যে এরা আসে নি, সেকথা তুমি ভালভাবেই জান। সুতরাং এ ধরনের আপত্তিকর কথা দ্বিতীয়বার যেন তোমার মুখ থেকে উচ্চারিত না হয়। যাও।

মহিরুদ্দিন কাঁপতে কাঁপতে আপন আসনে ফিরে যায়।

ঠিক সেই সময় শাহাজাদা উলুগ তাহের উত্তেজিতভাবে দেওয়ান-ই-খাসে প্রবেশ করে। কেউ লক্ষ্য না করলেও শাহাজাদা শেরশাহ ভ্রাতার দিকে চেয়ে বুঝতে পারে নতুন কিছু ঘটেছে, অত্যন্ত কৌশলে সে দরবারী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তাহেরের পাশে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে। দরবারে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা ঘোরতর অন্যায়। তাহার ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার সঙ্গে বাইরে আসে।

শেরশাহ প্রশ্ন করে,—কী ব্যাপার ?

—আরও একদল ফিরিঙ্গি খতম।

—কারা করল ?

সিপাহারা। ফিরিঙ্গিরা তাদের স্ত্রীলোকদের নিয়ে বারুদ-খানায় গিয়ে আত্ম-গোপন করেছিল। শয়তানের জাততো। ভেবেছিল বারুদের মাথায় ওদের দিকে কেউ কামান দাগতে পারবে না। তাতে বারুদ প্রজ্জ্বলিত হবে। অথচ এখন বারুদের খুবই প্রয়োজন।

—তারপর ?

—বিদ্রোহীদের ওরা এতদিনেও চিনতে পারে নি। বুদ্ধিতে সত্যই এরা কমতি নয়। করল কি জান ? দরিয়াগঞ্জ থেকে দুটো কামান এনে সেই কামানের মুখে পাথর বসিয়ে বারুদখানা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। দরজা ভেঙ্গে পড়ল। তখন ফিরিঙ্গিরা প্রাণভয়ে পাগলের মত ছুটল যমুনার দিকে। সিপাহীরা তাদের পেছু ধাওয়া করে একে একে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সাবাড় করে দিল। ওদের স্ত্রী ও শিশুর প্রতিও অনুকম্পা নেই, যদি তারা বিদেশী হয়। কারণ ফিরিঙ্গিদের হাতে ওদের স্ত্রীরা, বোনেরা আর মায়েরা নির্যাতিত হয়েছে। এই কথাই বলাবলি করছিল রক্তস্নাত তলোয়ার হাতে নিয়ে।

—বাদশাহকে সংবাদটা দিতে হয়।

—হ্যাঁ, চল।

বাদশাহ্ শুনলেন। তাঁর মুখের রেখায় কোনরকম পরিবর্তন দেখা গেল না। শুধু পুত্র উলুগ তাহেরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—দেশবাসীর যা মনোভাব তাতে তারা অন্যায় করে নি। নারীর গায়ে হাত দেওয়া পাপ, শিশু হত্যা মহাপাপ প্রভৃতি অনেক কিছুই আমরা জানি। কিন্তু আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ যদি ভেঙে

যায়, তখন বিবেকও লুপ্ত হয়! তোমার সম্মুখে তোমার পুত্রকে যদি কেউ হত্যা করে, তখন যদি হত্যাকারীর শিশুপুত্রকে তুমি পাও তা'হলে কী করবে? রক্ত-মাংসের মানুষ হলে তুমিও হত্যা করবে। যদি না কর, বুঝতে হবে তুমি কাপুরুষ কিংবা মহাপুরুষ। কিন্তু মহাপুরুষ এক লক্ষে একজনকে দেখাও দেখি? তাই বলে আমি বলছি না এ ধরনের হত্যায় কোনরকম বাহাদুরী রয়েছে। এ ধরনের কাজ করে যারা বাহাদুরী দেখায় তারা সত্যিই হীন। দিন আসছে—বাকি নেই বিশেষ। প্রস্তুত থাকো। ওরা আঘাত হানবে দিল্লীর ওপর। কিংবা আমাদেরই আগে গিয়ে আঘাত হানতে হবে ওদের ওপর। সেদিন যদি তোমরা ওদের নিশ্চিহ্ন করতে পার, বুঝব, হিন্দুস্থানের শের তোমরা।

নিষ্প্রভ তাহের এবং শেরশাহ্ দরবারে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করে। তাদের অবস্থা দেখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জহীরুদ্দিন ওরফে মীর্জা মুঘলের মুখে একটা ফিঁকে হাসির তরঙ্গ খেলে যায়।

বাদশাহ্ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন,—খুব দ্রুত আমাদের সংগঠনের কাজ শেষ করতে হবে। মীরাট থেকে যারা এসেছে এবং আরও যারা আসছে তারা শৃংখলার গণ্ডী ভেঙ্গে চলে আসায় অসংযত হয়ে উঠেছে। তাই যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে যথেচ্ছাচার শুরু করেছে। তাদের এবং আমার নিজের বাহিনীকে স হত করতে হবে।

জীবনলাল এতক্ষণে একটি কথাও বলে নি। কাল সারারাত তার দুশ্চিন্তায় কেটেছে। সর্বদা শঙ্কিত ছিল যে তার লিখিত পত্র হয়তো বিদ্রোহীদের হাতে পড়বে। এখন সেই দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। পত্রবাহক এতক্ষণে এদের নাগালের বাইরে। তাই রাত্রি জাগরণের অবসাদ তাকে এখন চেপে ধরে। হাই ওঠে ঘন ঘন। বার বার হাতের আড়ালে ঢাকা দেয়।

বাদশাহ্ দ্রুত কাজ করতে বদ্ধপরিকর দেখে সে বলে,—আরও কিছুদিন দেখলে হয় না বাদশাহ্। অনেকেই তো আসে নি এখনো।

—না। এখনি আমি সিপাহশালার থেকে শুরু করে মোটামুটি উচ্চপদস্থ সেনানায়কদের নির্বাচিত করে ফেলতে চাই। সেইভাবে সেনাদল ভাগ করে দেব। তা'হলে প্রতিটি সেনাদলের দায়িত্ব সেনানায়কদের ওপর বর্তাবে।

মুকুন্দলাল বলে,—আপনি যথার্থ বলেছেন জাঁহাপনা। শৃংখলা রক্ষা করতে এটাই সর্বোত্তম পথ।

জীবনলাল মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা যাতে আরও লুটপাট করে নগরবাসীদের মন বিষিয়ে তোলে সেজন্যে সে অতি গোপনে তার তিন বন্ধু লীলা

ঘাম লাল, লালা নিশীলাল এবং লালা সন্তানলালকে নিয়োজিত করেছে। বন্ধুরা প্ররোচনা দিয়ে তেলিঙ্গাদের আরও উত্তেজিত করে তুলবে।

বাদশাহ্ বলেন,—কাল থেকেই একটি বিষয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। মারাটকে ওইভাবে ফেলে আসা উচিত হয় নি। কারণ দিল্লী আক্রমণের সব কিছু আয়োজন ওখানেই করা হবে।

একজন বিদ্রোহী নায়ক বলে,—ওখানে সব সাফ্ করে দেওয়া হয়েছে জাঁহাপনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—সাফ্ করেছ বটে। কিন্তু আবার আসতে বিলম্ব হবে না। ওদের অন্যান্য সামরিক শিবিরে এতক্ষণে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। যা হোক, যা হবার হয়েছে। এখন প্রয়োজন একজন যোগ্য সিপাইশালার।

সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে। কে হবে নতুন সেনানায়ক?

বাদশাহ্ ডাকেন,—কুরে সিং।

বিদ্রোহী কুরে সিং দণ্ডায়মান হয়।

—আপনার নাম আমি যথেষ্ট শুনেছি এর মধ্যেই। আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন?

বিনীত কুরে সিং বলে,—বাদশাহ্, আমি নিজে লড়াই করে থাকি। দুশো চারশোজন সঙ্গী পেলে তাদের পরিচালিতও করতে পারি। তাই বলে সমস্ত ফৌজের প্রধান হবার মত হিম্মত আমার নেই। থাকলে আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য করতাম। কিন্তু আমি দলনায়ক হলে মুক্তিফৌজের ক্ষতিই হবে।

সেই সময়ে বিদ্রোহী ফৌজের অপর একজন দাঁড়িয়ে বলে,—আমি একটি প্রস্তাব করি বাদশাহ্, যদি আপনি অনুমতি দেন।

—বলুন।

—শাহাজাদাদের মধ্যে থেকেই আপনি সমর-নায়কদের নির্বাচিত করুন। তাঁরা হয়তো স্বহস্তে যুদ্ধ করেন নি কখনো। কিন্তু তাঁদের দায়িত্ববোধ হবে অনেক বেশি।

—না। এ অবাস্তব প্রস্তাব। সম্মুখ রণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সমরনায়ক হওয়া অসম্ভব।

—কিন্তু জাঁহাপনা, যুদ্ধ করব আমরা। আমাদের পরিচালনার জন্য প্রতিটি দলে মোটামুটি একজন করে সেনাপতি রয়েছেন। তাই এতে অসুবিধা হবে না কোন।

উপস্থিত সবাই সমস্বরে তাকে সমর্থন করে।

বাদশাহ্ বলেন,—একটু চিন্তা করে দেখলে তোমরা দেখবে, এটা বিজ্ঞোচিত হল না।

কুরে সিং বলে,—কিন্তু এতখানি দায়িত্ব নেবার মত কেউ যে আপাততঃ আমাদের মধ্যে নেই বাদশাহ্।

সেই সময়ে মুকুন্দলাল বলে,—ওঁদের যুক্তি অগ্রাহ্য করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে বাদশাহ্।

—হাকিম সাহেবের কী অভিমত? বাদশাহ্ প্রশ্ন করেন।

—মুকুন্দলাল ঠিক কথাই বলেছেন। তা'ছাড়া সম্মুখ সমরের অভিজ্ঞতা না থাকলেও শাহাজাদারা মহান মুঘলবংশের সন্তান। তৈমুরের রক্ত এঁদের ধমনীতে। প্রকৃত সময়ে এঁরা নিজেদের যোগ্যতা নিশ্চয়ই প্রমাণ করবেন।

একটু হেসে বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ বলে ওঠেন,—হাকিম সাহেব, আপনার এই ব্যাধিতে আমিও বহুদিন ভুগেছি। রক্তের দোহাই দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায় এবং সেই উচ্ছ্বাস সহজেই অধিকাংশ মানুষের মনকে স্পর্শ করে। কিন্তু আসলে এর কোন মূল্য নেই। পিতাপিতামহের দোষগুণ লাভেব একটা প্রবণতা থাকে বটে বংশধরদেব মধ্যে কিন্তু সেটা নির্ভর করে অভ্যাস আর নিষ্ঠাব ওপর।

লালপর্দা নীরব।

সেই সমস্ত জোর করে স্তব্ধতা ভেঙে গুলাম আব্বাস বলে উঠে—তবু ফৌজের তরফ থেকে যে যুক্তি দেখান হয়েছে তার যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে।

বাহাদুর শাহ্ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন,—বেশ, যতদিন যোগ্য কাউকে না পাওয়া যায়, ততদিন শাহাজাদাদের ভেতর থেকেই আমি সিপাহ্‌শালার নির্বাচন করছি। কিন্তু একথা স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি যে, যে-মুহূর্তে যোগ্য কারও সন্ধান পাওয়া যাবে, সেই মুহূর্তে এখনকার সিপাহ্‌শালার পদত্যাগ করবে এবং নতুন সেনাপতির সহকারী হবে।

শাহাজাদারা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

বাদশাহের নির্বাচনে সিপাহ্‌শালারের পদ পেল মীর্জা মুঘল বা জাহীরুদ্দিন। কারণ কেউ-ই যখন অভিজ্ঞ নয়, তখন জ্যেষ্ঠপুত্রকে তার মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মীর্জা কোচক সুলতান মীর্জা খয়ের সুলতান, মীর্জা মেধু পদস্থ সেনানায়ক পদে নিযুক্ত হল। পৌত্র মীর্জা আবুবকরকেও দেওয়া হল একদল সেনার কর্তৃত্বভার।

—সিপাহ্‌শালার। বাদশাহ্ আহ্বান করেন।

মীর্জা মুঘল বাদশাহের সামনে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানায়।

বাদশাহ্ বলেন,—তুমি আমার পুত্র। কিন্তু সিপাহশালার হিসাবে প্রতিটি কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন না করতে পারলে জবাবদিহি দিতে হবে। কোতোয়াল মহিরুদ্দিনকে বলেছি. তোমাকেও বলছি, নগরীতে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে, তা বন্ধ করবার ব্যবস্থা কর। কারণ তোমারই সিপাহীরা না বুঝে এই হঠকারিতায় মেতেছে। শোন, আমার অশ্ব হম্‌দম্‌কে প্রস্তুত রেখো। আমি নিজেই বার হব আজ।

—হম্‌দমে চাপলে আপনার কষ্ট হবে। শরীর শুনেছি কয়েকদিন সুস্থ নয় আপনার। বরং আপনার হস্তী মৌলা বক্‌স্‌কে তৈরি রাখতে বলি।

—বেশ, তাই বল। কিন্তু তার আগে তুমি নগরীর প্রতিটি সড়কে যাও। ঘোষণা কর লুণ্ঠনের কাজে যারা ধরা পড়বে তাদের নাক কান কাটা যাবে সামরিক বিচারে। সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করে যে, যেসব ব্যবসায়ী উচিত মূল্যে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য দিতে অস্বীকার করবে তাদের জন্যে কারাগারের দ্বার অবারিত।

মীর্জা মুঘল দরবার কক্ষ ত্যাগ করে।

—হাকিম সাহেব।

—বাদশাহ্।

—আমার নামে ঘোষণা করে দিন, আজ থেকে হিন্দুস্থানে গো-বধ নিষিদ্ধ।

আসাদুল্লা খাঁ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে বলে,—বাদশাহ্, এটা কি উচিত হবে? মানে, মৌলবীদের পরামর্শ ব্যাতিরেকে—

—রাজনীতি অনেক সময় সংস্কারকে ত্যাগ করে চলে হাকিম সাহেব। মৌলবীদের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন নেই।

হাকিম আসাদুল্লা কম্পিত-বক্ষে বাদশাহের হুকুম তালিম করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। বৃদ্ধ হয়েছে হাকিম। সে জানে অনেক সময় প্রথাকে সব ধর্মের মানুষই ধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিশ্বাস করে নেয়। সেই প্রথা সহসা তুলে দিতে চাইলে আলোড়ন ওঠে। এই সন্ধিক্ষণে সেই ধরনের আলোড়নের সম্ভাবনা সময়োচিত হল কিনা সে বুঝতে পারে না। কারণ সে জানে না সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে সারা দেশে যদি কেউ সক্ষম হন তিনি স্বয়ং বাদশাহ্। সময়ের নাড়ীজ্ঞানে তাঁর জুড়ি নেই—যদিও রোগীর নাড়ীজ্ঞানে হাকিম সাহেব অদ্বিতীয়।

ঘটনা-স্রোত দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে বাদশাহের নাম নতুন স্বর্ণ-মুদ্রা বাজারে চালু হল। তার ওপর খোদিত রইল—

বাজার জাদ সিক্কা নাসরাত তারাজি
সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌ গাজী।

কিন্তু টাকশাল থেকে নতুন চকচকে মোহর বার হয়ে এলেও দিল্লীর অশান্তি কমল না। বিশ্বাসঘাতক দেশবাসীর গুপ্তচরবৃত্তি বৃদ্ধি পেল। তারা সরল গ্রাম্য বিদ্রোহী সেনানীদের চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বার বার উসকানি দিতে থাকে। সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব কৌশলে নগরীর প্রতি মুহূর্তের খবর প্রেরণ করতে লাগল ফিরিঙ্গিদের কাছে। ফলে প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় বিদেশীদের।

মীর্জা মুঘল বাদশাহের কাছে অভিযোগ করে, নবনিযুক্ত কোতোয়াল মহিরুদ্দিনের কার্যকলাপ খুবই সন্দেহজনক। তার বাহিনী লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত সিপাহীদের কাজে বাধা না দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে বলে কোতোয়ালের হুকুম নেই হস্তক্ষেপ করবার।

মহিরুদ্দিনকে বরখাস্ত করা হল।

বাদশাহ্‌ আলোয়ার থেকে ডেকে পাঠালেন বিজ্ঞ মৌলবী ফজল হককে। ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় তার বরাবরের উৎসাহ। কতবার এসে সে বাদশাহ্‌কে প্রেরণা দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কখনো তাকে কাজে লাগাবার কথা বাদশাহ্‌ ভাবেন নি। এবারে ভাবতে হল। ফজল হককে দিয়ে শাসন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করা চলতে পারে। হাকিম আসানুল্লাকে বাদশাহ্‌ শ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ। তা'ছাড়া সম্ভবতঃ বার্ধক্যের জন্যে সে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রচলিত সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে রীতিমত দ্বিধাবোধ করে। অথচ এখন প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান। বাদশাহ্‌ স্বচক্ষে সেই মূল্যবান সময়ের অপচয় দেখতে থাকেন, অথচ করবার কিছুই নেই। তিনিও বৃদ্ধ। উদ্যম তাঁর যৌবনোচিত, অথচ দেহ তত সচল নয়। এর প্রমাণ পেয়েছেন একদিন দীর্ঘ সময় অশ্ব হম্‌দমের পৃষ্ঠদেশে অতিবাহিত করে। হস্তী মৌলা বকস-এর ওপরে না বসে ভেবেছিলেন অশ্বারূঢ় অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবেন নগরবাসীর মধ্যে, যেখানে এখনো সিপাহীরা জোরজুলুম চালাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করলেন যখন মুসম্মান বারজ্‌-এ অনুভব করলেন সর্বশরীরে বেদনা। বুঝলেন সেদিন আর নেই, যখন সহস্র অশ্বের ভেতর থেকে সাচ্চা বংশের আরবী-ঘোড়া বেছে নিয়ে তিনি তাকে শিক্ষা দিয়ে অসাধারণ বাহনে পরিণত করতে পারতেন—যেমন করেছেন হম্‌দম্‌কে কিছুদিন আগেও।

পুত্রেরা তেমন হতে পারল না। সুযোগও পায় নি। পেলেও সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। তাই জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা মুঘল সিপাহশালার হলেও তার ওপর

ভরসা করা যায় না। সে আগ্রহী হলেও এতবড় দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা তার নেই। এই সময় যদি কোন সুযোদ্ধা রাজা কিংবা অন্য কেউ এসে দায়িত্বভার নিত বড় ভাল হত। দরবারে এসে যোগদান করবার জন্যে সে সমস্ত রাজাদের বার বার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা আসে নি। পত্রের জবাব দেবারও প্রয়োজন বোধ করে নি তারা। কোনদিনই আসবে না। কারণ ওরা পশ্চিমী জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছে। তবু আজ একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে, যাতে কালাপানির পরপারের দেশের কুহকিনীর ফাঁদ থেকে ওদের উদ্ধার করা যায়। তাই আবার তিনি পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিংহ, ঝিন্দের নপরপতি, জয়পুরের নৃপতি এবং আলোয়ার, ঝাঝার, প্রভৃতি রাজ্যেও তাঁর বিশেষ দূত প্রেরণ করেন। অত্যন্ত সংযত এবং বলিষ্ঠ ভাষায় লিখলেন যে, অর্থ দিয়ে, সৈন্য দিয়ে এবং নেতৃত্ব দিয়ে দেশের এই সংগ্রামকে তাঁরা যদি সাফল্যের পথে এগিয়ে না নিয়ে যান তা'হলে ফিরিঙ্গিমুখাপেক্ষী পোষা কুকুরের মত তাঁদের বংশধরদের জীবন কাটাতে হবে।

তবু সাড়া এলো না। সাধারণ মানুষ যখন সিপাহীদের অজ্ঞানতাপ্রসূত অত্যাচার সত্ত্বেও এগিয়ে আসতে শুরু করল তখন রাজা মহারাজারা কম্পিত বক্ষে ফিরিঙ্গিদের পায়ের কাছে বসে তাদের সান্ত্বনা দিল, অনাহারী মুখের কাছে খাবার এগিয়ে নিয়ে ধরল।

কিন্তু দিল্লীর পত্র-পত্রিকার ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌরবময়। তারা সক্রিয়-ভাবে বাদশাহ্‌কে সাহায্য করতে শুরু করল। 'দেহলি উর্দু আকবর' 'সাদিকুল আকবর' 'সিরাজুল আকবর', প্রভৃতি পত্রিকা লিখল যে, ফিরিঙ্গিরা দেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের ধোঁকা দেবার জন্য নানা মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে। তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। ভেবেছ যে সমগ্র দেশ যদি দিল্লীর ঘটনা জানতে পারে তাহলে এক ফুৎকারে তারা বিলীন হয়ে যাবে। তাই লখনৌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরের রাস্তায় তারা লিখেছে, "মুষ্টিমেয় কয়েকজন শয়তান শুধু বিদ্রোহী হয়েছে। অচিরেই তাদের ঠাণ্ডা করা হবে।"

পত্রিকাগুলি আরও লিখল, "ফিরিঙ্গিরা গুপ্তচরের জাল-বিস্তার করেছে দিল্লী নগরীতে। কেল্লার মধ্যে অবধি তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এটাও বিচিত্র নয় যে, বাদশাহের বিশ্বাসভাজনদের মধ্যেও হয়তো তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। তারা সূক্ষ্ম কাগজে এখানকার সংবাদ লিখে অহরহ পাচার করছে। প্রেরিত কাগজগুলি পাদুকা, লাঠি ইত্যাদির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরা পড়েছে অনেক। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।"

বাদশাহের মর্যাদা জনসাধারণের সম্মুখে আরও উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে পত্রিকাগুলি তাঁকে 'হজরৎ জিল্লে সুভানি,' 'সাহেব কিরানি,' 'খালিফাতু-র-রহমানী' ইত্যাদি নতুন নতুন উপাধি দ্বারা সম্বোধন করল।

সেই সময় একদিন বিদ্রোহী কুরে সিং যাটজন ফিরিঙ্গি নরনারীকে এনে লাল-পর্দায় বাদশাহের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। ভয়ে বন্দী রমণীরা ক্রন্দন করছিল, পুরুষদের মুখ শুষ্ক।

—এদের এখানে কেন উপস্থিত করেছ কুরে সিং?

—আপনার অনুমতির জন্য।

—কিসের অনুমতি চাও?

—এদের হত্যা করবার।

—প্রতিদিন যত হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি আমার অনুমতির জন্যে তা স্থগিত থেকেছে?

—না। তবে একসাথে এত বিদেশী কয়েকদিন পাই নি।

—তোমার বোঝা উচিত ছিল বন্দী হিসাবে আমার সামনে কাউকে উপস্থিত করলে নির্বিচারে হত্যা করবার আদেশ আমি দিতে পারি না। বিশেষ করে বন্দীদের মধ্যে যদি মহিলা থাকে। আমি এদের কেল্লায় অবরুদ্ধ রাখতে আদেশ দিচ্ছি।

—কিন্তু এদের রক্ত প্রতিটি সিপাহী দেখতে চায় জাঁহাপনা।

—রক্ত দেখতে হলে, তার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। রক্ত দেখার সাধ মেটাবার সেটাই প্রকৃষ্ট স্থান—দরবার কক্ষে আনীত নিরস্ত্র নরনারীর রক্ত নয়, জীবনলাল।

—জাঁহাপনা।

—এদের অবরুদ্ধ রাখবার ব্যবস্থা কর।

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন জাঁহাপনা।

—ঈশ্বর কি করবেন, না করবেন তার জন্যে তোমার অতটা উদ্‌গ্রীব হবার প্রয়োজন নেই। যা বলছি কর।

জীবনলাল খুশিমনে বন্দীদের নিয়ে স্থানত্যাগ করে। কুরে সিং একবার ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে বন্দীদের দেখে নিয়ে দরবার ত্যাগ করবার উদ্যোগ করে।

—কুরে সিং।

—বাদশাহ্।

—তোমরা বিদ্রোহী। অত্যাচার থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে বিদ্রোহের জন্ম।

সেই ঘৃণার আগুনে আহুতি দিতে পারা যায় প্রতিটি ব্যক্তিকে যাকে সঠিক ভাবে জানি শত্রু বলে। তার জন্যে অনুমতির প্রত্যাশায় থাকতে নেই। ভবিষ্যতে কথাটা মনে রেখো।

—আমার ভুল হয়েছিল বাদশাহ্। আপনার উপদেশ আমার মর্মে মর্মে গেঁথে থাকবে।

—হ্যাঁ, মনে রেখো, ফিরিঙ্গিদের একটি প্রাণও যদি কোথাও অবশিষ্ট থাকে তবে সেটিও আমাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। নিশ্চিহ্ন কর। স্মরণে রেখো, এই অবস্থায় যদি ওরা তোমায় কখনো পায় তা'হলে দয়া প্রদর্শন করবে না।

—আপনি ওদের আমার হাতে দিন।

—না, আমি বিদ্রোহী। কিন্তু বাদশাহ্ হিসাবে হিন্দুস্থানের দাবি আমি কখনই পরিত্যাগ করি নি। তোমরা ওদের কোন শিবিরে নিয়ে যাও নি, নিয়ে এসেছ দেওয়ান-ই-খাসে—যা হলো ন্যায়বিচারের প্রতীক। তাছাড়া এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য আমায় দুর্বল করেছে মুহূর্তের জন্যে। আমি চেষ্টা করছি সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। তারপর প্রকৃত বিচার করতে পারব। আমি জানি, আজ এদের গুলি করে হত্যা করার আদেশ দিলে ন্যায়বিচার হত। শোন কুরে সিং, শোন সবাই নিজেকে যতই আমি প্রগতিশীল বলে ভাবি না কেন, একটা প্রাচীন বংশের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপানো রয়েছে। তোমরা সাহায্য কর আমায় সেই বোঝা থেকে মুক্ত হতে।

বহুদিন পর বাদশাহ্ হজরৎ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় এসে উপস্থিত হন। প্রায় এক পক্ষকাল তিনি এ-পথে আসতে পারেন নি।

গুলাম হাসান এগিয়ে এসে বাদশাহ্‌কে অভ্যার্থনা করে। তার মুখে হাসি ধরে না। বাদশাহ্ একটু বিস্মিত না হয়ে পারেন না, কারণ হাসান স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

প্রশ্ন করেন,—কী ব্যাপার ?

—আবার কাল শুনতে পেয়েছি বাদশাহ্।

—কী ?

—তাঁর কণ্ঠস্বর। সকালবেলা তখন বাইরে সিপাহীদের কলরব—একদল ফিরিঙ্গির আর্তনাদ। তার মধ্যে সহসা সেই গম্ভীর-মধুর কণ্ঠস্বর। সেই স্বরে কী যে আছে বোঝাতে পারব না। তিনি বললেন,—হাসান, সময় এগিয়ে আসছে। প্রস্তুত থাকো—মনকে পবিত্র কর।

—কীসের সময় হাসান? খুদাতাল্লার এ কীসের ইঙ্গিত। তুমি কি অনুমান করতে পারছ কিছু?

—না বাদশাহ্ শুধু এইটুকু বুঝতে পারি একটা অসামান্য কিছু গ্রহণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে বলছেন।

—অসামান্য! তবে কি ফিরিঙ্গি-মুক্ত হিন্দুস্থানের কোন গুরুদায়িত্ব?

—না না। তা কেন হবে? ধর্মের বাইরে কোন ব্যাপারে তো আমার কোন আগ্রহ নেই।

—তুমি একটা অনুরোধ রাখবে আমার হাসান? তাঁকে শুধু তুমি একটি প্রশ্নই করবে, হিন্দুস্থানকে ফিরিঙ্গি-মুক্ত কবে করতে পারব। যদি তিনি বলেন, অচিরেই, তবে আমি মুক্তি পাব। এই বৃদ্ধ বয়সে সব কিছু দেখাশোনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। স্বাধীন হিন্দুস্থানের মানুষ তাদের শাসনভার নিজের হাতে নিক। তখন আমি তোমার পাশটিতে নিশ্চিন্তে এসে দাঁড়াতে পারব। এই পবিত্র স্থানে অতিবাহিত করতে পারব জীবনের বাকি কয়টি দিন।

—বিধাতা কি সেই দিনেরই কথা বলছেন!

—জানি না। তাঁর ইচ্ছা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আজ চলি হাসান।

—এত তাড়াতাড়ি?

—হ্যাঁ, একটা জিনিস মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। মীরাট আমার মনের ওপর পাষাণ-ভার চাপিয়ে রেখেছে। এ পর্যন্ত সেখানে একদল সেনা পাঠাতে পারলাম না। আমার পুত্রেরা সেনাপতি। তারা এড়িয়ে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। ভাবছি, দু'জন গুপ্তচর পাঠিয়ে ওখানকার সংবাদ জেনে নেব। হাসান, আজ আমি বৃদ্ধ। নইলে মীরাটে অভিযান চালাতে কারও মুখাপেক্ষী হতে হত না। আমি একটু আশংকিত না হয়ে পারছি না। কারণ দেশবাসী যাকে মুক্তিফৌজ হিসাবে দেখছে, তারা অনুশীলনের অভাবে আলস্য গা ঢেলে দিয়েছে। কুচকাওয়াজ বন্ধ হয়েছে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ওদের সিপাহ-শালার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার যোগ্যতা তার নেই। কেন নেই জান? সে মুঘল বংশোদ্ভূত বলে। তার পেছুটান রয়েছে। অথচ জেনেশুনেও তাকে আমি সরিয়ে দিতে পারছি না। এতে কি প্রমাণ হয় হাসান?

—কী?

—প্রমাণ হয়, নবাব বাদশাহদের যতই সদিচ্ছা থাকুক, সাধারণ মানুষের মঙ্গল তারা করতে পারে না। কারণ তারা কখনও নিজেদের সাধারণ বলে ভাবতে

পারে না। শত চেষ্টাতেও নয়। এইটিই আমার সর্বপ্রধান দুর্বলতা।

বাদশাহ্ নিজেই শালিমগড় পরিদর্শনে গেলেন একদিন। সেখানকার চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখে ক্রোধান্বিত হলেন। তারপর নিজেই শালিমগড়কে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করলেন। এদিকে মীরাটে যে দুইজন চরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসে যে সংবাদ দিল তাতে বাদশাহের আশংকাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। তারা এসে বলল, হাজারখানেক ফিরিঙ্গি সেনা মীরাটের সদর বাজারে জমায়েত হয়েছে। তারা তাদের চতুর্দিক্ কামান হস্তী ইত্যাদির দ্বারা সুরক্ষিত করে তুলেছে।

বাদশাহ্ শেষ-বারের মত রাজন্যবর্গকে সাহায্য প্রেরণের জন্য পত্র লিখলেন। তিনি দোখানার হাসান আলি খাঁকে নির্দেশ দিলেন পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী সংগ্রহ করতে। মীরাট অভিযানের জন্য অর্থ সংগ্রহও শুরু হল।

দেওয়ান-ই-খাসে বসে বাদশাহ্ প্রকাশ্যে সিপাহশালারকে বললেন,—অবিলম্বে মীরাটে অভিযান চালাও।

মীর্জা মুঘল কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বলে,—ফিরিঙ্গিদের আমি অবশ্যই নিঃশেষ করতে পারি। কিন্তু আরও কয়েকজন আমীরের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন। তারা হল মীর্জা আমিনুদ্দিন খাঁ, মীর্জা জিয়াউদ্দিন খাঁ ও হাসান আলি খাঁ।

যাদের নাম উল্লেখ করেন মীর্জা মুঘল তারা সবাই লালপর্দায় উপস্থিত। অথচ কারও কাছ থেকে সাড়া মিলল না। ক্রোধে কাঁপতে থাকেন বাদশাহ্। সম্মুখে মুক্তিফৌজের সেনারা। তারা একজনকে চায় শুধু, যে তাদের চালিত করবে। যুদ্ধ তারাই করবে। সংকোচে বাদশাহ্ মূক।

শেষে পৌত্র আবুবকরকে তিনি বলেন,—তোহার বয়স এখন উনিশ কিংবা কুড়ি। এই বয়সে আমরা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতাম, তোমাকেই যেতে হবে।

—আমি প্রস্তুত।

বাদশাহ্ মহবুব আলি খাঁ এবং হাকিম আসাদুল্লা খাঁকে প্রয়োজনীয় রসদ ও অর্থের ব্যবস্থা করতে বললেন।

আবুবকর যাত্রা শুরু করল দু'দিনের মধ্যেই। বাহিনী এগিয়ে চলল মীরাট অভিমুখে। ওদিকে মীরাটে ফিরিঙ্গি সৈন্য বৃদ্ধি পেয়ে একহাজার থেকে সতেরোশোতে দাঁড়িয়েছে। তারা হিন্দন নদীর সেতুর মুখে কামান স্থাপন করেছে।

এগিয়ে চলে দেশপ্রেমী ফৌজ। মনে তাদের অদম্য উৎসাহ। ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই তাদের প্রথম লড়াই। দূরের কামানশ্রেণী তারা দেখতে পেয়েছে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

আবুবকর হুকুম দেয়,—থামো।

বিস্মিত হয় বাহিনী। এই সময় দাঁড়িয়ে পড়ার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু কে বোঝাবে একজন অনভিজ্ঞ তরুণকে—যে প্রাণের তাগিদে নয়, বিদেশী নিষ্পেষণের জ্বালা সম্যক অনুভব করেও না—নিতান্ত কৃতিত্ব দেখাবার মোহে এগিয়ে এসেছিল বাদশাহের সামনে।

ফিরিঙ্গিরা যখন বাদশাহী সৈন্যের বিশালত্ব দেখে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল সেই সময় হঠাৎ তাদের থেমে পড়তে দেখে বুঝতে পারে, নেতৃত্বে কিংবা অন্য কিছুতে এদের রয়েছে এক বিরাট দুর্বলতা। তাই ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তারা কামান দাগতে শুরু করে।

আবুবকরের নিষেধ অমান্য না করেও দেশী বাহিনী কামান দাগে এবং আবুবকরকে অনেক বুঝিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসে। ফিরিঙ্গিরা কম্পমান। তবু তাদের রক্ষা করতে থাকে সাময়িকভাবে। শেষে তাদের চাপাব্যূহ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়।

ঠিক সেই সময়ে তাদের নিক্ষিপ্ত একটি গোলা গিয়ে পড়ে আবুবকরের কাছাকাছি একজন সৈন্যের ওপর। তার দেহ ছিন্নবিন্ন হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। এত কাছ থেকে এ ধরণের মৃত্যু আগে কখনো দেখে নি তরুণ সেনাপতি। ভাবে, ফিরিঙ্গিরা এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে সে।

বিস্মিত হয় তেলিঙ্গারা জয় করায়ও। ফিরিঙ্গিদের অর্ধেক হতাহত। এ সময়ে যুদ্ধ পরিহার করার অর্থ আবার ওদের মীরাটে ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া। অথচ আবুবকরকে স্থান ত্যাগ করতে দেখে গোলন্দাজরা দিশেহারা হয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য। সেই মুহূর্তটুকুর সুযোগ গ্রহণ করে ফিরিঙ্গিরা মরিয়া হয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। দেশী সৈন্যেরা পশ্চাদপসরণ করে।

ভাগ্যের পরিহাস বলতে হবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অস্ত্রযুদ্ধে এই বিশাল ভূখণ্ড থেকে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির সাহায্য মিলল না, যে অতি সহজে বিদেশী-শক্তির মূলোৎপাটন করতে পারত। পরিবর্তে প্রথম যুদ্ধ পরিচালনার ভার পড়ল এমন একজন নাবালকের ওপর যে আগে কখনো যুদ্ধক্ষেত্র দেখে নি।

বাদশাহ্ আবুবকরের বড় বড় কথায় বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হলেন না। তীব্র মর্মবেদনায় তিনি মন্তব্য করলেন,—প্রথম যুদ্ধেই আমাদের পরাজয়।

শুধু পরাজয় হলেও কথা ছিল। এই একটি যুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানের সামগ্রিক ফলাফল যেন প্রতিবিম্বিত হল, বুদ্ধিজীবীরা এবং স্বার্থ সর্বস্ব মানুষেরা ফিরিঙ্গি শিবিরে ভীড় করল। অবশিষ্ট যারা অভ্যুত্থানে অনুপ্রাণিত হল তারা যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যারা জানে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করল শুধু। তাছাড়া হিন্দন নদীর যুদ্ধ আতংকিত এবং অসহায় ফিরিঙ্গিদের হৃদয় নব বলে বলীয়ান করে তুলল। তারা হিন্দন ছাড়িয়ে অগ্রসর হল—এগিয়ে এল সালিমপুরে। সেখান থেকে গাজিউদ্দিন নগরে।

বাদশাহ্ বুঝলেন তাঁর আশংকাই সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি সংবাদ পেলেন যে, পাতিয়ালার কাছে মাথা কুটেও সাহায্য মেলেনি, সেই পাতিয়ালা দুই অঞ্জলি ভরে ফিরিঙ্গিদের সাহায্য করছে। তার সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক দেশবৈরী রাজা মহারাজা।

কোথা থেকে যেন আজানধ্বনি ভেসে আসে। জামী মসজিদ থেকে কি? হতে পারে। খুদাতাল্লার অভিপ্রায় হলে মক্কা থেকেও আজানধ্বনি কর্ণগোচর হয়। দরগার গুলাম হাসান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, তার চিত্তে এতটুকু মলিনতা নেই। তাই সে আল্লার নির্দেশ স্বকর্ণে শুনতে পায়। আল্লা তাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন কিসের জন্যে?

দূরে কোন মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। অস্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে ভাসতে ভাসতে আসছে।

নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয় বাহাদুর শাহের। শয্যা ছেড়ে এই ভর সন্ধ্যায় উঠতে ইচ্ছে হয় না। পুত্র মীর্জা মুঘলকে একটি পত্র লিখে, সেটি পাঠিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। পত্রে লিখেছেন:

এখনো শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনো সেনাদলে। প্রতিটি সেনা যদি মনে করে যে দেশের মঙ্গলের জন্যে সে লড়তে এসেছে তবে তাকে লুণ্ঠন বন্ধ করতে হবে। ফিরিঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে, এই অছিলায় লাহোর ফটক এবং কাশ্মীর ফটকের সেনাবাস থেকে অস্ত্রহাতে ছুটে এসে আমার প্রজাদের আবাসগৃহে প্রবেশ করে লুণ্ঠন করা চলবে না।

এছাড়াও দীর্ঘ পত্রে আরও অনেক কিছু লিখে ক্লান্ত বাদশাহ্ বসে থাকেন। হিন্দনের পরাজয়ের পর মনটা বড় খারাপ হয়ে থাকে। দ্রুত সংগঠিত করতে হবে সেনাদলকে, নইলে পরাজয় অনিবার্য। একসময়ে তাঁর মনে অন্তধরনের হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ভাবতেন দেশের সেনা এবং কৃষকদের বিদ্রোহ

বুঝি তাঁর জীবনকালে কখনো হবে না। তাই দুঃখ করে তিনি লিখেছিলেন :

কফন পহন কর্ জিন্দেগী কে আইয়াম
কিসি বাগ্ মে গুজার দুংগা।

কিন্তু আজ দেশবাসী বিদ্রোহী। আর সমস্যা অন্য ধরনের। সরল বিদ্রোহীদের বিপথে চালিত করছে শয়তানের দল।

জিন্নৎ বেগম প্রবেশ করে। বাদশাহের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁর মস্তকে একটি হাত রেখে বলে,—আজ না হয় বিশ্রাম নিলে।

—বিশ্রাম। একবার শত্রু শিবিরে যদি যেতে পারতে দেখতে কী তৎপরতা চলেছে সেখানে। স্বচক্ষে না দেখলেও বুঝতে পারছি আমি। অথচ এখানে দেখ, ঠিক ভিন্ন চিত্র। তুমি একসময়ে ইঙ্গিতে বলেছিলে তোমার গর্ভজাত সন্তান জওয়ান বখত্‌কে পরবর্তী বাদশাহ হিসাবে নির্বাচিত করতে। সেই সময় ফিরিঙ্গিরা রাজি হয় নি। ভালই করেছিল। কোথায় জওয়ান বখত্? কী তার যোগ্যতা? একবার প্রমাণ করুক।

—যোগ্যতা কোন শাহাজাদারই সম্ভবতঃ নেই।

—সত্য। কিন্তু কার ওপর নির্ভর করব বলে দিতে পার? ফিরিয়ে দিতে পার আমার সেই আগের দিনের যৌবনকে? তা'হলে কারও সাহায্য চাইব না।

জিন্নৎ বেগম নীরব। বাদশাহের মর্মব্যথা তার অজানা ছিল না।

বাদশাহ্ বলেন,—জিন্নৎ, একথা আমার অজানা নয় যে স্বাধীনতা কখনো মসৃণ পথে আসে না। কিন্তু কখনো চিন্তা করি নি যে হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজাদের একজনও আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেন না। যার-যা আসছে তাতে বুঝতে পারছি একমাত্র নানা সাহেব আর ঝাঁসির রানী, তাঁতিয়া টোপী এবং অন্যান্য কয়েকজন মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমী ব্যতীত সবাই ওদের দিকে।

—কেউ না আসুক, তুমি তো রয়েছ। তুমিই একদিন শ্যার লিখে আমাকে শুনিয়েছিলে, কেউ যদি চলার পথের সঙ্গী না হয়, তখন একা এগিয়ে চলতে হয়।

—ভুল করছ জিন্নৎ। আমি একা নই। সবচেয়ে মূল্যবান সহযোগিতা আমি পেয়েছি। হিন্দুস্থানের জনগণ আমার সহায়। কিন্তু তাদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে কে? এখন যুদ্ধাবস্থা। এখন তো কাতারে কাতারে ছুটে এলেই চলবে না। জিন্নৎ, আমরা সুবর্ণসুযোগ হারাতে বসেছি, সম্ভবতঃ—শতাব্দীর সুবর্ণসুযোগ।

সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়। মুসম্মান বারজ্-এর বাইরে কোলাহল শোনা যায়।

হাকিম আসানুল্লা খবর পাঠায়, ফৌজের লোকেরা বন্দী বাটজন ফিরিঙ্গিকে

এখনি চায়। তাদের হত্যা করবে।

বাদশাহ্ বলে ওঠেন,—ওদের পেতে হলে লুণ্ঠন বন্ধ করতে হবে।

ওরা বাদশাহের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারপর নিজেরাই ছুটে যায় কেল্লার ভেতরে। পথপ্রদর্শক হয় কেল্লার রক্ষীরাই।

কিছুক্ষণ পর খবর আসে বন্দী ফিরিঙ্গিদের হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী সিপাহীরা রক্তাক্ত হাতিয়ার হাতে হর্ষোৎফুল্ল মনে কেল্লা পরিত্যাগ করতে গিয়ে দেখে সম্মুখে পথরোধ করে দণ্ডায়মান স্বয়ং বাহাদুর শাহ্। স্তব্ধ হয় তাদের গতি, উৎসাহ হয় অন্তর্হিত। একটা অপরাধবোধ তাদের মনকে ভারি করে তোলে।

বাদশাহ্ বলেন,—শোন তোমরা। ফিরিঙ্গিদের হত্যা করেছ—বেশ করেছ। কিন্তু আজ তোমরা আমার আদেশ অমান্য করলে সর্বপ্রথম। কিন্তু যেদিন মীরাট থেকে ছুটে এসে বলেছিলে,—"আপনি আমাদের বাদশাহ্," সেদিন জানিয়েছিলাম —বাদশাহ্ আমি নই। আমি একজন বৃদ্ধ ফকির মাত্র। আমার 'সম্পদ নেই, সম্মান নেই, কিছু নেই। সেদিন তোমরা শুধু চেয়েছিলে আমার আশীর্বাদ আর সহানুভূতি। অযোগ্য হলেও আমি চিরকাল তোমাদেরই পথের পথিক হিসাবে ভেবে এসেছি নিজেকে। তাই সন্তানের মত কাছে টেনে নিয়েছিলাম তোমাদের। আর আজ? কোথায় ভেসে গেল তোমাদের সেই প্রতিজ্ঞার অবিচলতা, কোথায় সেই সংকল্পের দৃঢ়তা? আজ তোমরা মুক্তিফৌজ নও—ভাতি ফৌজ। তোমাদেরই দেশের ভাইদের মনে তোমরা ত্রাসের সঞ্চার করছ। যাদের আমি সন্তান বলে ডেকেছিলাম, তাদেরই মধ্যে দু'জন লুণ্ঠন-সামগ্রী নিয়ে দেশে ফিরতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে দু'হাজার টাকার স্বর্ণমুদ্রা। এই কি দেশপ্রেম? এই দেশপ্রেমকে কি আমরা সবাই প্রশ্রয় দেব?

—আমাদের ক্ষমা করুন বাদশাহ্। আমরা কা করব বলে দিন।

—আমি জানি, তোমরা কী করবে তা জানো না। আমি জানি তোমরাই আসল বিদ্রোহী, আমি নই। তোমরা বিদেশীদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছ, আমি হয়তো আর্থিক দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়েছি মাত্র। ওদের ওপর তোমাদের ঘৃণা যতটা আকাশচুম্বী হবে আমার ঘৃণা ততটা হতে আরে না। তাই তোমরাই আমার ভরসাস্থল, আমি তোমাদের নই। আমি জানি, তোমরা আমাকে নির্বাচিত করে নেতা নির্বাচনে যোগ্যতার পরিচয় দাও নি। কারণ আমি অক্ষম—বার্ধক্য আমাকে এমন করেছে। নইলে তোমরা শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় ভুলপথে চলতে না। আজ শুধু একটা কথা শুনে রাখ—ফিরিঙ্গিরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওরা গাজীউদ্দিন নগরে এসে পড়েছে। যদি আমাদের জয়লাভ করতে হয়, তবে ওদের

আগে বদলি-কি-সেরাই-এ গিয়ে পৌছোতেই হবে। কারণ জায়গাটা খুবই সুবিধা-জনক যুদ্ধের পক্ষে। তোমরা প্রস্তুত থাক। কেউ না গেলে, আমি স্বয়ং তোমাদের পরিচালনা করব।

—বাদশাহ্ কী জয়!

—না। এ জয়ধ্বনি অত্যন্ত বিশ্রী শোনাচ্ছে। কারণ অসংখ্য দেশবাসীর মধ্যে আমি একজন মাত্র। বাদশাহের কথা ভুলে যাও—দেশের কথা ভাব। ফিরিঙ্গিদের নিঃশেষ করে একবার দেশের নামে জয়ধ্বনি দিও—তার আগে নয়।

বাদশাহ্ ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করেন।

সৈন্যরা নীরবে সারিবদ্ধভাবে একে একে প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যায়।

বদলি-কি-সেরাই-এর আগে গাজাউদ্দিন নগরেই আরও কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এবারেও সেই খণ্ডযুদ্ধের নায়ক ছিল প্রথম যুদ্ধের মীর্জা আবুবকর, কারণ একই—আবুবকরের অনভিজ্ঞতা এবং ফিরিঙ্গিদের অস্তিত্ব রাখার জন্য আপ্রাণ লড়াই। বিদেশীদের জোর বরাত এই সময়ে মেজর রীড একদল গুরখা সৈন্য নিয়ে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর সেই শক্তিশালী সেনাদল এগিয়ে আসতে থাকে। তারা যমুনা পার হয়ে আলিপুরে পৌছে যায়।

দেওয়ান-ই-খাসে জরুরী অধিবেশন বসে। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনার পর সবাই বাশাহ্কে একবাক্যে জেহাদ ঘোষণা করবার জন্যে অনুরোধ জানায়।

ঘোষিত হয় জেহাদ।

অভিযান চালানো হয় বদলি-কি সরাই-এ। দেশপ্রেমী ফৌজের তীব্র আক্রমণে ফিরিঙ্গি বাহিনী ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরেরা সমান সক্রিয়। গৌরীশঙ্কর, ফত্ মহম্মদ, তুরাব আলি, কাল্লু আর মদনের মত শত শত গুপ্তচর ফৌজের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে ফিরিঙ্গিদের ওয়াকেবহাল রাখল। ফলে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয়।

একজন রক্তাপ্লুত অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বাদশাহ্কে দুঃসংবাদটি দিল। জানাল, সতেরোটি কামান শত্রুদের হস্তগত। ওরা সব্জী মণ্ডীর পথে মুবারক বাগ্ অবধি চলে এসেছে।

বাদশাহ্ সেনাপতি সামাদ খাঁকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং অবিলম্বে যাত্রার আদেশ দিলেন!

লাহোর ফটক এবং কাশ্মিরী ফটক দিয়ে সামাদ খাঁয়ের আঠারোশো সেনা বারোটি অশ্বচালিত কামান নিয়ে ফিরিঙ্গি সেনাদের মোকাবিলা করবার জন্য নিষ্ক্রান্ত

হল। শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী হয়ে সামাদ খাঁ ফিরিঙ্গিদের কাছে খবর পাঠালো যে, সে এসেছে ঝাঝরের নরপতির কাছ থেকে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু শত শত গৃহশত্রু নিয়ে এ ধরনের চালাকী করা মূঢ়তা ভিন্ন কিছুই নয়। সামাদ খাঁ বুঝল না তার সঙ্গে বাদশাহের রক্ষীবাহিনীর সেনা হিসাবে যারা রয়েছে, তাদের অধিকাংশই ফিরিঙ্গিদের গুপ্তচর। তাদের মধ্যে দু'জনা অনেক আগেই ফিরিঙ্গিদের কাছে পৌছে দিয়েছে বিদ্রোহী সিপাহীদের অভিযান-বার্তা।

প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হল ফিরিঙ্গি তরফ থেকে বাদশাহী বাহিনী পাল্টা জবাব দিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলল। সামাদ খাঁ দেখল তার পক্ষে বড় বেশি লোকক্ষয় হচ্ছে। কারণ ফিরিঙ্গিদের অবস্থিতি দুর্ভেদ্য স্থানে। তাই দিনের শেষে সে তার বাহিনী নিয়ে নগরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

সামাদ খাঁ মারাত্মক ভুল করল। সে যদি যুদ্ধ না করে ফিরিঙ্গি আওতার বাইরে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করত, তা'হলে শত্রুরা এগিয়ে এসে দিল্লীর প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলোতে ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হত না। কিংবা সামাদ খাঁয়ের পশ্চাতে অপর এক বাহিনী থাকলেও চলত। রণক্লান্ত সামাদের সেনারা পেছিয়ে এলে তারা সেই স্থানে অবস্থান করতে পারত। কিন্তু জনগণের এই অভ্যুত্থানে সেনাপতির অভাবে পদে পদে অনুভূত হল। হয়তো সেই অভাবও কাটিয়ে ওঠা যেত যদি দেশের সুবিধাবাদী এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ গুপ্তচর বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়ে এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে ছুরিকাঘাত না করত।

ফলে বদলি-কি-সেরাই-এ শেষ পর্যন্ত মুক্তিসেনার পরাজয়।

মুসম্মান বারজ্-এ আপন কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে বাদশাহ ভাবেন—গুপ্তচরেরাও কিছু করতে পারত না যদি এই মুহূর্তে হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের কাছে দিল্লীর ঘটনাবলীর কথা পৌছে দেওয়া যেত। কামানের প্রয়োজন হত না, অশ্বারোহীরও প্রয়োজন হত না। কাতারে কাতারে তারা যদি দীর্ঘ কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসত, সে কুচকাওয়াজ বেতাল হলেও ক্ষতি নেই, তা'হলে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে দেশের ওই নিমকহারাম রাজা মহারাজা নবাব আর গুপ্তচরদের অস্তিত্ব ফুৎকারে বিলীন হয়ে যেত।

কিন্তু এটা শুধু কল্পনাই। তিনি দিকে দিকে চর পাঠিয়েছেন বটে। কিন্তু তারা সমগ্র দেশকে এ-সংবাদ দিতে পারবে না। তাই চাই উপযুক্ত সেনাপতি। মীর্জা মুঘল নয়, সামাদ খাঁ নয়—আরও অনেক বেশি প্রতিভাবান এমন কেউ যে মুক্তিসেনার ভেতরে ফিরিয়ে আনবে শৃঙ্খলাবোধ, আনবে নতুন উন্মাদনা।

ক্ষুদ্র পর্বতমালার ওপর শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে ফিরিঙ্গিরা অপেক্ষা করতে লাগল দিল্লীনগরীর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য। তারা জানে, সময় এখনো আসে নি। সৈন্যবল তাদের যথেষ্ট নয়। সংবাদ পেয়েছে তারা, সেনাপতি নিকলসন্ মহারাজের সৈন্যপুষ্ট বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। সেই মুহূর্তটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তারা, কখন দূর-দিগন্তে নিকলসনের বাহিনী তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। দলপতি রীড তাদের আত্ম-বিশ্বাস অটুট রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। পাহাড়ের ওপরে এই আবাস অত্যন্ত সুরক্ষিত বলে কথিত। বিদ্রোহীরা প্রবল বন্যার মত এলেও প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে। রীডের কথা যে সর্বাংশে সত্য, সেই প্রমাণ ইতিমধ্যে তারা কয়েকবার পেয়েছে। তাই তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সেই সময়ে একদিন, প্রাতঃকালে ফিরিঙ্গিরা লক্ষ্য করে দূরে যমুনা বেয়ে বহু নৌকা এগিয়ে আসছে। তীব্র কৌতূহল নিয়ে প্রতিটি ফিরিঙ্গি চেয়ে থাকে সেই দিকে। নিকলসন্ কি তবে এত শীঘ্র এসে পৌঁছে গেল। এলেও, এভাবে জলপথে এসে নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করছে কেন? সেনাপতি রীড এগিয়ে যায় অনেক কাছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে নৌকাগুলির প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করে। পরিচিত শ্বেতাঙ্গ কোন সেনাধ্যক্ষের দর্শনলাভের আশায়। সহসা তার চোখ পড়ে স্থূলবপু দীর্ঘদেহী এক পুরুষের দিকে। চমকে ওঠে সে—বখত্ খাঁ। প্রথম আফগানীস্থানের যুদ্ধে জালালাবাদে ছিল তাদেরই সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে। ক্ষুরধার বুদ্ধি এই হিন্দুস্থানী শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করত এবং তারাও এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির সাহচর্য উপভোগ করত। সেই বখত্ খাঁ ওই নৌকার সৈন্যদলে। কোন ভুল নেই। রীড শুনেছে তাদের সেনাদল পরিত্যাগ করে বখত্ খাঁ বাদশাহী ফৌজে যোগদানের উদ্দেশ্যে সৈন্যসংগ্রহ করছে রোহিলাখণ্ডে। কথাটিতে অতটা অতটা গুরুত্ব দেয় নি সে। কত লোক তো কত কথা বলে। কিন্তু বখত্ খাঁকে তার চিনতে ভুল হয়েছিল। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এই ব্যক্তিটি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সব কিছু করতে পারে। এবারে হয়তো তার দিন এসেছে।

এতদিন সৈন্যদলকে সাহস দিয়ে এসেছে রীড। এবারে তার নিজেরই বুক কেঁপে ওঠে। কারণ বখত্ খাঁ ফিরিঙ্গিদের দুর্বলতার সব খবরই রাখে। তা'ছাড়া সে বিদ্রোহীদের আলস্যের মধ্যে দিন কাটাতে দেবে না। সে ভালভাবে জানে, বাদশাহী বাহিনীকে যদি ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া যায় তা'হলে সংখ্যাধিক্যের চাপে ফিরিঙ্গি বাহিনী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সে আরও জানে ফিরিঙ্গি

বাহিনীর প্রথম আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করে নিতে পারলে তাদের পরাস্ত করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

প্রচণ্ড গরমে রীড রীতিমত ঘামছিল। এবারে তার মাথা ঘুরতে থাকে।

সে ধীরে ধীরে গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর বসে, সঙ্গে রাখা জলের পাত্রটির ঢাক্‌নি খুলে মুখে না ঢেলে মাথার ওপর ঢেলে দেয় সবটুকু।

লালপর্দায় বাহাদুর শাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান বখত্‌ খাঁ তার নিজের পরিচয় প্রদান করে। সে বলে যে, লখনৌ-এর অন্তর্গত সুলতানপুরে তার নিবাস এবং সে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বখত্‌-এর সুষ্ঠু আচরণে, তাঁর আত্মবিশ্বাসে ভাস্বর কথাবার্তায় বাহাদুর শাহ্‌ মুগ্ধ হন। তিনি মনে মনে আশান্বিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, এতদিনে বুঝি সেই অতি-প্রার্থিত সেনাপতির আবির্ভাব ঘটল, যে শৃংখলাবিহীন সরল বিদ্রোহীদের মধ্যে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে ফিরিঙ্গি বাহিনীকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারবে।

তবু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং বখত্‌ খাঁয়ের নিজের সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। তাদের নকল রণকৌশল দেখলেন। আরও অনেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেন। শেষে দু'দিন পর লালপর্দায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করে বলেন,—আমি আজ আপনাদের নতুন সিপাহসালার নিযুক্ত করতে চাই।

দরবারের সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। মীর্জা মুঘলের দৃষ্টি পিতার মুখের ওপর স্থির হয়। পিতার এই ঘোষণার তাৎপর্য সে অনুধাবন করতে পারে না। আসলে সে ধারণা করতে পারে নি, একজন আগন্তুককে পিতা সর্বোচ্চপদে নিয়োগ করবেন—যোগ্যতা তার যতই থাকুক না কেন।

—মীর্জা মুঘল!

—বাদশাহ্‌।

—তুমি এবং লালপর্দার সবাই একদিন আমাকে কথা দিয়েছিলে, যোগ্য সেনাপতি কখনো মিললে তোমরা বাধার সৃষ্টি করবে না।

—কথার খেলাপ আমি করব না।

—সুখী হলাম! আজ থেকে তুমি সিপাহসালারের সহকারী হিসাবে কাজ করবে।

—কিন্তু কে সিপাহসালার? সবার প্রশ্ন।

—বখত্ খাঁ।

বখত্ খাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হাকিম আসাহুল্লা বলে উঠে,—হ্যাঁ, নবাগত। মহারাজা আর নবাবদের মত অতি পরিচিত নয়। কিন্তু কে নয় নবাগত বলতে পারেন? পরিচিতদের মধ্যে কয়জন দেশের জন্যে সবকিছু উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছে হাকিম সাহেব? এই দুর্দিনে অথবা এই আশাতিরিক্ত সুদিনে সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে কে আমাদের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে?

দেওয়ান-ই-খাস স্তব্ধ। বাহাদুর শাহের কথার জবাব নেই।

বিনা বাধায় বখত্ খাঁ সিপাহসালারের পদাভিষিক্ত হল।

পরদিনই দিল্লীবাসীরা দেখল, মুক্তি সেনারা যেভাবে ছোট ছোট দলে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াত নগরীর পথে-ঘাটে, সেভাবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। একটু বিস্মিত হয় সবাই। তারপর তারা জানতে পারল, সামরিক কায়দায় সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করছে আজমীর ফটক থেকে দিল্লী ফটক পর্যন্ত।

বখত্ খাঁ সেনাদলকে নগরীর অভ্যন্তর থেকে সরিয়ে নিল। তাদের জন্য সংরক্ষিত শিবির স্থাপন করা হল নগরীর পাশে। সেখানে সামরিক কেতা মাফিক তাদের যথেচ্ছ চলাফেরায় ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। এই প্রথম কঠোর নিয়মের নিগড়ে বাধা পড়ল সিপাহীরা। অথচ তারা তেমন বিরক্তি বোধ করল না। কারণ তারা দেখল যে তাদের নবনিযুক্ত সেনাপতি তাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। তা'ছাড়া সেনাপতি ঘোষণা করেছেন যুদ্ধে বীরত্ব দেখালে প্রতিটি সিপাহীকে পাঁচ বিঘা করে জমি উপহার দেবেন। ফিরিঙ্গিরা তাদের অনেককে ভূমিহীন করেছে তাই তারা উৎসাহিত বোধ করল।

হৃষ্টচিত্তে বাদশাহ্ সিপাহসালার বখত্ খাঁকে দেওয়ান-ই-খাসে ডেকে পাঠালেন। মসনদ থেকে উঠে এগিয়ে এসে তিনি বখত্-এর হাতের ওপর হাত রেখে 'ফরজন্দ্' বলে সম্বোধন করলেন।

আবেগ আর উত্তেজনায় বখত্-এর বিশাল বুক কেঁপে উঠল।

যুদ্ধবিগ্রহ প্রলয় মহামারী সবই আসে। তবু তারই মধ্যে মানুষ তার স্বাভাবিক জীবনের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখে, যতটা পারে। অতি দুঃসময়েও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব হয় না কোন জাতির। তারা ধর্মীয় উৎসবও পালন করতে সচেষ্ট হয়। অশ্ব হমদমে আরোহণ করে নগরী-পরিভ্রমণে বার হয়ে বাদশাহ্ একদিন একটি গলির মধ্যে দেখলেন একজন রমণী হাতে কয়েকটি রাখী নিয়ে বিক্রয়ের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি হমদমের লাগাম ধরে টানেন। অশ্ব

থেমে যায়। রমণী বাদশাহ্‌কে দেখতে পায়। সঙ্কুচিত হয়ে সরে যেতে চেষ্টা করতেই বাদশাহ্‌ ডাকেন তাকে।

সে সসংকোচ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে এসে অভিবাদন করে!

—রাখী-উৎসব কবে মা?

—কাল।

—তোমার বিক্রি হয়েছে?

—হ্যাঁ বাদশাহ্‌। এই ক'টি মাত্র রয়েছে।

—আমায় দাও।

—এগুলো আপনার উপযুক্ত নয় বাদশাহ্‌।

—রাখীর আবার ভাল-মন্দ আছে নাকি। সবই রাখী। দাও, আমি কিনব।

বাদশাহ্‌ সেগুলো কিনে নেন। তারপর হমদম ছুটিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করেন। প্রথম রক্ষীকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করেন,—তোমার নাম কি?

—ধরমলাল, জাঁহাপনা!

—রাখী উৎসব কাল তো?

—জী হাঁ, জাঁহাপনা!

—বারাণসীলাল তো আমাকে বলে নি?

রক্ষী ভীত হয়। কেল্লার হিন্দু-রক্ষীরা প্রতিবছর রাখী-উৎসব এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদশাহের নিকট হতে অর্থ পায়। কোনবারই বাদশাহ্‌কে মনে করিয়ে দিতে হয় না। কবে কোন পার্বণ রয়েছে সে খেয়াল বাদশাহেরই সব চাইতে বেশি। তবে বলা রয়েছে, কদাচিৎ কখনো যদি কাজের চাপে তিনি বিস্মৃত হন বারাণসীলাল তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এবারে বারাণসীলালকে তারাই বাদশাহের কাছে যেতে দেয় নি। কারণ তাদের মধ্যে একজন স্বচক্ষে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে কাঁদতে কাঁদতে রক্ষীদের কাছে এসে জানিয়েছিল সেকথা। সে দেখেছিল বাদশাহ্‌-নন্দিনী নবাব খাতুন জামানী বেগম স্বয়ং বারাণসালালের কাছে এসে মাত্র পনেরটি টাকা কর্জ হিসাবে চাইছে। তার সুন্দর মুখখানা লজ্জায় সংকোচে গোলাপের পাঁপড়ির মত রাঙা হয়ে উঠেছিল, বারাণসীলালও চোখের জল সামলাতে পারেনি। অর্থ-ভাণ্ডারের যে কী.দুরবস্থা, তার চাইতে ভাল আর কেউ জানে না। কিন্তু পনেরোটি টাকা কিছুই নয়। তাই অনেক বেশি দিয়ে বলেছিল বাদশাহ্‌-তনয়াকে,—আপনার অলঙ্কারের অধিকাংশই মুক্তিসেনার জন্য চলে গিয়েছে, তাই এই সামান্য পরিমাণ টাকা চাইতে আপনার সংকুচিত হবার কোন কারণ নেই।

জামানী বেগম স্খলিত চরণে স্থান ত্যাগ করেছিল। যেন, অর্থভাণ্ডারের টাকা

নিয়ে সে মহা অপরাধ করেছে। অর্থ-ভাণ্ডার তো আর বাদশাহের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

এই ঘটনার কথা শুনে রক্ষীরা একত্রিত হয়ে বারাণসীলালের কাছে গিয়ে বলেছিল, বাদশাহ্‌কে এবারে যেন রাখী-উৎসবের কথা কিছুতেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া না হয়। বারাণসীলাল তাদের মিলিত দাবী রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে।

বাদশাহের কথার উত্তরে রক্ষী বিনম্র কণ্ঠে বলে,—বারাণসীলালের দোষ নেই জাহাপনা। আমরাই তাকে নিষেধ করেছিলাম। চিরকাল তো পেয়ে এসেছি। এবারে না হয় থাক। সুদিন এলে আবার আনন্দ করব।

বাদশাহ্‌ সহসা কিছু বলতে পারেন না। তারপর হমদমের পিঠ চাপড়ে বলেন, – তোমরা ভেবছ কি? বাদশাহের এটুকু অর্থও নেই?

রক্ষীর মস্তক অবনত হয়।

—আজই দেওয়ান-ই-খাসের সামনে তোমরা হাজির থাকবে। সবাইকে দেখতে চাই আমি।

—জো হুকুম বাদশাহ্‌।

'হে আল্লা! শত্রুসেনা যেন নিঃশেষিত হয়।'

রাখী উৎসবের পর পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বাদশাহের একান্ত প্রার্থনা তাই।

তিনি জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,—এই বিশেষ দিনটিকে আমরা ঈদ-ই-করবান' বলে শুধু তখনই বলতে পারব যখন আমরা আমাদের হত্যাকারীদের, লুণ্ঠনকারীদের অসির অগ্রভাগে পাবো।

বাদশাহের আন্তরিক প্রার্থনার পর তাঁর একান্ত অনুগামী মুন্সী গুলাম মহম্মদ আলি মুস্তাক সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকটি শ্যার লিখে ফেলল—

'ধর্মহীনরা যেন অবলুপ্ত হয়। হে বাদশাহ্‌! আপনি যেন বিজয়মাল্য দ্বারা ভূষিত হন। ফিরিঙ্গিদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও যেন ধরিত্রীর বক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হে বাদশাহ্‌! ঈদের সর ঈদ, আনন্দের পর আনন্দ আপনি উপভোগ করুন। আপনি দেশবাসীর সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। কারণ শত্রুরা আজ তরবারির আওতায়।'

বিশাল প্রার্থনা সভা। অগণিত মুসলমান প্রার্থনারত। চতুর্দিকে অপেক্ষারত হিন্দু প্রজারা বাদশাহের প্রার্থনার পর তাঁর তেজোদীপ্ত ভাষণ শ্রবণ করে,—

ভাইসব,

কুফর-ও-দিন জাফর ইয়াক সাঁ জানতে হৈঁ মুহুরম্ লোগ্,

কব্ রয়ে হ্যায় না মুহুরন্ বাত্‌চিত্‌ ইয়োঁ কে উয়ো।

[সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে যাঁদের রয়েছে সম্যক জ্ঞান, তারাই জানেন হিন্দু ও মুসলমান সবই এক—একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু এই বিদেশীরা অন্যধরনের কথা বলেছে।]

শয়তানেরা আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করতে চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থ হয়েছে। ওরা যথেষ্ট সুচতুর ও বুদ্ধিমান। যুগ যুগ ধরে আমরা একসঙ্গে বাস করে এসেছি। কে হিন্দু, কে মুসলমান এ-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে ওরা অন্ততঃ কিছুটা সাফল্যলাভ করতে পেরেছিল। আমাদের হিন্দুস্থানের ভাইরা কেউ কেউ বুঝতে শুরু করেছিল সে হিন্দু, আমি মুসলমান কিংবা সে মুসলমান, আমি হিন্দু। তবু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তেমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। তাই আজ আমরা সবাই এক। তাই প্রতিদিন আমি সজল চোখে বুকভরা ভালবাসা নিয়ে লক্ষ্য করি আমাদের ফৌজেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 'দীন দীন' রবে শত্রুদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শয়তানদের বুক কাঁপে। তাদের বুক কাঁপে আমাদের অস্ত্র দেখে ততটা নয়, যতটা সবার মুখে সেই একই 'দীন দীন' রব শুনে।

ভাবতে পারেন, ওরা আমাদের ধর্মজ্ঞান দেবার দুঃসাহস রাখে? হিন্দুস্থানের মানুষকে ধর্মজ্ঞান? আপনার পবিত্র মক্কার দিকে এগিয়ে যান প্রখর খরতাপে মরুভূমির তপ্ত বালুকার ওপর দিয়ে নগ্ন পদে, অনাবৃত মস্তকে। আপনারা বারাণসী, হিংলাজ, কেদার-বদ্রী যান পবিত্র মন নিয়ে, কখনো কখনো সাষ্টাঙ্গে এগিয়ে চলেন ধারণাতীত কষ্ট সহ্য করে। কারণ এই অবর্ণনায় কষ্টই আমাদের চিত্তের গ্লানিকে ধুয়েমুছে পবিত্র করে পৌঁছে দেয় প্রার্থিত তীর্থস্থানে। অভীপ্স-স্থানে গিয়ে যখন পৌঁছোই, মন তখন আমাদের নিষ্ঠায় অবিচল। আর ওই দুশমনরা কী করে? ওরা সবাই নিজেদের পরিচয় দেয় পরিত্রাতা যীশু খ্রীস্টের ভক্ত বলে, অথচ সেই মহাপুরুষের পবিত্র জন্মস্থানে একই ধর্মাবলম্বী হয়ে হানাহানি করে, অজস্র রক্তপাত ঘটায়। ওরা আসে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে। দ্বারকা, মক্কা, পুরী, মদিনা—কোথায় সামান্য কারণে এত রক্তপাত ঘটেছে বলতে পারেন?

অগণিত জনতা গর্জে ওঠে। মনে হয় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বুঝি ফুঁসে উঠল।

বাদশাহ্ আরও কিছুক্ষণ বলার পর শেষ করেন এই কথা বলে,—আজ শয়তানের দল আমাদের সম্মুখে। তারা দিল্লীর প্রান্তদেশে উপস্থিত। এই আমাদের পরম মুহূর্ত। এই সুযোগের যদি আমরা অপব্যবহার করি তা'হলে

হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা আরও কতদিন পেছিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। এতদিন আমরা একজন সুযোগ্য সিপাহসালারের অভাব বোধ করেছি। এখন বখত্ খাঁ এসেছে। সে কতখানি পারদর্শী আমার জানা নেই। তবে যাঁরা দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনীকে সে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই অতি পবিত্র দিনে আপনারা শপথ করুন শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে ওদের রুখবেন—ওদের ধ্বংস করবেন।

জনতা শপথ নেয়।

তারপর দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে ধ্বনি ওঠে—বাদশাহ্ কি জয়।

শুভ আলিঙ্গনে মত্ত হয়ে ওঠে সবাই।

দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহ্ বখত্ খাঁকে সম্বোধন করে বললেন—সিপাহসালার, তোমার আগমনে সেনাবাহিনীর সমষ্টিগত ভাবে উন্নতি হয়েছে. তুমি কর আদায়ে তোমার বাহিনী দিয়ে ওয়ালিদাদ খাঁকে সাহায্য করেছ। ফলে ফিরিঙ্গিদের কর আদায়ের প্রচেষ্টা বার্থ হয়েছে, তোমার সৈন্যদলের মুখোমুখি দাঁড়াতে ওরা সাহসী হয় নি। ওরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে হিন্দুস্থানের প্রকৃত মালিক এই দেশেরই জনসাধারণ। তুমি ইতিমধ্যে অসংখ্য গুপ্তচরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছ, যারা বন্ধুর ছদ্মবেশে আমাদের সর্বনাশ করছিল। তুমি বাজারের অনেক মাংসবিক্রেতাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছ, যারা গোপনে শত্রু-শিবিরে খাদ্যের যোগান দিচ্ছিল। সবই তুমি করেছ, কিন্তু আসল কাজই বাকি থেকে গেল।

—কী কাজ জাঁহাপনা!

—ওই যে ছোট্ট পাহাড়ের সারি দেখছ, ফিরিঙ্গিরা ওগুলোর ওপর এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে। তোমার হাতে গড়া সৈন্যদল বার বার তাদের আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

—এর জন্যে আমার লজ্জার সীমা নেই। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওখান থেকে ওদের বিতড়িত করবই। শুধু ওখান থেকে নয়—হিন্দুস্থানের ভূমি থেকেও। তুমি আসবার আগেই ওরা ওখানে আত্মরক্ষার দৃঢ় ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। স্থানটি আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয়ের পক্ষেই আদর্শ।

—আমি চাই সত্বর ওদের ওখান থেকে উৎখাত করতে। আমার বিশ্বাস ওরা বড় একদল সৈন্যের অপেক্ষায় ঘাঁটি গেড়েছে। সেই সৈন্যদল এসে ওদের পুষ্ট করলেই দিল্লীর ওপর ওরা চূড়ান্ত আঘাত হানবে।

—আপনার বিশ্বাস অসত্য হতে পারে না। আমিও সেই ভয় করছি।

—তুমি কি এখুনি ছাউনিতে চলে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। তবে তার আগে আপনাকে একটি সংবাদ জানাবার ছিল।

—বল।

—আপনার বিশ্বস্ত কর্মচারী জীবনলাল ধরা পড়েছে।

—জীবনলাল !

কথাটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় প্রতি মুখে মুখে, লালপর্দাব প্রতি দেওয়ালে, থামে, কারুকার্যের সূক্ষ্ম ফাঁকে ফাঁকে।

—হ্যাঁ বাদশাহ।

—বন্দী কর। কারাগারে নিক্ষেপ কর।

—তাকে কুরে সিং-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। সে নিয়ে যাবে কারাগারে।

—অন্য গুপ্তচরদের মত এখুনি ওকে মেরে ফেলো না। ওকে আমি দেখতে চাই।

হাম উস্‌কি বাত্‌ কি কুয়ায়েল হ্যায় আয়ে জাফর জিস্‌নে

ভাল কহা জি সে মুঁহ্‌ সে উসে বুঢা না কহা।

তাই দেখতে চাই। যাচাই করতে চাই। জীবনলাল! আমাদের অতিপ্রিয় বিশ্বস্ত জীবনলাল!

স্তব্ধ দরবার দেখে বাদবাহ্‌ উন্মাদের মত রৌপ্যাসনের দুই প্রান্ত দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছেন।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল। কিন্তু বখত্‌ খাঁ ফিরিঙ্গিদের উচ্ছেদ করতে পারল না সেই পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে। মীর্জা মুঘল তার সিপাহীসালারের পদ থেকে অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও সর্ববিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করে বখত্‌ খাঁকে। তবু সফল হতে পারল না নতুন সেনাধ্যক্ষ। তার ব্যক্তিত্বের চমক, তার কর্মতৎপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ—যা এতদিন মুগ্ধ করে রেখেছিল মুক্তিবাহিনীকে, সেই সব সদ্‌গুণের ভেতর থেকে এমন কতকগুলো পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল দিনের পর দিন, যার ফলে সেনাবাহিনী বিরক্ত বোধ করতে থাকল। তারা এটুকু বুঝে ফেলল, বখত্‌ খাঁ যতবড দেশপ্রেমীই হোক না কেন, সে সব কিছুর কৃতিত্ব নিজে উপভোগ করতে চায়—বাদশাহের প্রশংসার সব কিছু নিজের ওপর বর্ষিত হতে দেখতে চায়। প্রথম প্রথম ফিস্‌ফিসানি—তারপর একটু প্রকাশ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বখত্‌ খাঁ বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু সে এটুকু বুঝল না সেনানায়ক হতে হলে সেনাদের একজন হিসাবে হতে হবে। পিলসুজের ওপর প্রদীপের মত

মুক্তিসেনার শবের ওপর কিংবা তাদের বীরত্বের ওপর সে তার উচ্চাভিলাষের প্রাসাদ গড়তে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়মাল্য দেশবাসীর প্রাপ্য, একা কোন সমর-নায়কের নয়। অগণিত কৃষক এবং ফিরিঙ্গি নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত জনসাধারণের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই মুক্তি আসে। কোন বিশেষ নৃপতি অথবা সিপাহসালারের অভিযান তৎপরতায় নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত নায়ক হতে হলে সবটুকু গৌরব প্রাপ্য, সুফলে যাদের অধিকার, তাদেরই মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। বখত্ খাঁ বুঝল না একথা। উপলব্ধি করবার মত মানসিক গঠনও তার নেই, যা বাদশাহের রয়েছে। তাই বাদশাহ্ বাহাদুর ঘোষণা করেছেন—যুদ্ধে আগে জয়লাভ কর, তারপর দিল্লীর তখত্ তাউসে তোমাদের প্রতিনিধি বসাও। আমি মসনদ চাই না। আমার পুত্রদেরও মসনদের দিকে হাত বাড়াতে দেব না।

সেনাবাহিনী নিয়মিত বেতন পায় না। বখত্ খাঁ ভাবে, তাতেই বুঝি তাদের অসন্তোষ। ছুটে আসে বাদশাহের কাছে।

বাদশাহ্ তাঁর ঝরোখার সামনে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্য বলেন—অর্থ চাও তো আমাকে বল নি কেন? কেন এত হৈ চৈ? আমি জানি আমার কোষাগার শূন্য। সেখানে মাত্র চল্লিশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা অবশিষ্ট রয়েছে। তা'ছাড়া বেরিলি থেকে আমি একশো স্বর্ণ মোহর উপহার পেয়েছি। সেগুলো তোমরা নিয়ে নাও। বেগমদের অলঙ্কার রয়েছে এখনো। কেল্লায় সোনা-রূপার পাতে মোড়া বহু দ্রব্য রয়েছে। নিয়ে যাও তোমরা। কিন্তু আমাকে যদি তোমাদের একজন বলে ভাবো, তা'হলে কোনরকম অরাজকতা আমি দেখতে চাই না। তাতে আমাদের শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে। দেশকে আমরা মুক্ত করতে পারব না।

সেনারা চিৎকার করে ওঠে,—আমরা অর্থ চাই না বাদশাহ্। কিন্তু আমরা বখত্ খাঁকেও চাই না।

—অর্থ চাও না ভাল কথা। কিন্তু বখত্ খাঁকে না চেয়ে আপাততঃ উপায় নেই।

—না—না।

—বেশ, তোমাদের কথাই মানলাম। কিন্তু এখন নয়। তার আগে তোমাদের মধ্যে থেকে অন্ততঃ একজন এগিয়ে আসুক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি বখত্ খাঁকে অব্যাহতি দেব।

—একজন আছে। সে শুধু হুকুম করে না—আমাদের মন জানে। যে-সব শিখ সেনা আমাদের দলে যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে আছে। সরদার সিং তার নাম। আর একজনও রয়েছে—নাম তার গাউস খাঁ। এদের মধ্যে যে কোন একজনকে আপনি বেছে নিন।

চিন্তিত বাদশাহ্‌ বহুক্ষণ নীরব থেকে বলেন,—তোমাদের প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য। আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।

—বাদশাহ্‌ কী জয়!

সিপাহীদের জয়ধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই একজন রক্ষী এসে সংবাদ দেয়, —ঝাঁসির রানী একজন সামরিক ব্যক্তিকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেছেন।

—এখনি এখানে আনবার ব্যবস্থা কর। উপযুক্ত সম্মান দেখাতে যেন ভুল না হয়।

রক্ষী চলে যায়। বাদশাহ্‌ পায়চারী করতে থাকেন। ফিরিঙ্গি বিতাড়নে ঝাঁসির রানীর অকৃত্রিম প্রয়াসের কথা অজানা নেই। ফিরিঙ্গি সৈন্যদলকে তাঁর বাহিনী একক প্রচেষ্টায় বহু ক্ষেত্রেই ঘায়েল করে চলেছে। তিনি, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতি দেশপ্রেমীরা যদি দেশের পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য প্রাণপাত লড়াই না করতেন, তবে এতদিনে শত্রুদের সম্মিলিত চাপ এসে দিল্লীর ওপর পড়ত। ইচ্ছা জেগেছে মনে, নানাসাহেবকে একবার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা মনের মধ্যেই চেপে রেখেছেন। কারণ শত্রুদের বাইরে থেকে যেন উত্যক্ত করারও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

ঝাঁসির সেনানায়ক বাদশাহকে অভিবাদন করে দাঁড়ায়। তারপর তার তরবারি এবং আগ্নেয়াস্ত্র বাদশাহের চরণ প্রান্তে স্থাপন করে বলে,—রানীমাতার আদেশে আমি এবং আমার সৈন্যদল আমাদের আনুগত্য আপনাকে সমর্পণ করছি। সৈন্যরা দিল্লীর অদূরে অপেক্ষা করছে। আপনি আদেশ দিলে আপনার অভিরুচি অনুযায়ী আমাদের সর্বস্ব পণ করে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

বাদশাহ্‌ আগ্নেয়াস্ত্র এবং তরবারি তুলে নিয়ে সেনানায়ককে প্রত্যর্পণ করে বলেন,—তোমাদের এই অস্ত্র আর দেশপ্রেম মুক্তিবাহিনীকে সহস্রগুণ শক্তিশালী করবে।

চারিদিকে যুদ্ধের হুংকার। ওদিকে নানাসাহেব রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বহু জানা-অজানা বীর ও বীরাঙ্গনা—এদিকে বাদশাহ্‌ বাহাদুর শাহ্‌। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের শিখায় দগ্ধ হতে থাকল মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি। আগ্রায় বিদ্রোহী সেনারা জয়লাভ করল। সেই বিজয়-বার্তা তড়িৎ-গতিতে গিয়ে পৌঁছাল। পুলকিত বাদশাহ্‌ বহুদিন পরে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে জিন্নৎ বেগমকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে বলেন,—চল, বুলবুলের গান শুনব।

জিন্নৎ বেগমের নয়নদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কত—কতদিন পরে বাদশাহের

হৃদয়ে একটু আনন্দ অনুভূত হয়েছে। নইলে এভাবে সেধে বুলবুলের গান শুনতে চান নি কখনো।

—জান জিন্নৎ। আমি তৈমুর বংশধর বলেই হয়তো বুলবুলের শিস শোনবার সাধ হল। আগ্রার বিজয়-সংবাদ আমাদের সৈন্যদের মধ্যেও পৌঁছেচে। তাদের আনন্দ আমার চাইতে কম নয়। বরং অনেক—অনেকগুণ বেশি। কিন্তু তাদের কি বুলবুলের গান শুনতে ইচ্ছে হয়েছে কারও! বলতে পার তুমি?

—তাদের বুলবুল নেই বাদশাহ। হয়তো দেশে ফেলে আসা তাদের হৃদয়ের বুলবলের মিষ্টি কথা শোনবার স্বপ্ন দেখছে। এই বিজয় যদি চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হয় তবে তারা দেশে ফিরতে পারবে।

—তুমি সত্যিই অসাধারণ।

—না বাদশাহ্। একটু ভুল হল। আপনার অসাধারণত্বের আলো পড়েছে আমার মনের দর্পণে। আপনি সূর্য—আমি চান্দ্রমা। আপনার আলোয় আলোকিত আমি।

বাদশাহের চোখের সামনে ফুটে ওঠে হুমায়ুনের সমাধির সেই দৃশ্যের কথা। বহু বছর আগে যে অপরাহ্নে বোরখা পরিহিতা নব-যৌবনা জিন্নৎ এগিয়ে এসেছিল দয়িতের কাছে। বাহুপাশে আবদ্ধ জিন্নৎ-এর চিবুক তুলে ধরে আজ আবার সেই নয়ন দু'টির দিকে দৃষ্টিপাত করেন তিনি। আশ্চর্য নয়নে সেই গভীর প্রেম, সেই সমবেদনা। চিরযৌবনা নয়ন জিন্নৎ-এর।

সর্বপ্রকার বাধানিষেধ ভেঙ্গে চুরমার করে মুমম্মান বারজ্-এর এই গোপন কক্ষে এই সময়ে দ্রুতপদে প্রবেশ করে মুকুন্দলাল।

—এ কি? মুকুন্দলাল!

জিন্নৎ বেগমের মুখে আবীর ছড়ায়। তবু সে মনে মনে জানে মুকুন্দলাল নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করে নি। কারণ সে উন্মাদ নয়। একটা কিছু ঘটেছে। তা'ছাড়া এটি ঠিক হারেম নয়। দিনের এই সময়ে বাদশাহের নিকট বেগমদের উপস্থিতি খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার ধীরে ধীরে সরে যায় পর্দার আড়ালে। সেখানে দাঁড়িয়ে মুকুন্দলালকে বলতে শোনে,—হাকিম আসানুল্লা দেওয়াই-ই-খাসের দিকে প্রাণভয়ে ছুটে আসছেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছে এক-দল সেনা।

—কেন?

—তাঁকে হত্যা করবে। কিছুদিন থেকে গুজব শোনা যাচ্ছিল, হাকিম সাহেব গোপনে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে বার্তা-বিনিময় করছিল। একটা পত্র নাকি ধরা পড়েছে

আজ।

বাদশাহ্ এই বৃদ্ধ বয়সেও ছুটতে থাকেন। তাঁর পেছনে পেছনে মুকুন্দলাল। হাকিমকে তখন সৈন্যদল প্রায় ঘিরে ধরেছে। উন্মুক্ত তরবারি তাদের। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত হবে হাকিমের দেহ। বাদশাহ্ ছুটে গিয়ে সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করে হাকিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠেন,—এঁকে স্পর্শ করবার আগে আমাকে হত্যা কর তোমরা।

—বাদশাহ্!

—হ্যাঁ, আমি। থামলে কেন! হত্যা কর আমায়।

—আপনি অনুগ্রহ করে চলে যান বাদশাহ্। এই অপ্রিয় দৃশ্য দেখবেন না।

—কিন্তু কেন এঁকে হত্যা করতে চাও।

—এ শয়তান—বিশ্বাসঘাতক।

—হাকিম সাহেব! বাদশাহের দৃষ্টিতে তীব্র অনুসন্ধিৎসার বিদ্যুৎ ঝলক। স্থির কণ্ঠে আসাদুল্লা খাঁ বলে,—আপনি আমায় অবিশ্বাস করেন বাদশাহ্?

—না। তেমনি এদেরও অবিশ্বাস করি না।

—ওরা নাকি একটি পত্র পেয়েছে, তাতে আমার নাম সহি রয়েছে। বাদশাহী শীলমোহরও রয়েছে।

—তেমন কোন পত্র আপনি লিখেছেন কি?

—না।

সেনাদলের একজন বিদ্রূপের হাসি হেসে একটি পত্র এগিয়ে দেয় বাদশাহের দিকে।

বাদশাহ্ সেটি পাঠ করে স্তম্ভিত হন। পত্রটির শেষে হাকিম সাহেবের অতি পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এ কি সম্ভব? বিশ্বাসী বলে কি একজনও নেই এই আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে!

বাদশাহের ভাববৈলক্ষণ্য দেখে সেনাদের তরবারি আবার শূন্যে আন্দোলিত হয়।

ধীরে ধীরে পত্রটি হাকিম সাহেবের দিকে এগিয়ে দেন তিনি। হাকিম তাতে নিজের হস্তাক্ষর দেখে হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এ-পত্র তো সে লেখে নি। তবে কখন এর নীচে নিজের নাম লিখল? হস্তাক্ষর বহুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। শেষে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

নির্ভীক কণ্ঠে বাদশাহের দিকে সেটি ধরে হাকিম সাহেব বলে,—জাল পত্র।

—জাল?

—হ্যাঁ বাদশাহ্। প্রমাণ আমার কাছেই রয়েছে। দেখুন দু'টি হস্তাক্ষর।

হাকিম সাহেব বাদশাহ্‌কে জালিয়াতের কয়েকটি ভ্রম দেখিয়ে দেয়।

সেনারা সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনে। বুঝতে পারে যে হাকিম নিরপরাধ। তবু বলে,—বিশ্বাসঘাতকতা করার ফল মৃত্যুদণ্ড, একথা কখনো ভুলবেন না।

এবারে বাদশাহ্ বলেন,—হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ড। আমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, আমাকেও তোমরা সেই শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করো না। তোমরা কিছুদিন আগে জিন্নৎ বেগমকে অবিশ্বাস করেছিলে। তোমাদের অবিশ্বাসের কারণ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। ততদিন জিন্নৎকে আমার কাছে আসতে দিই নি।

সৈন্যরা বিদায় নেয়।

জাতীয় বাহিনীর মধ্যে যখন সিপাহসালার বখত্ খাঁ সম্বন্ধে গুঞ্জরণ, তনখ বাদশাহ্ সিদ্ধান্ত নিলেন ফিরিঙ্গিদের আক্রমণের অপেক্ষায় আর দিন না গুনে, অচিরেই তাদের ঘাঁটি ধুলিসাৎ করতে হবে। বাদশাহী গুপ্তচর খবর এনেছে, যে সেনাপতির অপেক্ষায় ফিরিঙ্গিরা এতদিন দিন গুনছিল সেই বহুপ্রার্থিত নিকলসন দলবল নিয়ে এসে ওদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। তা'ছাড়া সেনাপতি উইলসনও রয়েছে ওদের মধ্যে।

নিকলসন ও উইলসন, উভয়ের উপস্থিতির সংবাদে বখত্ খাঁ দমে গেল। ওদের অনুপস্থিতিতেই এতদিন ঘাঁটিগুলো দখল করা সম্ভব হয় নি। এবারে তা আরও কষ্টসাধ্য হবে।

বাদশাহ্ বললেন, নজ্‌ফগড়ের খালের তীরবর্তী অঞ্চলেই হ'ল ফিরিঙ্গিদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুবিধাজনক স্থান। তিনি সমর-নায়কদের পরামর্শ দিলেন, নজফ্-গড় খাল পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। তবে সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে খালের সেতুটি যাতে অক্ষত থাকে। কারণ প্রবল প্রতিআক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণের প্রয়োজন হলে ওটিই হবে একমাত্র পথ।

বখত্ খাঁ, সরদার সিং, গাউস খাঁ—তিন সেনাপতি তাদের নিজেদের বাহিনী নিয়ে যাত্রা করল। বখত্ খাঁ খালের এপারে একটি স্থান দেখে ছাউনি ফেলে। পরবর্তী দুই সেনাপতি এসে বখত্ খাঁকে অনুরোধ করে এগিয়ে যেতে। অস্বীকার করে বখত্। কোনরকম ঝুঁকি নিতে সে নারাজ।

গাউস খাঁ ক্রোধোন্মত্ত হয়। কিন্তু সিপাহসালারকে কিছু বলতে পারে না। বখত্ খাঁয়ে সৈন্যদল অনেকক্ষণ বিশ্রাম পেয়েছে। কিন্তু তারা সবে এসে

পৌঁচেছে। দাঁতে দাঁত চেপে গাউস সরদার সিংকে বলে,—চলুন সিংজী, আমরাই খাল পার হই তবে।

—হ্যাঁ, চলুন।

সেই সময় আকাশ সহসা গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে। দুই সেনাপতির বাহিনী সেতু পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয়। তবু ওরা এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলাই জাতীয় বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য। ওরা জানে পশ্চাতে রয়েছে বখত্ খাঁ। ফিরিঙ্গিরা সহসা আক্রমণ করলেও, বখত্ খাঁ আসবে সাহায্য করতে। এই শক্তিবৃদ্ধিতে ফিরিঙ্গিরা শঙ্কিত হবে—পরাজিত হবে।

আরও এগিয়ে যাবার পর শত্রুদের সম্মুখীন হয় তারা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে প্রবল গোলাবর্ষণ। নিকলসনের বুক কেঁপে ওঠে, উইলসনের ললাটের রেখা কুঞ্চিত হয়। ওরাও পাল্টা গোলা নিক্ষেপ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলে। একটা প্রচণ্ড আক্ষেপে উইলসনের মনে দানা বেঁধে ওঠে। ভুল হয়েছে তার। এভাবে বাদশাহী সেনার সম্মুখীন হওয়া তার উচিত হয় নি।

সহসা সে দেখতে পায়, তাদের নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে নজফ্‌গড় খালের সেতুটি উড়ে যায়। সেই সঙ্গে জাতীয় বাহিনীর মধ্যে অনুভূত হয় একটি প্রবল আলোড়ন। বুঝতে বিলম্ব হয় না বুদ্ধিমান উইলসনের, পশ্চাতের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ওরা ভীত। আদেশ দেয়, আরও গোলাবর্ষণ কর—আরও—আরও।

বাদশাহী সেনা ছত্রভঙ্গ হয়। বখত্ খাঁ দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করে এবং তার বাহিনী নিয়ে দিল্লীর দিকে ফিরতে শুরু করে। মুহূর্তের জন্য তার উচ্চাভিলাষ তার দেশপ্রেমকে পরাজিত করল। তার মনের কোণে কোন এক শয়তান যেন বলে উঠল, গাউস আর সরদার সিং উভয়েই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে, পরাজয় ঘনিয়ে এল বাদশাহী বাহিনীর। অগুনতি মৃত ও আহতের দেহ স্তূপীকৃত হল নজফ্‌গড়ের বৃষ্টিস্নাত প্রান্তরে।

বাদশাহ্ সব শুনলেন। অন্যেরা বিদ্রূপ করে বখত্ খাঁকে ডাকতে শুরু করল "কমবখত্ খাঁ" বলে, অর্থাৎ ভাগ্যহীন। কিন্তু বাদশাহ্ জানেন, কমবখত্ খাঁ শুধু নয়। তার চেয়েও বেশি। কারণ তাঁর সাধের সিপাহীসালার ভাগ্যদোষে হেরে যায় নি এক্ষেত্রে। কোন রহস্যজনক কারণে নিশ্চেষ্ট ভাবে রণক্ষেত্রের পাশে বসে থেকে, ফিরে এসেছে। তাঁর গুপ্তচর এই খবর এনে দিয়েছে। তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন বখত্ খাঁকে, কিন্তু অপসারিত করতে পারলেন না। কারণ যত অপরাধই করুক সে, দেশপ্রেম তার রয়েছে এবং ফিরিঙ্গিদের উৎখাতই করতে সে চায়। এও মুহূর্তে তাকে অপসারিত করাও উচিত হবে না। তাকে

অপসারিত করার প্রকৃষ্ট সময় ছিল, যখন সৈন্যরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল। বাহাদুর শাহ্ বুঝলেন, পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র, কোন প্রান্তর নয়, কোন গিরিকন্দর কিংবা নদীর তীরভূমিও নয়! পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র দিল্লীনগরী। তাঁর মুখে খেদোক্তি শোনা গেল,—নজফ্‌গড় প্রান্তর সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পলাশী।

কিন্তু বৃদ্ধ হলেও তিনি নায়ক। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। শেষ বলটুকু নিঃশেষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সচেষ্ট থাকতে হবে। নইলে মীর্জা মুঘল সেনাবাহিনী নিরুৎসাহিত বোধ করবে। ডেকে পাঠালেন তিনি মীর্জা খোয়াইস, মীর্জা খয়ের সুলতান, মীর্জা আবুবকর, মীর্জা আবদুল্লাকে। বললেন, -এবারে তোমরা প্রস্তুত হও। দেশের মাটিতে এতদিন প্রতিপালিত হয়েছ, যদি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে দেশের প্রতি, প্রতিজ্ঞা কর এই মুহূর্তে—মৃত্যুবরণ করেও শেষ অবাধ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

—আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম।

বাদশাহ্ স্থির দৃষ্টিতে তৈমুরের প্রতিটি বংশধরের দিকে চেয়ে দেখেন। এতটুকু বিচলিত নয় ওরা। যুদ্ধে পারদর্শী না হলেও অন্ততঃ মৃত্যুবরণে যে ভীত নয়, ওদের মুখ দেখলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। সন্তুষ্ট হলেন তিনি।

—ওয়ালিদাদ খাঁ তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। আপত্তি আছে?

—বিন্দুমাত্র নয়।

—তোমাদের কাজ হবে ফিরিঙ্গি ছাউনি আক্রমণ এবং অধিকার করা। ওরা এখনো সবদার সিং-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। এ-ই সুযোগ।

বাদশাজাদারা দ্রুত প্রস্তুত হবার জন্য স্থান ত্যাগ করে।

বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ তাঁর প্রিয় হস্তী মৌলা বক্‌স্-এর পৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরীর পথে বার হয়ে পড়েন। উচ্চকণ্ঠে সবাইকে ডেকে বলেন,—আমাদের শেষ সংগ্রামের দিন এগিয়ে এসেছে। দেশের অসংখ্য অমানুষের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা কখনো আমাদের যুদ্ধকৌশল শত্রুদের নিকট থেকে গোপন রাখতে পারি নি, কখনো আমরা আচম্বিতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি নি। আমাদের অবস্থান, আমাদের প্রস্তুতি আমাদের কৌশল সবকিছু আগে ভাগে ওদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে আজ হয়তো আমরা পরাজয়ের সম্মুখীন হতে পারি যদি সর্বস্ব পণ না করি। আপনারা দেশপ্রেমী আমি জানি। চলে আসুন সবাই গৃহকোণ পরিত্যাগ করে। যার কাছে যে হাতিয়ার আছে, তাই দিয়ে শয়তানদের ছাউনি দখল করুন। ওদের নিরাশ্রয় করুন। আপনারা দিকে দিকে ধাবিত হয়ে অনুরোধের কথা গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষের কানে

পৌঁছে দিন।

আশাতীত ফল পাওয়া গেল বাদশাহের এই আহ্বানে। কাতারে কাতারে মানুষ বার হয়ে এল তাদের ঘর ছেড়ে। এদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য রমণী।

একদিকে সমর-কৌশলে সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গি সেনা—নৃপতিদের কল্যাণে যারা এই যুদ্ধাবস্থাতেও পরিচিত খাদ্যগ্রহণে স্বাস্থ্যবান, অপরদিকে অত্যাচারে জর্জরিত রুগ্নস্বাস্থ্য অসংখ্য নরনারী। ফিরিঙ্গিরা সভয়ে দেখল ওরা এগিয়ে আসছে। আকাশ অন্ধকার করে পঙ্গপাল যেভাবে এগিয়ে আসে, অসমতল মাটির ওপর দিয়ে তেমনি ভাবে এগিয়ে আসছে ওরা। নিজ সৈন্যদলকে উৎসাহ দানের কথাও ভুলে গেলে ফিরিঙ্গি সেনাপতিরা, ফলে সৈন্যদল পেছনে সরে যেতে লাগল।

উইলসন ঘোড়া ছুটিয়ে চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে গলা ফাটিয়ে বলতে থাকে—তোমরা ভয় পেয়ো না—পেছিয়ে যেও না। ওরা নিরস্ত্র। একটা কামান হাজারটা মানুষের চেয়েও বেশি। তোমরা একবার শুধু ঘুরে দাঁড়াও, সঙ্গে সঙ্গে ওদের গতি থেমে যাবে।

—পাগল। একটা গোটা দেশ ছুটে আসছে, জেনারেল বলে ঘুরে দাঁড়াতে।

পালাতে শুরু করে ফিরিঙ্গির দল। অনন্যোপায় উইলসন, রীড্ আর নিকলসন কিছু বিশ্বস্ত সেনানা নিয়ে কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিল নিজেদের বাহিনীর দিকে। চিৎকার করে বলে উঠল যদি—পালাবার চেষ্টা কর—এই গোলা সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উড়িয়ে দেবে।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পরে পলায়নপর ফিরিঙ্গিরা। সেনাপতিদের চোখে তারা আগুন দেখেছি। মিথ্যা বলে ন তারা। ঘুরে দাঁড়ায় তাই সবাই। গোলন্দাজেরা কামানের পেছনে দাঁড়ায়। তারপর সেনাপতির হুকুমে কামান দাগতে থাকে।

নিহতের সংখ্যা অসংখ্য। স্ত্রী-পুরুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়। ফিরিঙ্গিরা গড়িয়ে পড়ে। তাদের রক্ত শুষে নেয় তৃষ্ণার্ত হিন্দুস্থানের মৃত্তিকা। তবু তৃষ্ণা মেটে না। বিশ্বাসঘাতকদের রক্তপান না করা পর্যন্ত এই তৃষ্ণা নিবারিত হবার নয়। অথচ সেই বিশ্বাসঘাতকরা আজ নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখছে। তারা ভাবছে, কবে দিল্লী অধিকৃত হবে, কবে শ্বেত প্রভুদের প্রসাদে তাদের ভাগ্য ফিরবে।

আহত এক রমণীর গায়ে জুতোর খোঁচা মেরে উইলসন তার মাতৃভাষায় বলে—যুদ্ধ করতে আসা হয়েছে! মজাটা টের পেয়েছ তো?

ভাষা না বুঝলেও শাদা কুত্তার মনোভাব বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না

মৃত্যুপথ যাত্রিনী নাংলী গ্রামের কৃষক-বধূ রাবেয়া বিবির। সে একবার অতি কষ্টে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে তার কাটারী একটু দূরে পড়ে রয়েছে। সেটি আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারই কর্তিত দক্ষিণ হস্ত।

অস্ফুটস্বরে মুখ দিয়ে রাবেয়ার একবার শুধু বার হয়—আল্লা! পরক্ষণেই খুদাতাল্লা তাকে আপন ক্রোড়ে টেনে নেন।

উইলসন পা উঠিয়ে নেয় মৃতার দেহ থেকে। ভাবে, তার দেশে সে কখনো শোনে নি কোন রমণী এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে।

দিল্লীর দ্বারপ্রান্তে যুদ্ধ এগিয়ে এসেছে। লালকেল্লার প্রাচীর এখন ওদের কামানের আওতায়।

বখত্ খাঁয়ের ওপর বাদশাহ্ আদৌ প্রসন্ন নন। তবু তাকেই ভার দিলেন নগর রক্ষার।

বিষণ্ণ বখত্ বলে,—পাঞ্জাব থেকে যদি ওদের রসদ আনা বন্ধ করা যেত, তা'হলে এ অবস্থা হত না আমাদের।

বাদশাহ্ জলে ওঠেন,—কেন বন্ধ কর নি তুমি? তোমার নিজের বাহিনী রয়েছে!

বখত্ খাঁ নীরব থাকে। সে জানে তারই মুহূর্তের আদর্শচ্যুতিতে যুদ্ধের গতি এক অস্বাভাবিক মোড় নিয়ে এখন নাগালের বাইরে যেতে বসেছে। সে জানে তার দুর্বলতার কথা বাদশাহ্ বোঝেন। বোঝেন বলেই তাঁর কাছে যুক্তি দেখানো যায় না।

মীর্জা মুঘল বলে,—যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে এখন পরিতাপ করবার সময় নেই। এখন আমাদের কর্তব্য কী হবে, তাই জানতে চাই।

বাদশাহ্ বলেন,—গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কামান সজ্জিত কর। যে শত শত গ্রামবাসী যুদ্ধ করবার জন্যে শহরে এসেছে তাদের যে কোন রকমে কাজে লাগাও। এছাড়া আপাততঃ আর কী করবার রয়েছে? হ্যাঁ, দেখো যেন নগরবাসীর মনোবল ক্ষুণ্ণ না হয়।

প্রবল যুদ্ধ শুরু হয় দু'এক দিনের মধ্যেই। ফিরিঙ্গি গোলা আছড়ে পড়ে কেল্লার গায়ে, নগরীর রাস্তায়। কিছু নগরবাসীর মৃত্যু হয়—আহতের আর্তনাদে কান পাতা যায় না।

বাদশাহ্ সবই লক্ষ্য করেন। কখনো তিনি সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান। আবার কখনো অশ্ব হম্‌দমকে ছুটিয়ে একেবারে সামনে চলে যান। তিনি দেখতে

পান এত আঘাতের পরও সৈন্যবাহিনী ভগ্নোদ্যম নয়। তারা দিল্লীকে রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তবু পরিণাম সম্বন্ধে এতটুকু সন্দিহান নন তিনি। সেই পরিণাম হল সম্পূর্ণ পরাজয়। যে ফিরিঙ্গিদের শত সুযোগ সত্ত্বেও নিজেদের গাফিলতির জন্যে উৎখাত করা যায় নি, এখন আর তাদের রুখে রাখা সম্ভব নয়। মুক্তি-সংগ্রামীরা দেশের শত অরাজকতার মধ্যেও স্বাধীনতা চেয়েছিল। যোগ্য সেনাপতির অভাবে এবং গুপ্তচরদের তৎপরতায় সেই স্বাধীনতা তিনি তাদের দিতে পারলেন না। ওরা তাঁকে অবলম্বন করেছিল—বার্ধক্য তাঁকে সেই অবলম্বন হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে।

তিনি তো জানেন, ওরাও নিশ্চয়ই জানে, কবে পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেন নি। ওরাও হয়তো অনুকম্পাবশতঃ তাঁকে শোনায় নি। শুধু সেদিন সৈন্যরা প্রাণপণ শক্তিতে লড়েছিল। পারল না ওদের হটিয়ে দিতে। একশো বছর পার হয়ে গেল—ফিরিঙ্গিরা তবু টিকে রইল এই হিন্দুস্থানের ভূমিতে। টিকিয়ে রাখল অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজা-মহারাজা দল। যদি কখনো মুক্তি পায় এই বিশাল দেশ, ওই সমস্ত রাজাদের বংশধরেরা তখন এই ক্ষমাহীন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কিনা তিনি জানেন না। ওদের বংশধরদের ফিরিঙ্গিদের সাথে সাথে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে কিনা তাও ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত রয়েছে। যদি তা না করা হয়, তবে দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হবে। কারণ—সদ্য স্বাধীন দেশ-মাতৃকাকে ওরাই আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইবে।

কেল্লায় ফিরে আছেন বাদশাহ্। হাকিম সাহেব দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে,—ওদের কাছে কি দূত পাঠাব?

—কেন?

—কেল্লার বহুস্থান গোলায় বিধ্বস্ত।

—ভেঙ্গে পড়ুক লালকেল্লা—সন্ধি কখনো নয়।

—আপনার জীবন—

—আমার জীবন? আমি কে? শত শত গ্রামবাসী সংগ্রাম করছে। তাদের যে কোন একজনের জীবনের চেয়ে আমার জীবনের মূল্য অনেক কম হাকিম সাহেব।

হাকিম আসানুল্লা আর কোন কথা বলতে পারে না। সে জানত, বাদশাহের জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। জেনেশুনেও এই তিরস্কার লাভের জন্যে সে উত্থাপন করেছিল সন্ধির প্রস্তাব। বাদশাহ্কে সে তাঁর প্রথম যৌবনেও দেখেছে।

দ্বিতীয় আকবর শাহের প্রিয়পাত্র ছিল হাকিম। এই বংশের প্রতি আনুগত্যবোধ তাকে বার বার তৈমুরবংশের মঙ্গলের কথাটাই চিন্তা করতে প্রেরণা দিয়েছে। বাদশাহের মত সারা হিন্দুস্থানের কথা তাই সে অনেক সময়ই ভাবতে ভুলে যায়— দৃষ্টি তার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

আসানুল্লা বিদায় গ্রহণের জন্য পা বাড়াতেই পর পর দু'টি গোলা ফেটে পড়ে মুসম্মান বারজ্-এর অতি সন্নিকটে। কয়েকজন রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহখণ্ড ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে।

সেদিন রাতে গোলাবর্ষণ বন্ধ হলে, বাহাদুর শাহ্ তাঁর লেখনী নিয়ে বসেন। জীবনে আর কখনো কিছু রচনার সুযোগ মিলবে না। আজই শেষ সুযোগ। তাঁর শেষ দিওয়ানের কয়েকটি শ্যার লেখা বাকি রয়েছে। তা'ছাড়া আরও কিছু লিখবেন। আজ সারা রাত জাগ্রত থেকে তিনি লিখবেন।

দিল্লী নগরী আজ অন্ধকারে অবলুপ্ত। কেল্লারও কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। কোন প্রকোষ্ঠ থেকে এক ফালি আলোক-রশ্মিও ছিটকে বার হয়ে আসছে না।

লেখনী তুলে নেন বাদশাহ্। তাঁর দৃষ্টি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কী যেন অন্বেষণ করে বেড়ায়। শেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সামনের কিতাবে। তিনি লিখে চলেন।

দিওয়ানটি অবশেষে সম্পূর্ণ হয় একসময়ে। তখন তিনি কয়েকটি শ্যার ধীরে ধীরে লিখে ফেলেন—

পাসে মার্গ দক্বর পে আই জাফর কোই ফতেহা ভি কাঁহা পর এ
উয়ো যো টুটি কবর কা-থা- নিশান্ উসে ঠোকর্ সে উড়া নিয়া।

[হে জাফর! তোমার মৃত্যুর পর কোথায় ফতেহা পাঠ হবে? কারণ দলিত ও মথিত ভগ্ন সমাধির অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না।]

সম্মুখে রক্ষিত চিরাগদানীর প্রজ্জলিত রশ্মি নিবু নিবু হয়। জাফরের মুখে ফিকে হাসি ভেসে ওঠে। তিনি আবার লিখে চলেন—

না রহে উয়ো রঙ্ না বু রহি, না গুলাব কি খুব্-ও-খো রহি,
যো খেজান্ কে হাথো তাবা হ্যায় উয়ো ইয়াদ গেরে সহর হুঁ,
যভি হালে গুলসানে দের হ্যায়, কভি মেহ্‌র হ্যায় কব্‌লি কবর হ্যায়,
যো কভি চমন থা উয়ো ফুল হোঁ, যো কভি সমন থা উয়ো খার হোঁ।

[ফুলের সেই আগের বর্ণ কিংবা গন্ধ কিছুই অবশিষ্ট নেই। না আছে তার পূর্বের সজীবতা ও সৌন্দর্য। আমি বসন্তের সেই মরশুমী ফুল, শীতের স্পর্শে যা ধ্বংস হয়। একেই বলে ভাগ্য—কখনো সুপ্রসন্ন, কখনো বা ক্রুদ্ধ। আমি সেই সাজানো বাগানের ফুল, এখন যার কাঁটাটুকু রয়েছে শুধু।]

বাতি নিভে গেল সহসা। এমন হয় না কখনো। কিন্তু সারাদিনে অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে, কে কোথায় রয়েছে ঠিক নেই। শুধু জিন্নৎকে তিনি দেখেছেন কয়েকবার আশেপাশে ঘুরতে। তাঁকে চিন্তিত দেখে বিরক্ত করে নি। তবু থেকেছে পাশে পাশে। হয়তো ভেবেছে, কোন সময়ে তাকে তাঁর খুবই প্রয়োজন হবে।

—জিন্নৎ!

—বাদশাহ্।

—কোথায় তুমি!

—পর্দার এপাশে রয়েছি বাদশাহ্।

—রাত কত হল? ঘুমোও নি?

—আপনি এখন ঘুমোবেন বাদশাহ্? কাগজ-কালি সরিয়ে রাখব?

—অন্ধকারে দেখতে পাবে না।

—দেখতে পাবো।

জিন্নৎ এগিয়ে আসে। বাদশাহের কপালে হাত রাখে।

—জিন্নৎ, ঘুম পাবে না আমার।

—জানি বাদশাহ্, তবু বিশ্রামের প্রয়োজন।

—তোমার পুত্র জওয়ান বখত্ কোথায়?

—জানি না। তবে সন্ধ্যের সময় এক ঝলক দেখেছিলাম দূর থেকে। একটা কামানকে স্থাপন করেছিল কেল্লার প্রাকারে।

—ওরা সবাই লড়ছে। প্রাণপাত করছে। তবে সবই দেরিতে হল। তা যদি না হত, আজ দিল্লীবাসীরা বিজয়-উৎসব পালন করত।

জিন্নৎ চুপ করে থাকে।

—জিন্নৎ!

—বাদশাহ্।

—এই অন্ধকারে, তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, তবু যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখ।

—আমিও।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সংগ্রামী সেনাদের প্রতিরোধ ভঙ্গ করতে হিমসিম্ খেয়ে যায় ফিরিঙ্গিরা। দিল্লী প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধ। মুহূর্তের বিশ্রাম নেই বাদশাহ্ থেকে শুরু করে একজনেরও। রাতের নিদ্রাও কবে বিদায় নিয়েছে মনে

নেই কারও।

তবু এগিয়ে আসে শয়তানের দল। গুটি গুটি এগিয়ে আসে। তারা অধিকার করে কুদসিয়া বাগ, তারপর কাশ্মিরী ফটক—অধিকার করে লাহোর ফটক—অবশেষে জামী মসজিদ।

এবারে কেল্লার পালা। একসময়ে যে কেল্লা ছিল তাদেরই তত্ত্বাবধানে, নতুন করে অধিকার করতে আসছে সেই কেল্লা। এবারে ওরা আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ। পাঁচ-ছয় মাসের স্বাধীন দিল্লীকে কুক্ষিগত করবার জন্য ওদের হিংস্রতা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

অবিরত গোলাবর্ষণে পাষাণী লাল কেল্লার হৃদয়ও রক্তাক্ত। তার মজবুত প্রাকার বহুস্থানে ভেঙ্গে পড়েছে—আরও পড়ছে মুহুর্মুহু।

গভীর রাতে জিন্নৎ ছুটে আসে বাদশাহের কাছে। বলে,—এবারে তুমি চলে যাও।

—কী লাভ? আমায় ওরা মেরে ফেলবে?

—না না। তুমি যাও। তোমার পুত্রদের সবাইকে আমি হুমায়ুনের সমাধির কাছে পাঠিয়েছি—সেখান থেকে ওরা চলে যাবে পারস্যে কিংবা আফগানিস্থানে। ওসব দেশ এতদিন সাহায্য করে নি। কিন্তু পুত্ররা ওদের আশ্রয় নিলে হয়তো সাহায্য করবে। আবার ওরা সসৈন্যে ফিরে আসবে। তুমি যাও।

—হুমায়ুনের সমাধির কাছে পাঠালে? তুমি পাঠিয়েছ?

—না, মীর্জা ইলাহী বক্স্ই সব ব্যবস্থা করেছেন।

—মীর্জা ইলাহী বক্স্। এতদিনে তবে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হল সে?

—হ্যাঁ, দেরি করো না। তুমি যাও।

—আর তুমি?

—আমি থাকব।

—কেন?

—এটি পবিত্র স্থান। আমি এখানে থাকতে চাই বাদশাহ্।

—শুধু সেজন্যে তুমি আমায় একা ছেড়ে দিতে না। আসলে তুমি চেষ্টা করবে ওরা যাতে আমার প্রাণভিক্ষা দেয়।

—না না। এতবছর পরে এই শেষ সময়ে আমায় তুমি ভুল বুঝো না।

—বেশ। তবে তোমায় জানিয়ে রাখি, আমিও থাকব।

—ওগো, আমার প্রার্থনা তুমি রাখো।

—না জিন্নৎ, তা হয় না। অক্ষম হলেও এই যুদ্ধের আমিই নায়ক। নায়ক

কখনো তার সেনানীদের পরিত্যাগ করে না।

জিন্নৎ ওড়নায় মুখ ঢাকে। দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার গাল বেয়ে।

কেল্লার মধ্যে চাঞ্চল্য। চারদিকে সোরগোল। বেশ বোঝা যাচ্ছে শেষ প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। দেওয়ান-ই-খাসের যে চারটি কামান এতদিন চুপচাপ পড়ে ছিল তাও গর্জন করতে শুরু করেছে। অন্ধকারে মনে হয়, আগুনের হল্‌কা ছুটে চলেছে। রাতেও বিরাম নেই। লালপর্দার কামানও তাই দেখে সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে।

বাদশাহ্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকেন বাতায়ন-পথে। তারকা খচিত আকাশের নির্মলতা কামানের ধোঁয়ায় মলিন। তবু দেখা যায় দু'-একটি নক্ষত্র। এক ফালি চাঁদও দৃষ্টিগোচর হয়। আগামী বছরও ঈদ আসবে—পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত প্রতি বছরে।

সহসা কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করে। জিন্নৎ? না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন কেউ নেই। আশ্চর্য! মনের ভুল কি?

—জাফর!

—কে? কে ডাকল!

কেউ নেই। বারুদের যে তীব্র গন্ধ আকাশ-বাতাস ভরিয়ে রেখেছে, সহসা কয়েক লহমার জন্য তা যেন অন্তর্হিত হয়। পরিবর্তে এক অতি সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। কিসের সুগন্ধ! জিন্নৎ-এর দেহে তো এ ধরনের আতরের গন্ধ পায় নি কখনো। তা'ছাড়া আতরের গন্ধ এমন হতে পারে না। এই অলৌকিক সুঘ্রাণের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আর হয় নি কখনো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যান বাদশাহ্ জাফর। বাতি জ্বলছে নীরব সাক্ষী হয়ে। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পার হয়ে যান স্বাধীন বাদশাহ্।

—এইদিকে জাফর।

—কে?

কোথাও জনপ্রাণী নেই। জিন্নৎও নেই।

আবার আহ্বান—ফকির, জাফর।

এ-নামে তাঁকে তো কেউ ডাকে না। কিন্তু যে-ই ডাকুক, সে রয়েছে পর্দার আড়ালে। হ্যাঁ, পর্দা আন্দোলিত হচ্ছে। বহু বছর আগে মায়ের কক্ষের বাইরে ওইভাবে পর্দার কম্পন দেখে কিশোরী জিন্নৎকে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।

ছুটে যান সেদিকে। বুঝতে পারেন, অদৃশ্য সেই ব্যক্তিটিরই দেহের সুঘ্রাণ পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু মুসম্মান বারুজ-এর সুরক্ষিত কক্ষে কে এই অচেনা পুরুষ?

ডান হাতে সরিয়ে দেন আন্দোলিত পর্দা। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। একটি মোমবাতি জ্বলছে। একটি কোর-আন। আর সম্মুখে রক্ষিত বহু বছরের হজরৎ মহম্মদের পবিত্র কেশাধার।

ভীত হয়ে ওঠেন বাদশাহ্। শয়তানের দল কেল্লায় প্রবেশ করলে তো আধারের অমর্যাদা করবে। সেই জন্যেই এই দৈববাণী। রক্ষা করতে হবে এই অমূল্য সম্পদকে। রক্ষা করতেই হবে।

সযত্নে কেশাধারকে দুই হাতে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেন। ছুটতে ছুটতে ডাকেন,—জিন্নৎ, জিন্নৎ।

জিন্নৎ বেগম দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে।

—তুমি ঠিকই বলেছ জিন্নৎ। আমার কেল্লা পরিত্যাগ করা উচিত। এই মুহূর্তে।

বাদশাহের বক্ষের ওপর স্থাপিত আধারটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেগমের। বলে, —হ্যাঁ বাদশাহ্। এই মুহূর্তে। এটি রক্ষা করতে তোমার প্রাণ যায় যাক্।

কেল্লার পশ্চাতের দরওয়াজা দিয়ে বাদশাহ্ যখন নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন উষার আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

গোপনে এগিয়ে চলেন বাদশাহ্। রাস্তাঘাট রক্তপিচ্ছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের স্তূপ, আগুন জ্বলছে এ-গৃহে ও-গৃহে। কিছু কিছু লোক এখনো ছোটা-ছুটি করছে। অধিকাংশ নরনারী নগর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

বাদশাহ্ এগিয়ে চলেন। তাঁর সাজসজ্জা কোনদিনই বাদশাহ্ সুলভ নয়। তাই উষায় অল্প কয়েকজন নগরবাসীর মধ্যে মিশে যেতে কষ্ট হয় না। তবু বুকে আঁকড়ে রেখেছেন পবিত্র আধার। লোকে ভাবতে পারে কিছু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছেন তিনি। তাই প্রতি মুহূর্তে ভয়।

অবশেষে হজরৎ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার পবিত্র সমাধিস্থলে এসে উপস্থিত হন। বন্ধুবর গুলাম হাসানের নিদ্রা নিশ্চয়ই ভেঙ্গেছে এতক্ষণে। চিরকাল রাতের শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করে দরগার এই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি।

—গুলাম হাসান! বাদশাহ্ খুবই আস্তে ডাকেন।

—কে?

পদশব্দ শোনা যায়। এগিয়ে আসে বৃদ্ধ। একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় হাসান।

—কে?

—আমি। আমি জাফর।

—বাদশাহ্‌ ?

—হ্যাঁ। বন্ধু, তোমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ গচ্ছিত রাখতে এলাম।

—কী ? কী সেই সম্পদ ? আমি তো মণিমাণিক্যের জন্যে এত বছর অপেক্ষা করে বসে নেই।

—মণিমাণিক্য ? না, না হাসান। আমায় তুমি অমন ভেবো না। এই নাও।

বৃদ্ধ বাদশাহের দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

—কী এই সম্পদ ? তবে কি—তবে কি এরই জন্যে খুদাতাল্লা আমার মনকে পবিত্র করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

বাদশাহ্‌ সহসা ঋজু হয়ে দাঁড়ান। তাই তো! গুলাম হাসান একথা তাঁকেও বলেছে। একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য হাসান আজীবন সাধনা করেছে। এই কি সেই মুহূর্ত ?

—বাদশাহ্‌, নীরব কেন আপনি ? কী এই সম্পদ যা আর কাউকে না দিয়ে আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে এসেছেন ?

অস্ফুট স্বরে, রুদ্ধকণ্ঠে বাদশাহ্‌ কোনমতে বলতে পারেন আধারে কি রয়েছে।

—বাদশাহ্‌—বাদশাহ্‌—

উন্মাদ হাসান। কিন্তু উন্মত্ততা প্রকাশ করতে পারে না। অশ্রুসজল নয়নদ্বয় অচিরেই বিশুষ্ক হয় তার। মুখে ফুটে উঠে স্বর্গীয় হাসি। হাসিও মিলিয়ে যায়। গম্ভীর এবং শ্রদ্ধাবনত অবস্থায় সে বাদশাহের হাত থেকে গ্রহণ করে অতি পবিত্র পাত্রটি। সর্বদেহে একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায় তার।

এগিয়ে চলেন বাদশাহ্‌। জিন্নৎ বলেছে, পুত্রেরা এবং অন্যান্য তরুণেরা হুমায়ুনের সমাধিস্থলে অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে তারা যাবে পারস্য—আফগানিস্থানে। আবার ফিরবে তারা সৈন্য নিয়ে।

ভুল। বাইরে থেকে বিদেশী সৈন্য এনে দেশকে স্বাধীন করা যায় না। বিদেশে যদি এদেশের মানুষকে নিয়ে সৈন্যদল গড়া যায়, তা'হলে কাজ হতে পারে। সবচেয়ে ভাল দেশের মধ্যে অভ্যুত্থান।

সমাধিসৌধে গিয়ে পৌছান বাদশাহ্‌। সেখানে ওরা সবাই বিমর্ষ। ওদের স্থানত্যাগের কোন বন্দোবস্ত নেই।

—কী হয়েছে তোমাদের ? শুনেছিলাম এখান থেকে তোমরা বিদেশে রওনা দেবে ?

মীর্জা মুঘল এগিয়ে এসে বলে,—বিশ্বাসঘাতকেরা যেমন আমাদের পরাজয়ের মূল কারণ, তেমনি আমাদের বন্দী হবার কারণও হবে তারা। অনেক টাকা পাবে ওরা, ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে।

—বুঝতে পেরেছ তবে ?

মীর্জা মুঘল চিন্তিত স্বরে বলে,—কী ?

—তোমরা ফাঁদে পড়েছ একথা বোঝো নি এতক্ষণে ? অথচ আমি এক নজরেই বুঝেছি।

—আপনি বলছেন কি বাদশাহ্! শুনেছি মুক্তিসেনারা এসে আমাদের নিয়ে যাবে ?

—না। এটা ষড়যন্ত্র। আর এই ষড়যন্ত্রের স্রষ্টিকর্তা তোমাদের সম্মানীয় মীর্জা ইলাহী বক্স্।

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মীর্জা মুঘল বলে,—একবার যদি তাকে সামনে পেতাম। এর চেয়ে কামানের পেছনে দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভাল ছিল।

—নিশ্চয়ই ছিল। ওই দেখ।

মীর্জারা সবাই চেয়ে দেখে, ফিরিঙ্গি সেনাপতি হডসন এগিয়ে আসে সসৈন্যে। ইতিমধ্যে সমাধিক্ষেত্রটি সে ঘিরে ফেলেছে সবার অলক্ষ্যে। মুখে তার পৈশাচিক হাসি।

—এই যে বৃদ্ধ শয়তান। তোকেই আগে খতম করি।

হডসন অস্ত্র উত্তোলন করে। বাদশাহ্ অকম্পিত।

অপর একজন ফিরিঙ্গি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হডসনের হাত চেপে ধরে। বলে,—বাদশাহ্‌কে জীবিত রাখবার আদেশ হয়েছে।

—কে দেখছে ? বলব, লড়তে গিয়ে মরেছে বুড়ো।

—না। ভুলে যেও না তুমি সৈনিক।

বিরক্ত হডসন নিবৃত্ত হয়। বাদশাহ্‌কে সে প্রেরণ করে লালকেল্লায়—যেখানে অন্যান্য বেগমদের মধ্যে রয়েছে বন্দিনী জিন্নৎ বেগম। কেল্লায় যে কয়জন পুরুষ অবশিষ্ট ছিল তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।

বাদশাহ্‌কে ওরা জিন্নৎ-এর কাছে যেতে দিল না। দেওয়ান-ই-খাসের এক পাশে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখে। তাঁর অজ্ঞাতে মুখ থেকে নিঃসৃত হয় কোরআনের বাণী।

কামানের গর্জন স্তব্ধ হয়েছে। যুদ্ধ শেষ। মুক্তি-বাহিনী সংগ্রাম করেছে সাধ্য-

মত। ব্যক্তিগতভাবে তাদের কিছু কিছু যত দোষই করুক—দেশপ্রেমী তারা। তাই একশো বছরের ফিরিঙ্গি রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তিতে ভূমিকম্পের কাঁপন ধরাতে পেরেছিল। নির্যাতন, নিপীড়িতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া লেলিহান আগুন তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত ছিল বলেই মীরাটের মত শত্রুদের একটি শক্ত ঘাঁটি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পেরেছিল। এদের শক্তি ছিল অপরিসীম। কিন্তু সেই শক্তির অনেক অপচয় হয়েছিল বলে আজকের পরিণতি—এই পরাজয়। ওদের ঠিকমত সংহত করে সমস্ত শক্তিকে একমুখী করতে পারলে আজ হিন্দুস্থানের চিত্র হত অন্য রকম। এই দেওয়ান-ই-খাসেই আজ তা'হলে বিচারের সম্মুখীন হ'ত ওই হডসন্, রীড, নিকলসন্ আর কাম্পবেলের দলকে। আর সেই বিচারের রায় খুব স্পষ্ট।

বাহাদুর শাহের মস্তক অবনত। গভীর চিন্তায় মগ্ন তিনি এই নির্জন কক্ষে। বয়সের ভারে তিনি একেবারে অথর্ব না হলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধপরিচালনার কর্মক্ষমতা বহুদিন পূর্বেই তিনি হারিয়েছিলেন। তাই নিজে তিনি কিছুই করতে পারেন নি—পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। পারলে, অন্ততঃ জীবনপণ শেষ চেষ্টা করতে পারতেন।

বাইরে ফিরিঙ্গিদের উৎকট চিৎকার। ওরা আসছে। মাঝে মাঝে এইভাবে ছুটে আসছে ওরা। প্রতিটি মুখ প্রতিহিংসা গ্রহণের উন্মত্ততায় বিকৃত। যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে অকারণে—নির্বিচারে। কেল্লায় একটি প্রাণীকেও হয়তো জীবিত রাখবে না। পুরুষেরা নিঃশেষিত হয়েছে—হয়তো শেষপর্যন্ত বেগমরাও নিষ্কৃতি পাবে না। জিন্নৎও নয়।

ওরা দেওয়ান-ই-খাসের দিকেই আসছে। এবারে হয়তো তাঁর পালা। ঈশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করেন বাদশাহ্। নিম্নকণ্ঠে বলেন—এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমাকে ডাকবার প্রচুর সময় পেয়েছিলাম খুদাতাল্লা। সেই সময়ের সদ্ব্যবহার আমি করতে পারি নি। তুমি আমায় শাস্তি দাও।

কখন যেন হডসন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালও করেন নি বাহাদুর শাহ্।

—এই দেখ্, বুড়ো শয়তান।

বাদশাহ্ মুখ তুললেই চমকে ওঠেন। হাডসনের রক্তাক্ত হাতে তাঁর পুত্র মীর্জা মুঘলের ছিন্ন শির। চাইতে পারেন না তিনি। সবাই বলে মীর্জা জওয়ান বখত্ তাঁর প্রিয়তম পুত্র। কারণ জিন্নৎ তার গর্ভধারিণী। কিন্তু এই মুহূর্তে মীর্জা মুঘলের মস্তক দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল কেন? জওয়ান বখত্-এর শির দেখলে এর চাইতে বেশি আকুল তো হতো না।

একটা ভারি দ্রব্যের পতনের শব্দে বাদশাহ্ তাঁর মস্তক উত্তোলন করেন।

দেখেন, মীর্জা মুঘলের ছিন্ন শির ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে হডসন।

—এই দেখ্, আরও দেখ্।

কে যেন হডসনের হাতে আর একটি কর্তিত মস্তক দেয়। এবারে আবুবকর, নিমিলিত চক্ষু তার। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সেনাপতি। অনভিজ্ঞ হয়েও তারুণ্যের প্রেরণায় প্রথম যুদ্ধযাত্রা সে করেছিল। বেচারা।

এই শিরও সজোরে নিক্ষেপ করে হডসন। ছুটে গিয়ে সেটি মীর্জা মুঘলের মুণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে যায় আর একদিকে। তারপর গড়াতে গড়াতে এসে থেমে যায় বাদশাহেরই পদপ্রান্তে।

মনে মনে বাদশাহ্ বলেন, আমি বৃদ্ধ তাই তোকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবার মানসিক শক্তি আমার নেই।

এরপর একে একে তাঁর অন্যান্য পুত্রদের মস্তকও নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখলেন তিনি। প্রতিটি সামনে ধরে হডসন উৎকটভাবে হেসে ওঠে। সভ্যতার অগ্রদূত বলে পরিচয় দেয় নিজেদের ওরা।

হডসন্ হয়তো ভেবেছিল, বাদশাহ্ কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে কিংবা মূর্ছা যাবেন। কিন্তু তেমনি অটল তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন তিনি। যে-দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হল, সেই দেশে মীর্জাদের বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। মৃত্যুই বরং ওদের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

—বন্দী। হডসন্ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে ওঠে।

—আমি বাদশাহ্।

—সেই বাদশাহী ঘুচে গিয়েছে।

—না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় চিরকালই রয়েছে।

—বুড়ো শয়তান, যে কোন মুহূর্তে তোর ইহকাল শেষ করে দিতে পারি।

বাদশাহ্ নীরব থাকেন। ফিরিঙ্গিদের মধ্যেও হডসন হল শয়তান শিরোমণি। অন্যান্যদের ব্যবহার এত অপমানজনক নয়। তারা বাদশাহের সম্মান না দিলেও মানুষের সম্মান দেয়।

—শোন্, তোর বিচার হবে সত্বর। এই দেওয়ান-ই-খাসেই। প্রস্তুত থাক্।

—দেওয়ান-ই-খাস আমার দরবার কক্ষ। এখানে বাদশাহের বিচার হতে পারে না।

—দেওয়ান-ই-খাস আমাদের দরবার। তুই একজন জঘন্য বিশ্বাসঘাতক ও বন্দী মাত্র।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। লালকেল্লা নীরব। শুধু ফিরিঙ্গিবেষ্টিত হারেমের শোকার্ত বেগমদের চাপা ক্রন্দনধ্বনি চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যায়। বাইরে থেকে কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। তবে পশুশালায় অশ্ব ও হস্তীদের বোবা আর্তনাদ কান পাতলে শোনা যায়। তারাও যেন বুঝেছে তারা কেন্দ্রচ্যুত। যে ব্যক্তিটি এতকাল নিজে তাদের তত্ত্বাবধান করে এসেছেন, তাঁকে আর দেখা যাবে না।

পশুশালার নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সন্ডারস্ চারদিক ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবার সময় একটি স্থানে এসে থেমে যায়। দেখতে পায় একটি হস্তীর সম্মুখে খাবার পড়ে রয়েছে। হস্তীর উদরপূর্তি সহজ ব্যাপার নয়। ঘটনাটি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় সন্ডারস্ মাহুতকে প্রশ্ন করে। মাহুত বিমর্ষ কণ্ঠে বলে—এর নাম মৌলা বক্স্। বাদশাহের নিজের হস্তী। এ বুঝতে পেরেছে যে তাঁর কোন অমঙ্গল হয়েছে। তাই খাদ্য গ্রহণ করছে না।

সন্ডারস্ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে,—পশুর সমবেদনা! ভাল খাবার দিলে গিলে খাবে।

তার হুকুমে ভাল খাবার এল। মৌলা বক্স্ তার সম্মুখে নতুন খাদ্য দেখে ক্রোধে শুঁড় দিয়ে ঝুড়ি সমেত দূরে নিক্ষেপ করে।

সন্ডারস্ তাজ্জব বনে যায়। মুখ তার আরক্তিম হয়ে ওঠে অপমানে। চিৎকার করে বলে,—এও বাদশাহের মত বিদ্রোহী। আজই একে নিলামে তোলা হবে। কেল্লায় এর স্থান নেই।

সেদিন অপরাহ্নে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক জড়ো করে মৌলা বক্স্‌কে নিলামে তোলা হয়। মাত্র একশত টাকা দাম ওঠে। কিনে নেয় দিল্লীরই একজন মুদি।

মাহুতের চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। সে মৌলা বক্স্-এর কানে কানে বলে,—মৌলা, তোকে তো চলে যেতে হচ্ছে। বুঝতে পারছিস না? কেল্লাতেও থাকবি না তুই।

সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখে সহসা মৌলার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। সন্ডারস্ ভাবে, পাগল হয়েছে হাতি। ছুটে পালায় সে। কিন্তু পাগল হয় নি মৌলা। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

ওদিকে হমদমের সহিস ছুটে এসে সন্ডারস্‌কে জানায়—সাহেব, বাদশাহের ঘোড়াটা মরে গেল।

—কেমন করে ?

—জানি না। একবার শুধু ডেকে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল।

বিমূঢ় সন্‌ডার্‌স্‌ কী বলবে, ভেবে পায় না। এমন সে কখনো শোনে নি বা দেখে নি। গল্পে পড়েছে. পশুরা কথা বলে। মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান চলে তাদের। তবে কি এসব গল্প সত্যি ?

দেওয়ান-ই-খাসে বসে বিচার-সভা। দিনের পর দিন চলে বিচারের নামে প্রহসন। বৃদ্ধ বাদশাহ্‌—এতদিন যাঁর দেহ বার্ধক্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে ঋজু ও সতেজ ছিল। কিছুদিনের ব্যবধানেই তিনি হয়ে পড়েন জীর্ণ। বয়সের সমস্ত ভারটুকু যেন তাঁর শরীরের ওপর চেপে বসেছে। এই অবস্থাতেই প্রতিদিন তাঁকে একজন সামান্য বন্দীর মত কাঠগড়ায় এনে তোলা হয়।

তৈমুরবংশের প্রথম বাদশাহ্‌ বাববের পর আরও পনেরো জন সম্রাট তার পূর্বে হিন্দুস্থানের মসনদে বসে বাদশাহী চালিয়েছেন। তিন শত একত্রিশ বৎসরের পুরাতন হিন্দুস্থানের অধিবাসী তাঁরা। অথচ তাঁরই বিচার করছে সম্মুখের ওই লালমুখো বিদেশীরা—এদেশের নাড়ীর সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র যোগসূত্র নেই—এদেশের মঙ্গল চিন্তা মুহূর্তের জন্যেও যাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ওরা তাঁর বিচার করছে বিদ্রোহের অপরাধে। কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ? শত শত দেশবাসী যদি দেশের বাদশাহের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্যে বিদ্রোহ করে তাও অন্যায় নয়। অথচ এরা তো বিদেশী কুকুর।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই। তিনি দেখতে পান দু'জন ফিরিঙ্গিকে সম্মুখে উচ্চাসনে উপবিষ্টদের মধ্যে। নাম তাদের হ্যারিয়াট ও পেনি। ওরাই বলতে গেলে তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। হড্‌সন যদি পুত্রদের সঙ্গে তাঁর শিরও স্কন্ধচ্যুত করতো তবে তিনি রক্ষা পেতেন। কিন্তু ওদের চক্রান্ত তাঁকে মরতে দেয় নি। অপমানের দুঃসহ জ্বালায় তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলবার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে।

বিচার চলে। বাদশাহ্‌ শুনতে পান কাঠগড়ায় বসে বসে ফিরিঙ্গিদের দু'জনার একজন উঠে দাঁড়িয়ে গাম্ভীর্য সহকারে কী যেন পড়ছে। বুঝবার চেষ্টা না করেও তিনি বলে দিতে পারেন, তাঁরই বিরুদ্ধে কল্পিত ও সত্য মিলিয়ে অনেককিছু দোষারোপ করা হচ্ছে। লালকেল্লায় তিনি কিংবা মুঘল বংশধরদের কেউ আর ফিরে আসতে পারবে না। তাঁর ভাগ্যে কী রয়েছে, ওরা ঠিকই জানে। হয়তো মৃত্যু।

তিনি হাকিম আসানুল্লার জবানবন্দী শুনেছেন। শুনে কষ্ট হয়েছে বেচারীর প্রচেষ্টা দেখে। হাকিম বুঝল না, তাঁকে নিরপরাধ প্রমাণের প্রয়াসে, তাঁকে ছোট করা হয়েছে। দেশবাসী তাঁকে ভুল বুঝতে পারে। তারা এবং তাদের বংশধরেরা ভাবতে পারে স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁকর অকৃত্রিম ছিল না। অবশ্য ফিরিঙ্গিরা যা বোঝাবে, এরপর অন্ততঃ কিছুদিন দেশবাসী তাই বুঝবে। কারণ তাদের সংগ্রামী শক্তি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়েছে। বিদেশীরা, রাজা-মহারাজারা, দেশের স্বার্থান্বেষী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরা এই সংগ্রামী শক্তিকে কতদিন খর্ব করে রাখবে কে জানে। যতদিন না তারা সব হারাবে ততদিন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের সরল ও সুন্দর অধিবাসীরা এদের ছলনা বুঝতে পারবে না।

জীবনলাল, মুকুন্দলাল এবং আরও অনেককে সাক্ষীরূপে দাঁড়াতে দেখেছেন বাদশাহ্। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য বলেছে, কারও সাক্ষ্যে তাঁকে রক্ষা করবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, জীবনলাল তাঁর চরিত্রে শুধু কলঙ্কই লেপন করল। আসামীর কাঠগড়ায় বসে জীবনলালের মুখের দিকে চেয়ে তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছেন, কেন ওভাবে বলছে সে। তিনি কি কখনো ভুলেও তার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করেছেন? মনে তো পড়ে না। হয়তো অজ্ঞাতে ওর কোন অনিষ্ট করেছেন তিনি—তাই প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। নইলে অমন প্রশান্ত বদনে মিথ্যের পর মিথ্যে কী ভাবে বলল? হাকিম সাহেব তাঁর মঙ্গল চিন্তা করে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন আর জীবনলাল সজ্ঞানে তাঁকে পশু প্রমাণের জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। নইলে সে বলতে পারতো না যে, বিদেশী নারী ও শিশুদের হত্যা করবার জন্যে তিনি সৈন্যদের প্ররোচনা দিয়েছেন। দিতে হয়তো পারতেন যদি তাদের মত তিনি নিঃস্ব হতেন। কিন্তু তাঁর প্রাতিহিংসাপরায়ণতা তাদের মত উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছায় নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি হয়তো নিখুঁত বিদ্রোহী নন।

দেওয়ান-ই-খাসের বিচারকমণ্ডলী এবং সমবেত সবাই সচকিত হয়ে দেখে তৈমুরবংশের শেষ বাদশাহ্ কাঠগড়ার একপাশে ঢলে পড়েন। ছুটে যায় হাকিম আসানুল্লা বাদশাহের দিকে। কিন্তু ফিরিঙ্গি রক্ষীদের বাধাদানে যেতে পারে না।

ফিরিঙ্গিদের কারও কারও মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে ওঠে। ভাবে, ভীত হয়ে পড়েছেন বাদশাহ্। মৃত্যুভয়—মসনদ হারাবার ভয়। ভীতির ফলেই রমণীদের মত সাময়িকভাবে চৈতন্য হারিয়েছেন। ওরা বুঝল না একজন বিশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের কথা চিন্তা করতে করতেই তাঁর অমন হয়েছে। দুর্বল দেহ ও মস্তিষ্ক তাঁকে সচেতন থাকতে দেয় নি।

রক্ষীদের ব্যূহ ভেদ করে একজন অজ্ঞাত হাকিম ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বাদশাহের কাছে। তার অটল গাম্ভীর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রক্ষীদের প্রভাবিত করে। তারা বাধাদানের কথা ভুলে যায়। বিচারকমণ্ডলীও স্তব্ধ। অচেনা হাকিম বাদশাহের একটি হাত উঠিয়ে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে। বাদশাহ্ চোখ মেলেন। লজ্জিত হয়ে ওঠেন তিনি। অচেনা হাকিমকে বলেন,—আমার কিছু হয় নি হাকিম সাহেব। ব্যস্ত হবেন না। আমি—

—জানি বাদশাহ্। এমন কুৎসিতভাবে মিথ্যে অপবাদ দিলে, ফিরিঙ্গিদের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি যৌবনকালেও মূর্ছা যেত প্রথম দিনেই। আপনার স্নায়ুর শক্তি অপরিমেয়।

বাদশাহের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা ফিরে আসে। তিনি কিছু বলবার আগেই হাকিম বলে,—আপনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি। তবু চোখ বুজে থাকুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওরা দেখুক হাকিমের কাজ ফুরিয়ে যায় নি। পালাতে পারবেন?

সামান্য চিন্তা করে বাদশাহ্ বলেন,—সম্ভবতঃ না। বড় দুর্বল বোধ করছি। ওরা আমাকে বৃদ্ধ বয়সের সামান্য পথ্যটুকুও দেয় না।

—জানি। ঠিক আছে। আপনি মন স্থির করুন। যদি পালাতে চান, তা'হলে কাঠগড়ার ওপর যে কোন দিন ডানহাতের অনামিকা উঁচু করে রাখবেন।

রক্ষীরা বিচারকের আদেশে তৎপর হয়। হাকিমকে সরিয়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। অগত্যা কাঠগড়া পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে বাইরে একটা সোরগোল ওঠে। ফিরিঙ্গি কর্মচারীরা দেওয়ান-ই-খাসে ছুটে এসে চোখ বড় বড় করে বলে,—নানাসাহেব, নানাসাহেব।

বিচারক এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গিরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাংশু মুখ তাদের। এদিকে ওদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইতে থাকে তারা। আত্মগোপনের জন্যে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দু'একজন থামের আড়ালে গিয়ে লুকোয়।

কর্মচারীরা বলে,—নানাসাহেব এতক্ষণ ছিল। এইমাত্র চলে গেল। সে দরবারেই ছিল।

এতক্ষণে বিকৃত চিৎকার ওঠে,—ধরতে পারলে না?

—চিনতাম না। একজন দিল্লীওয়ালা চিনতে পেরে বলল।

বাদশাহ্ এতটা আশা করেন নি। ভেবেছিলেন নতুন হাকিম কোন অপরিচিত দেশপ্রেমিক। তাঁরই ভুল হয়েছিল। নানাসাহেব ব্যতীত এতখানি দুঃসাহস আর কারও হত না। নইলে সৈন্যদল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও আত্মগোপন করে

সমানে ফিরিঙ্গি বধ অভিযান চালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ? ফিরিঙ্গিদের ভীতি-বিহ্বল চাহনি তিনি আগেও কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আজ কয়েক মুহূর্ত আগে তাদের হাবভাব সত্যিই দর্শনীয় ছিল। দেখেও সুখ। অথচ ওরা বিজয়-গর্বে মত্ত হয়ে বিচার করছে। যুদ্ধজয় হিন্দুস্থানের পক্ষে সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু নানাসাহেব ওদের হৃদ্‌পিণ্ডে কম্পনের সৃষ্টি করতে পেরেছে।

বাদশাহ্‌ বুঝতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা থাকলেও দেওয়ান-ই-খাস থেকে তাঁকে অপহরণ করা নানাসাহেবের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, একজন দেশী মানুষ এই বীরের অস্তিত্বের কথা বিদেশীদের গোচরে আনল। ফলে, আগামীকাল থেকে লালপর্দার চতুর্দিকে সৈন্যসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে নিজেদের প্রাণরক্ষার তাগিদে। কারণ ওরা কখনো কল্পনা করতে পারবে না বাদশাহ্‌কে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার মত পরিকল্পনা কারও থাকতে পারে।

বাহাদুর শাহের সহসা খেয়াল হয়, ধাতস্থ হবার পর ওদের প্রহসন আবার শুরু হয়েছে! কৃত্রিম গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ—যেন ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ওরা বদ্ধপরিকর। যেন আল্লা ওদেরই হাতে ধরিত্রীর ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন।

এইভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। বাদশাহের দেহ আরও ভেঙ্গে পড়তে থাকে। আকুল ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে, একবার শুধু কেল্লার সীমানা ছাড়িয়ে দেশবাসীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে। তাদের বলতে বাসনা জাগে, আমি অক্ষম, আমার দুর্বল নেতৃত্বের জন্যেই তোমরা পরাজিত। আমার মনে ছিল তৈমুরবংশের অহমিকা। জাগ্রত চেতনার যুক্তি দিয়ে তার কণ্ঠরোধ করে রাখলেও সময় পেলেই আমার অজ্ঞাতে আকস্মিকভাবে জেগে উঠেছে। তাই হয়তো, যেমন উচিত ছিল তেমনি ভাবে তোমাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারি নি। কিন্তু আমি জানি, তোমরা আমায় ভালবাস, যেমন আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমরা আমায় শাস্তি দাও—নিষ্ঠুরতম শাস্তি দাও। সেই শাস্তি হবে আমার পরম শান্তি। ওই বিদেশীদের স্পর্ধা আমার আর সহ্য হয় না। তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

সবকিছুরই পরিসমাপ্তি রয়েছে। এই প্রহসনও একদিন শেষ হয়। বিচার-পতিরা সর্বসম্মতিক্রমে জানায় যে, তারা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, দিল্লীর ভূতপূর্ব বাদশাহ্‌ বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহ্‌ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হলেন।

বাদশাহ্‌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এইভাবে আর তাঁকে দিনের পর দিন লালপর্দার কাঠগড়ায় বসতে হবে না। তিনি বিচারকের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত

করেন। ওইখানে রৌপ্য নির্মিত মসনদের ওপর তাঁর পূর্বপুরুষেরা উপবেশন করেছেন। ওইখানে সেদিন পর্যন্ত তিনি বসেছেন একই মসনদে। এখন অপসারিত হয়েছে সেই সিংহাসন। আবার হয়তো পূর্বের মত তাকে বন্দী করে ফেলে রাখা হয়েছে ভূগর্ভস্থ কক্ষে। এত যে অর্থকষ্ট গিয়েছে, বেগমদের এবং শাহাজাদীদের সমস্ত অলঙ্কার নিঃশেষিত হয়েছে ; স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ওই রৌপ্য সিংহাসনের কথা কেউ ভুলেও উত্থাপন করে নি। কখনো বঙ্কিম কটাক্ষে ওদিকে চায় নি পর্যন্ত। কারণ ওটি ছিল স্বাধীনতার প্রতীক।

সেই মসনদে তিনি অথবা অন্য যে-ই বসুক, সেটি আসল কথা নয়। কিংবা ওই মসনদে কেউ না বসেও রাজ্য চালাতে পারত। তবু এটি রইত প্রতীক হয়ে।

বাহাদুর শাহের মন আরও অতীতে চলে যায়। সিংহাসনের স্থানে কল্পনায় ভেসে ওঠে অত্যাশ্চর্য ময়ূর সিংহাসনের চিত্রটি এবং সেই আসনে উপবিষ্ট শাহানশাহ শাহজাহান। ওই একই স্থান। নব-নির্মিত দেওয়ান-ই-খাস তখন আরও সুষমা-মণ্ডিত। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের জাঁকজমকে চতুর্দিক সমুজ্জ্বল। এই যে কারু-কার্য-খচিত থামগুলির গায়ে মালিন্যের ছাপ, তখন তার অস্তিত্ব ছিল না।

বিচারকদের একজনের উচ্চকণ্ঠে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় বাহাদুর শাহের। এখন থেকে তিনি হয়তো আর বাদশাহ্ নন। তিনি শুধু আবু। কিংবা জাফর। মা তাঁকে কত মিষ্টি ভাবে ডাকতেন। কী সুন্দর ছোট্ট নাম। পাষাণভার নেই। হয়তো নামের ভারই তাঁর কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করেছিল। শুধু আবু কিংবা জাফর হয়ে জীবন শুরু করতে পারলে দুলদুলের খুরের মত তাঁর অসিতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ উঠত প্রথম যৌবনেই। সেই স্ফুলিঙ্গে বিদেশীদের সমস্ত শক্তি দগ্ধ হত।

চিৎকার থেমে যায়। কী যে বলল তা কিছুই শোনেন নি বাদশাহ্। শুনলেও বুঝতে পারতেন না ভালভাবে। তবে বিচারকের বসবার ভঙ্গি এবং তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের কায়দা দেখে বোঝা যাচ্ছে বিচার শেষ হল এবং তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে তাও জানানো হয়ে গেল।

সহসা একজন উর্দু ভাষায় বলতে শুরু করে।

এবারে বুঝতে পারেন বাহাদুর শাহ্। বিচার শেষ এবং তাঁর মৃত্যু নয়—নির্বাসন। অর্থাৎ হিন্দুস্থানের প্রিয় ভূমিতে পিতৃপুরুষের পার্শ্বে তাঁর দেহকে সমাধিস্থ করবার মত জমিও এরা দেবে না। তিনি জানতেন এমন হবে। বহু পূর্ব হতেই জানতেন। স্বপ্নে কবে যেন গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এই কথাই তাঁকে জানানো হয়েছিল। সেই থেকে তাঁর নিজের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল, সমাধি তাঁর রইবে সবার অজ্ঞাতে—লোকচক্ষুর বাইরে। সেই সমাধির ওপর সামান্য একটা স্তম্ভও নির্মিত হবে না।

সবুজ প্রান্তরের দূর্বার তলদেশে একাকার হয়ে যাবে সেই স্থান। তিনি এত বেশি বিশ্বাস করেছিলেন যে, পরে যুদ্ধের দামামার মধ্যে বসেও এক রাতে শ্যার লিখে-ছিলেন এই বিষয়ে।

ওরা তাকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—রক্ষীরা কোথায়? এই মুহূর্তেই কি নির্বাসিত করছে? হয়তো তাই। মৃত্যুদণ্ড দিল না কাপুরুষের দল। জানে, মৃত্যুদণ্ড দিলে এইখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করতে হবে। জানে তাঁর যত অক্ষমতাই থাকুক না কেন, হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা তাঁকে জেনেছে সংগ্রামের নায়ক হিসাবে। মৃত্যুদণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় আবার আগুন জ্বলতে পারে অচিরে। তাঁর সমাধিস্থল একজন সংগ্রামীর ব্যর্থ প্রচেষ্টার কাঁটা হয়ে বিঁধে রইবে দেশবাসীর মনে। সেই কণ্টক উপড়ে ফেলার জন্য নতুন উদ্যমে দ্বিতীয় বিদ্রোহের আয়োজন শুরু হতে পারে। তাই নির্বাসন—যেন তার দেহের মধ্য দিয়ে দেশের বিদ্রোহের হুতাশনকেও নির্বাসনে দেওয়া হচ্ছে। কাপুরুষ! আগুনের উৎস কোথায়, ওদের নজরে পড়ে নি।

স্বপ্নের সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বলেছিল,—হারিয়ে যাওয়া তাঁর সমাধিস্থলের অনুসন্ধানে গোপনে ও প্রকাশ্যে দেশের মানুষের প্রয়াসের বিরাম থাকবে না। সমাধি-সৌধ নির্মাণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক বা না হোক, সমাধি-স্তম্ভ একদিন না একদিন নির্মাণ করবেই তারা। আর সেই স্তম্ভের দিকে দেশের এক সন্ধিক্ষণে হিন্দুস্থানের অপর এক বিদ্রোহী সন্তান এগিয়ে এসে অশ্রুজলে ভিজিয়ে দিয়ে মাল্যার্পণ করবে।

নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে বাহাদুর শাহের। না, না—অনাগত সেই বিদ্রোহী যেন ভুল না বোঝে। তিনি দেশের অদম্য অভীপ্সাকে রূপদানের সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। তিনি নেতা হতে চান নি—তিনি সামান্য ফকির মাত্র।

জিন্নৎ-এর সঙ্গে আবার দেখা হল ক'দিন পরে। এবারে বিদায়গ্রহণের পালা।

বোরখায় আবৃত প্রিয়তমা বেগমের মুখমণ্ডল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু দেখলেন সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। দুঃখের দিনে যে সে তাঁকে পরিত্যাগ করবে না একথা তিনি জানতেন।

মীর্জা জওয়ান বখত্‌কে ওরা হত্যা করে নি। পুত্র শাহ্ আব্বাসও জীবিত। কেন যে এই কৃপা প্রদর্শন, তিনি বুঝলেন না। যা হোক, ভালই হল। ওরা সঙ্গে থাকবে। তৃষিত পিতৃহৃদয় একটু সান্ত্বনা পাবে। জওয়ানের বড় নবাব শাহ্ জামানী বেগমও রয়েছে তাঁর সঙ্গে।

বাহাদুর শাহ্ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর অপর এক বেগমও তাঁর সঙ্গে

নির্বাসনেযেতে প্রস্তত। নবাব তাজমহল বেগম। তা'ছাড়া হারেমের কয়েকজন মহিলা—সুলতানী, রহিমা, ইসরৎ এ তহরৎও রয়েছে। ওরা সবাই নিশ্চয় তাঁকে ভালবাসে! নইলে বিদেশ-বিভুঁই-এ এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন কেন? কত দূরের পথ।

শেষে কেল্লা পরিত্যাগ করে রওনা হলেন তাঁরা। দিল্লীর পথ। পিছু ফিরে শেষ বারের মত একবার চাইলেন শাহানশাহ্ শাহজাহান নির্মিত লালকেল্লার দিকে। না না, চোখে জল আসবে না তাঁর। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। এ বয়সে চির-বিদায়ের জন্য মন সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে জিন্নৎ-এর, দুঃখ হচ্ছে দুই পুত্রের। ওরা তাই বার বার নয়ন মুছছে। তিনি কাঁদবেন না সামান্য লালকেল্লার জন্যে। মনের ভেতরটা গুমড়ে উঠছে—সে তো লালকেল্লার জন্যে নয়। সারা দেশের জন্যে। এই সুন্দর দেশের মাটিতে তাঁর দেহাস্থিরও স্থান মিলবে না।

চারদিকে সশস্ত্র সতর্ক সেনা। ফিরিঙ্গি সেনা। দেশী সৈন্যদের বিশ্বাস করে নি ওরা। এমন কি গুর্খাদেরও নয়। পথে-ঘাটে জনপ্রাণীকে দাঁড়াতে দেয় নি। তারা রয়েছে দূরে প্রাসাদের ওপরে কিংবা প্রান্তরে। অগণিত মানুষ সেইখান থেকে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। কাঁদছে অনেকে।

দিল্লীর পথ ফুরিয়ে যেতে থাকে। দরগায় হাসানকে একবার শেষবারের মত দেখতে পেলে বড় আনন্দ হত। হয়তো সে এসেছে—ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিংবা হয়তো পবিত্র কেশাধার নিয়ে সে দিনরাত তন্ময় হয়ে রয়েছে। কোন খেয়ালই নেই। বিদায় হাসান—আমার শ্রদ্ধা জেনো।

দিল্লীর পর গ্রামের পথ। গ্রামের পর গ্রাম। বিশাল এই দেশের মধ্যে দিয়ে তিনি যাবেন। তারপর একদিন এই দেশেরও সীমানা এগিয়ে আসবে। সীমানা শেষও হবে। ওরা তাঁকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করেছে।

দিল্লীর পর এলাহাবাদ,—তারপর মীর্জাপুর। সেখান থেকে জলপথে যাত্রা শুরু। 'সুরমা' নামে একটি জলযানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি বাষ্পীয় যান। বাদশাহ্ বুঝতে পারেন, স্থলপথে এগোবার ঝুঁকি ওরা আর নিতে চায় না। কারণ দু'একটি স্থানে ছোটোখাটো সংঘর্ষ বেঁধেছে অজ্ঞাত শত্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে। বাদশাহ্কে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কে তারা? নানাসাহেবের দল কি?

এই জলপথে এগিয়ে গেলে একদিন সমুদ্রবক্ষে গিয়ে পড়তে হবে। হিন্দুদের তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর। হয়তো সমুদ্রপথেই নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে।

—জিন্নৎ!

—বাদশাহ্।

—আমি আর বাদশাহ্ নই জিন্নৎ।

—আমার বাদশাহ্ তুমি চিরকাল।

—জিন্নৎ, আমাদের দেশ কি সুন্দর, দেখছ?

—দেখছি বাদশাহ্। মুগ্ধ হচ্ছি।

—আমিও। এমন নিশ্চিন্তভাবে কখনো দেখতে পাই নি জিন্নৎ। পেলে ভাল হত।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। দু' নয়ন মেলে বাদশাহ্ মাতৃভূমির রূপ দেখেন। তাঁর সঙ্গে জিন্নৎ দেখে—দেখে তাঁর পুত্র এবং সহযোগিনীরা, ওরা সবাই কাঁদে—শুধু কাঁদে। বাদশাহের চোখে জল নেই।

মীর্জাপুরের পর বকসার—তারপর রাজমহল। দীর্ঘ পথ। রাজমহলের পর রামপুর, বালিয়াও পার হয়।

বাদশাহ্ ডাকেন,—জিন্নৎ!

—বাদশাহ্।

—দেশের জমি কেমন সমতল হয়ে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ!

—হ্যাঁ বাদশাহ্। চারিদিকে নিবিড় সবুজের শোভা।

—তেমন সবুজ আজও দেখো নি। দেখবে শিগগির। বেশ বুঝতে পারছি, আমরা বঙ্গদেশের সীমায় পৌছে গিয়েছি।

অবশেষে একদিন বাঙলার খুলনা।

জিন্নৎ-এর চোখ ছাপিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

—কাঁদছ কেন জিন্নৎ?

—এই বিশাল দেশ একসঙ্গে হুঙ্কার দিলে ফিরিঙ্গিদের সাধ্য ছিল জয়ী হবার?

—না।

—তবে কেন তা হল না?

—আমাদের সংযোগব্যবস্থা ভাল ছিল না। তা'ছাড়া বিশ্বাসঘাতকরা আমাদের দুর্বল করে ফেলেছিল। কেঁদো না জিন্নৎ। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পারি নি। আমার মনেও দুঃখ রয়েছে—জ্বালাও রয়েছে। এই কোর-আন শরিফ অনেক শান্তি দিয়েছে। নইলে নতুন দেশে গিয়ে পাগল হয়ে যাব যে। আমার পাশে এসে বসো জিন্নৎ। আমি পাঠ করি, তুমি শোনো।

খুলনা পরিত্যাগের চারদিন পর ফিরিঙ্গিদের রাজধানী কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাবক্ষে 'মেগারা' নামে একটি বড় জাহাজে ভূতপূর্ব বাদশাহ্ এবং তাঁর সহযাত্রীদের তুলে দেওয়া হল। জাহাজটি এগিয়ে চলল সাগরের দিকে—সেখান থেকে ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুনে।

উপসংহার

বন্দী বাদশাহের ভারপ্রাপ্ত ফিরিঙ্গি কর্মচারী ক্যাপ্টেন এইচ. এন, ডেভিসের দু'খানি পত্র :

প্রথম পত্র

......বাড়িটি এই দেশের অন্যান্য বাড়ির মত কাঠের তৈরি এবং মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে নির্মিত।......এতে রয়েছে চারখানি ঘর। একখানিতে ভূতপূর্ব বাদশাহ্ থাকেন। একটিতে থাকে জওয়ান্ বখত্ এবং তার যুবতী বেগম। তৃতীয়টি জিন্নৎ বেগমের। প্রতিটি ঘরে সংলগ্ন স্নানাগার রয়েছে। চতুর্থটি রয়েছে শাহ্ আব্বাস এবং তার মায়ের অধিকারে।......দু'টি পৃথক স্নানাগার রয়েছে...আর রয়েছে রান্নার জায়গা।

মোট ষোলজন বন্দীর প্রতিদিনের খাওয়ার খরচ এগারো টাকা এবং প্রতি রবিবারে বাড়তি এক টাকা করে দেওয়া হয়। ওদের অন্যান্য খরচের জন্য প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মাথা পিছু দু'টাকা করে দেওয়া হয়। তবে কালি, কলম এবং কাগজ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। বাইরের মানুষের সঙ্গে বন্দীদের দেখা-সাক্ষাৎ করবার হুকুম নেই। শুধু উপযুক্ত অনুমতি-পত্র দেখালে ভৃত্যদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

...ভূতপূর্ব বাদশাহের স্মৃতিশক্তি এখনো ভাল......কিন্তু তাঁর কয়েকটি দাঁত পড়ে যাওয়ায় কথাবার্তা কিছুটা অস্পষ্ট।

...জিন্নৎ মহল একজন মধ্যবয়সী মহিলা। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। পর্দার আড়াল থেকে তিনি আমার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেছেন।

...জওয়ান বখত্-এর স্ত্রী জামানী বেগমের বয়স খুবই কম। সম্ভবতঃ পনেরো। যদিও ইতিমধ্যেই তিনি দুইটি সন্তানের জননী। বন্দীজীবন তাঁর কাছে অসহ্য। মাঝে মাঝে তাঁকে একটু আধটু বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

—স্বাঃ এইচ. নেলসন ডেভিস্।

রেঙ্গুন্

৩রা আগস্ট, ১৮৫৯

দ্বিতীয় পত্র

অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সরকারী বন্দী আবু জাফর মহম্মদ বাহাদুর শাহ্ ১৮৬২ সালের ৭ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন এবং সেই একই দিনে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

রেঙ্গুনের সিভিল সার্জেন লিখেছেন যে, ভূতপূর্ব বাদশাহ্ ৬ই নভেম্বর তৃতীয়-বার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং ৭ই তারিখের ভোর পাঁচ ঘটিকায় তাঁর দেহাবসান হয়।

বাহাদুর শাহের পরিচারক মহম্মদ বেগের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, ২৬শে অক্টোবর থেকেই তিনি অসুস্থতা বোধ করেন এবং খাদ্য গ্রহণে তাঁর খুবই কষ্ট হয়। তাঁর অবস্থা অবনতির দিকে যায়। ৩রা নভেম্বর ডাক্তার জানান যে, আবু জাফরের গলার ভেতরটা আক্রান্ত হয়েছে এবং সামান্য পানীয় গলাধঃকরণও তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। ৬ই নভেম্বর ডাক্তার জানালেন যে, অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে। তাঁর গলায় পক্ষাঘাত হয়েছে।

সেই অনুযায়ী পূর্ব হতেই ইঁট ও চুনের ব্যবস্থা করা হল। সেই সঙ্গে নির্বাচন করা হল তাঁর শেষ বিশ্রামের স্থান।

শুক্রবার ভোর পাঁচ ঘটিকায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং সবকিছুই প্রস্তুত ছিল বলে অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইঁটের সমাধির ওপর ঘাসের চাবড়া বিছিয়ে দিয়ে সমান করে দেওয়া হয়। চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বেড়া জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বার আগেই সমাধির ওপর ঘাস জন্মাবে। ফলে শেষ মুঘল কোথায় বিশ্রাম গ্রহণ করছেন তার হদিশ মিলবে না।

একজন মোল্লা শেষ সময়ে সাহায্য করেছিলেন। এক বিশাল জনতা ভিড় করেছিল…কিন্তু তাদের নিকটে ভিড়তে দেওয়া হয় নি। পুলিশ জায়গাটিকে ঘিরে ছিল।

…মৃতের দুই পুত্র জওয়ান বখত্ এবং শাহ্ আব্বাস এবং মৃতের পরিচারক মহম্মদ বেগ শবাধারের সঙ্গে ছিল। কোন স্ত্রীলোককে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। কোন উদ্ধৃতিও পাঠ করতে দেওয়া হয় নি।

সোমবার
১০ই নভেম্বর
১৮৬২

স্বাঃ এইচ. ডেভিস
সরকারী বন্দীদের
তত্ত্বাবধায়ক

কাগজ, কালি, কলম কিছুই কাছে রাখতে দেয় নি ফিরিঙ্গিরা বন্দী বাদশাহের, অথচ মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম শয্যার একপাশে স্বহস্তে লিখিত একটি শ্যার আবিষ্কৃত হয়। সেটি হল:

কোই আকে ফুল চড়ায়ে কিঁউ, কোই আকে সামা জালায়ে কিঁউ
কোই বহর ফতেহা আই কিঁউ, উয়ো বেকসি কা মগর হুঁ।

[আমার সমাধীস্থলে কেউ এসে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে কেন? জ্বালাবে কেন প্রদীপ? কেনই বা সে আসবে ফতেহা পাঠ করতে? মৃত্যুতে আমার বিষাদপাত্র এইভাবেই পরিপূর্ণ।]